তৃতীয় বাংলা
বিলেত থেকে প্রকাশিত শিল্প সাহিত্যের কাগজ

তৃতীয় বাংলা

সম্পাদক: সৈয়দ হিলাল সাইফ

সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ যুক্তরাজ্য

তৃতীয় বাংলা
প্রকাশকাল: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কপিরাইট: সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ যুক্তরাজ্য

সম্পাদক : সৈয়দ হিলাল সাইফ

প্রচ্ছদ: আহমদ রাজু
প্রকাশক: অনুপ্রাণন প্রকাশন, ঢাকা

Triteo Bangla
Editor: Syed Hilal Saif
Published in: 14 September 2025
Published by: Anupranon Prokashon, Dhaka
E-mail: sommilitosspj@gmail.com
Website: sommilitosspj.com
Price: £5.00 | $10.00 | Taka. 300.00

বিঃদ্রঃ এই ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রতিটি লেখা সংশ্লিষ্ট লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত মতামত। এর জন্য সম্পাদকীয় কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই দায়ী নয়।

সূচি

প্রবন্ধ

ইশতেহার ও ইস্তেগফার : দুই নগরীর কাহিনি ॥ আবু মকসুদ ৯
রবীন্দ্রনাথ ও ইতালি ॥ ড. মুকিদ চৌধুরী ১৪
বাংলা সাহিত্যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি ॥ ফারুক আহমদ ২৬
ইউরোপে লিটলম্যাগ আন্দোলনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্য মূল্য ॥ মিলটন রহমান ৩১

বিশ্ব সাহিত্য

মহাকবি ফেরদৌসী'র জীবন, তাঁর সুবিখ্যাত 'শাহনামা' এবং চিন্তাধারা ॥ নোমান আহমদ ৩৮

অনুবাদ গল্প

হার্ট ল্যাম্প : বানু মুশতাক ॥ অনুবাদ : লুনা রাহনুমা ৪৮

ছড়াগুচ্ছ

সৈয়দ হিলাল সাইফ ৬০

গল্প

অতল জলের অগ্নি : আতাউর রহমান মিলাদ ৬৪
ভুল বালুচরে : কামাল কাদের ৭১
শেষ বিকেলের আলোয় : ধনঞ্জয় পাল ৭৫
পণ্ড হওয়া একটি শোকসভার হালহকিকত : সাগর রহমান ৭৭
সহোদরা : সালেহা চৌধুরী ৮৮

কবিতা

আফিয়া বেগম শিরি, ইমদাদুন খানম, এম মোসাইদ খান, কাবেরী মুখার্জী, গাজী ফজলে রাব্বী, তাবেদার রসুল বকুল, মুজিব ইরম, শাহ সোহেল, শামীম আহমদ, সাব্বির আহমেদ, সৈয়দ রুম্মান, সৈয়দ মাসুম, সফিয়া জাহির ৯৪

প্রবন্ধ

দুঃখের আরেক নাম কবি হেলাল হাফিজ : নাজরাতুন নাঈম ইসলাম ১০৮
আত্মদক্ষতা হিসেবে কৌশল : মাজেদ বিশ্বাস ১১৬
পূর্ব লন্ডন যেন বাঙালি সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার এক অপূর্ব মিলনস্থল : মো. রহমত আলী ১২০
বিলাতে নতুন প্রজন্মকে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষাদানে অন্তরায় : সালমা বেগম ১২৩

গল্প

হারিয়ে পাবার গল্প : আজিজুল আম্বিয়া ১২৫
একজন বিমান পাইলটের পথ হারানোর গল্প : আহমদ হোসেন হেলাল ১৩০
শূন্য থেকে সূচনা : নুরুল হক ১৩৩
শান্তির নীড় : নূরজাহান শিল্পী ১৩৬

কবিতা

আবুল কালাম আজাদ ছোটন, আসমা মতিন, ঊর্মিলা আফরোজ, ফয়জুল ইসলাম ফয়েজনূর, ফয়জুর রহমান ফয়েজ, ফাহমিদা ইয়াসমিন, মজিবুল হক মনি, লুৎফুন নাহার, শাহীন রশিদ, শাসছুল হক (শাহ্‌লম), সৈয়দ আফসার, সাইফউদ্দিন আহমেদ বাবর, হাফসা নূর ১৩৮

ভ্রমণ কাহিনি

লন্ডন থেকে তেলআবিব : দিলু নাসের ১৫৫

গ্রন্থলোক

লাল পাথরের গল্প : আসমা মতিন ॥ পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী ১৬৫
ছুঁয়ে রাখি প্লাবিত ভোর ও অন্যান্য বিষাদ : উদয় শংকর দুর্জয় ॥ নাহার আলম ১৬৭
নয় দরজার বাতাস : কবি মুনিরা চৌধুরী ॥ মোহাম্মদ ইকবাল ১৬৯

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প

বোধোদয় : আনোয়ার শাহজাহান ১৮২

সম্পাদকীয়

তৃতীয় বাংলা–বিলেতে বাংলা সাহিত্যের স্বরলিপি।

ভাষা মানুষকে পরিচয় দেয়, আর সাহিত্য সেই পরিচয়ের গভীরে প্রবেশ করে আত্মার সঙ্গে সংলাপ রচনা করে। প্রবাসে বসবাসকারী বাঙালিরা নিজেদের শিকড় ভুলে যাননি বরং বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা ও চিন্তার আলোকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিচ্ছেন নতুন প্রজন্মের কাছে।

বিলাত আজ আর শুধু কর্মক্ষেত্র নয়, হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের এক বিকল্প প্রাণকেন্দ্র। এখানে বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের বসবাস বহু দশকের। গড়ে উঠেছে একটি পরিপক্ব প্রজন্ম, যারা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে নিছক স্মৃতির আবরণে রাখতে চান না বরং চর্চার মাধ্যমে তাকে আরও গভীর ও প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চান।

এই ধারাবাহিকতার প্রতিফলন ঘটেছে নানা সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত উৎসব ও মেলাগুলোর মাধ্যমে। তারই ধারায় *সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ* যুক্তরাজ্যের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ বইমেলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব প্রতি বছর হয়ে উঠেছে একটি সমন্বিত মিলন মেলা। যেখানে বই, পাঠ, শিল্প, গান, কবিতা, ভাবনা এবং মানুষ মিলেমিশে এক অপূর্ব সংস্কৃতি-ছবির জন্ম দেয়।

২০২৫ সালের এই ত্রয়োদশ বইমেলা আমাদের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সংযোগ রাখার এক উদ্যমী প্রয়াস। এরই অংশ হিসেবে চতুর্থবারের মতো প্রকাশিত হচ্ছে সাহিত্য সংকলন *তৃতীয় বাংলা*। যা প্রবাসী বাঙালিদের সাহিত্যচর্চার একটি পরিপক্ব বহিঃপ্রকাশ।

এই সংখ্যায় আমরা চেষ্টা করেছি এমন একটি পাঠযোগ্য সংকলন তুলে ধরতে, যেখানে নতুন কণ্ঠস্বরের সাথে রয়েছে অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখা–গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, পাঠপ্রতিক্রিয়া, স্মৃতিচারণ ও ভ্রমণব্লগের রচনায় নানা রঙে রাঙা এক সাহিত্য-বর্ণমালা।

লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব গুণগত বৈচিত্র্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। সময় ও পরিসরের সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সম্ভাবনাময় লেখা রাখা সম্ভব হয়নি, যা আমাদের আগামী দিনের কাজের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করার অনুপ্রেরণা জোগাবে। লেখকদের নাম সূচিতে বর্ণানুক্রমে স্থান দিয়ে আমরা সবার প্রতি সমান সম্মান জানাতে চেয়েছি।

তৃতীয় বাংলা কেবল একটি সংকলন নয়—এটি সময়ের দলিল। প্রবাসে বাংলা সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন জার্নালের এক ক্ষুদ্র কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি যাতে এই দূর বিলাতে আরও দৃঢ়মূল হয়, তার স্বপ্নই বুনেছে এই সংকলন।

আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রয়াসে পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সঙ্গ আমাদের পাথেয় হয়ে থাকবে।

সৈয়দ হিলাল সাইফ
সাহিত্য সম্পাদক
তৃতীয় বাংলা
ত্রয়োদশ বাংলাদেশ বইমেলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২৫
সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ যুক্তরাজ্য

প্রবন্ধ

ইশতেহার ও ইস্তেগফার : দুই নগরীর কাহিনি

আবু মকসুদ

মানুষের ইতিহাসে আদর্শ ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব এক অনিবার্য প্রপঞ্চ। কমিউনিজম ও ধর্ম–এই দুই পরস্পরবিরোধী ব্যবস্থার সংঘাত কেবল রাজনৈতিক বা দার্শনিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বিশ্ব সাহিত্য, বিশেষত বাংলা সাহিত্য এই দ্বন্দ্বকে গভীরভাবে প্রতিফলিত করেছে। কার্ল মার্কসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা থেকে শুরু করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর ধর্মনিরপেক্ষ নীতির কঠোর প্রয়োগ–সবই সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে। সাহিত্য হলো সমাজের দর্পণ, যা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের বিশ্বাস ও মতাদর্শের সংঘর্ষকে প্রতিফলিত করে। ধর্ম ও কমিউনিজমের সংঘাত শুধু তাত্ত্বিক নয় বরং বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও তা সুস্পষ্ট।

সাহিত্যিকরা এই সংঘাতকে কখনো সমর্থন করেছেন, কখনো বিরোধিতা করেছেন, আবার কখনো নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে এই দ্বন্দ্ব কখনো কবিতায়, কখনো উপন্যাসে, আবার কখনো প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পরবর্তী রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে এই সংঘাত আরও গভীর রূপ ধারণ করেছে। সাহিত্য শুধু সমাজের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বুঝতে সাহায্য করে না বরং মানুষের চেতনা ও বিশ্বাসের সংকটও প্রকাশ করে। এখানে আমরা বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের আলোকে এই সংঘাতের স্বরূপ ও তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করব, যেখানে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে কমিউনিজম ও ধর্মের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হবে।

কমিউনিজমের ধর্মবিরোধিতার মূলে রয়েছে মার্কসীয় দর্শন। মার্কসের মতে, ধর্ম হলো সামাজিক বৈষম্য ও শোষণের প্রতিফলন, যা মানুষকে বাস্তব সমস্যা থেকে বিমুখ করে। তাঁর বিখ্যাত উক্তি: "ধর্ম হলো নিপীড়িত প্রাণীর দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, আত্মাহীন পরিস্থিতির আত্মা। এটি মানুষের আফিম।"এই বক্তব্যের মাধ্যমে মার্কস বুঝাতে চেয়েছেন, ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয় বরং এটি শাসক শ্রেণির একধরনের শোষণযন্ত্র। শাসকদের এই উদ্দেশ্য হলো ধর্মকে ব্যবহার করে শ্রমিক শ্রেণিকে আত্মতুষ্টির মোহে ফেলে দেয়, যাতে তারা বিদ্রোহ করতে না পারে। কমিউনিজমের মূল লক্ষ্যই ছিল এই শোষণমূলক ব্যবস্থার

বিরুদ্ধে লড়াই করা, যাতে সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলো (সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, কিউবা) এই তত্ত্বকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দমন, ধর্মগ্রন্থ নিষিদ্ধকরণ এবং ধর্মচর্চাকে ব্যক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ করার নীতি গ্রহণ করে। রাষ্ট্রীয়ভাবে নাস্তিক্যবাদকে উৎসাহিত করা হয় এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও পশ্চাৎপদতার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়। এভাবে, কমিউনিজম ধর্মের বিরুদ্ধে শুধু তাত্ত্বিকভাবে নয় বরং নীতিগত ও প্রশাসনিকভাবে এক কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। তবে প্রশ্ন থেকেই যায়–ধর্ম কি সত্যিই শুধু শোষণের হাতিয়ার, নাকি এর মধ্যে মানবিকতা ও নৈতিকতার কোনো অবদান আছে? ধর্মের ভেতরে অগণিত মানুষ শান্তি ও সংহতি পায়, যা বস্তুবাদী দর্শন দিতে ব্যর্থ। এই দ্বন্দ্বের প্রতি সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গি বহু রকমের ছিল এবং সাহিত্যে এর প্রতিফলন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে এই দ্বন্দ্বের সবচেয়ে প্রাণবন্ত অভিব্যক্তি দেখা যায় কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায়। তাঁর কবিতা "মানুষ"-এ তিনি লিখেছেন : "মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!" নজরুলের এই ঘোষণা ধর্মের ঊর্ধ্বে মানবতাবাদী চেতনার জয়গান, যা পরোক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। তবে, তিনি ধর্মকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং ধর্মের যান্ত্রিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। নজরুলের সাহিত্য ধর্মীয় শোষণের বিরুদ্ধে হলেও, তা আধ্যাত্মিকতাকে সম্পূর্ণ বাতিল করেনি। বরং তিনি দেখিয়েছেন, প্রকৃত ধর্ম হলো মানবতার সেবা, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। তাঁর কবিতায় যেমন ইসলামের মুক্তিকামী দিকের প্রতিফলন দেখা যায়, তেমনই হিন্দু ধর্মের শোষণমূলক দিকের বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ লক্ষ করা যায়। ফলে নজরুলের সাহিত্য একদিকে যেমন কমিউনিজমের আদর্শের সঙ্গে মিলে যায়, অন্যদিকে তা ধর্মের মানবিক রূপকেও স্বীকার করে নেয়। নজরুলের মতে, ধর্মীয় মৌলবাদ থেকে মুক্ত হয়ে মানবতার মুক্তি অর্জন করতে হবে, যেখানে মানুষের মর্যাদা থাকবে সবচেয়ে বড়ো। তাঁর কবিতায় বিশ্বাসের চেয়ে মানুষের কল্যাণের পক্ষে অবস্থান নেওয়া, আসল সত্যের সন্ধান করা–এগুলোই ছিল মূল উপজীব্য। তাঁর দর্শন সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষের কল্যাণের জন্য সমানভাবে কাজ করার প্রেরণা প্রদান করেছিল।

অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজের ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের চিত্র ফুটে উঠেছে। শশী নামক চরিত্রের মাধ্যমে মানিক দেখান, কীভাবে ধর্ম ও অন্ধবিশ্বাস দরিদ্র মানুষকে আরও নিষ্পেষিত করে। এই উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক চেতনার আভাস থাকলেও, মানিক ধর্মের অন্তর্নিহিত মানবিক দিককেও অস্বীকার করেননি। মানিকের সাহিত্যে ধর্ম একটি সামাজিক বিষয় হিসেবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যেখানে তার সমালোচনার মূল লক্ষ্য ছিল কুসংস্কার ও শোষণ। তিনি দেখিয়েছেন, ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন করা, অথচ যখন তা শোষণের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা সমাজের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। তাঁর সাহিত্য ধর্ম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে একটি সমন্বয়মূলক তত্ত্ব তৈরি করতে চেয়েছে, যেখানে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সমাজের উন্নতির জন্য সংগ্রাম করা যাবে।

তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' (১৯৯৩) উপন্যাসে ইসলামীয় রক্ষণশীলতা ও নারীর অধিকারের সংঘাত চিত্রিত হয়েছে। যদিও তসলিমার লেখা সরাসরি কমিউনিজমের পক্ষে অবস্থান নেয় না, তবুও এটি ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী প্রতিবাদের প্রতীক। তসলিমার উপন্যাসে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে তাঁর উদ্বেগ স্পষ্ট, যেখানে ধর্মের নামে নারীদের উপর নির্যাতন ও বৈষম্য তুলে ধরা হয়েছে। ধর্মের নাম ব্যবহার করে নারীদের দমনের যে প্রথা চালু রয়েছে, তাতে তসলিমা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সাহিত্যে ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতি তীব্র আঘাত রয়েছে, যেখানে তিনি মহিলাদের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তসলিমা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবাদ হিসেবে ধর্মীয় শোষণের বিরুদ্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন, যা সমাজে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

রুশ সাহিত্যে ফিওদর দস্তয়েভস্কির 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ' (১৮৮০) ধর্ম, নৈতিকতা ও নাস্তিক্যের জটিল দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে। ইভান কারামাজভের "যদি ঈশ্বর না থাকেন, তবে সবই অনুমোদিত"—এই উক্তি অস্তিত্ববাদী সংকটের মূলে থাকা ধর্মহীনতার ভয়ংকর সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে। বিপরীতে, আলেক্সি কারামাজভের ধর্মীয় বিশ্বাস মানবিক প্রেম ও ক্ষমার মাহাত্ম্য প্রতিস্থাপন করে। দস্তয়েভস্কি যেন পূর্বাভাস দিয়েছিলেন : ধর্মহীন সমাজে নৈতিকতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। তাঁর সাহিত্যে ধর্মের অপরিহার্যতা, মানবিক দৃষ্টিকোণ এবং নৈতিকতার আলোচনা সমাজ ও ধর্মের মধ্যে এক গভীর দার্শনিক সংঘাত তৈরি করে। এর মধ্যে রয়েছে মানুষের আধ্যাত্মিক উদ্বেগ, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্ন এবং সঠিক পথে চলার তাগিদ।

মিখাইল বুলগাকভের 'দ্য মাস্টার অ্যান্ড মার্গারিটা' (১৯৬৭) সোভিয়েত রাশিয়ার নাস্তিক্যবাদী নীতির তীব্র সমালোচনা। উপন্যাসে ঈশ্বর-শয়তানের দ্বৈতবাদী উপস্থিতি এবং স্টালিনিস্ট রাষ্ট্রযন্ত্রের বাস্তবতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। চরিত্র প্রফেসর ওল্যান্ডের সংলাপ : "মানুষই কি সত্যিই ঈশ্বরকে নিয়ন্ত্রণ করে? নাকি ঈশ্বরই মানুষের নিয়ন্ত্রক?"—এ প্রশ্ন সমাজতন্ত্রের আত্মবিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে। এখানে বুলগাকভ রাশিয়ার কঠোর রাষ্ট্রীয় নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মানুষের স্বাধীনতার সংকটকে অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর সাহিত্য ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির মধ্যে যে টানাপোড়েন তৈরি হয়, তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছে, যা কমিউনিজমের ব্যর্থতার প্রতি একটি সৃষ্টিশীল প্রতিবাদ।

চীনা সাহিত্যে মাও যেদং-এর 'ইয়ান'আন ফোরাম অন লিটারেচার অ্যান্ড আর্ট, (১৯৪২) ভাষণে শিল্পকে শ্রেণিসংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত করার নির্দেশ

দেওয়া হয়। এর প্রভাবে অনেক লেখক ধর্মকে 'ফিউডাল সংস্কৃতি' হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তবে তিব্বতী কবি শা দুনের কবিতায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে, যা রাষ্ট্রীয় নীতির বিপরীতে অবস্থান নেয়। শা দুনের কবিতায় ধর্মের মহত্ত্ব, নৈতিকতা এবং মানবতার শক্তিশালী প্রতিফলন দেখা যায়, যা একদিকে সরকারের নির্ধারিত সামাজিক কাঠামোর বিরোধিতা করে এবং অন্যদিকে মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ দেখায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে **১৯১৭** সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর গির্জার সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়, ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ হয় এবং হাজারো ধর্মযাজককে গুলাগে নির্বাসিত করা হয়। স্তালিনের আমলে এই নীতি আরও কঠোর হয়। আলেক্সান্দ্র সোলঝেনিটসিনের 'দ্য গুলাগ আর্কিপেলাগো' (১৯৭৩)-এ কারাগারে বন্দি এক ধর্মযাজকের উদ্ধৃতি : "তারা আমার শরীরকে chain-এ বেঁধেছে, কিন্তু আমার আত্মাকে ঈশ্বরের সাথে বেঁধে রাখতে পারেনি।" এখানে সোলঝেনিটসিন রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের মাঝে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উদ্ধৃতি মনে করিয়ে দেয় যে, যদিও রাষ্ট্র ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে দমন করতে চায়, কিন্তু সত্যিকার আধ্যাত্মিক বিশ্বাস কখনো ধ্বংস হয় না।

চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব (১৯৬৬-১৯৭৬) কালে লাল গার্ডরা বৌদ্ধ মন্দির, খ্রিস্টান চার্চ এবং কুরআন পুড়িয়ে দেয়। মাওয়িস্ট নীতির বিরুদ্ধে লেখা নোবেলজয়ী লিউ শিয়াওবোর গল্প 'সেভেন্টিন ডিনার্স'-এ দেখা যায়, কীভাবে এক পরিবার গোপনে বৌদ্ধ প্রার্থনা চালিয়ে যায়, রাষ্ট্রের চোখে এটা 'অপরাধ' হলেও তাদের কাছে এটি মানবিক অধিকার। এই গল্পের মাধ্যমে লিউ শিয়াওবো ধর্মের স্বাধীনতার গুরুত্ব এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নকে প্রতিরোধের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন জনগণ কীভাবে কঠোর সরকারী নীতি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা দমন সত্ত্বেও তাদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ধরে রাখে এবং সেগুলোর মূল্য তাদের জীবনে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই প্রতিরোধের চিত্রই কমিউনিজম ও ধর্মের সংঘাতকে আরও স্পষ্ট করে তোলে, যেখানে শাসকশ্রেণির নিপীড়নকেও মানবিকতার কাছে হার মানতে হয়।

কমিউনিজম ধর্মকে উৎখাত করতে চেয়েছিল, কিন্তু মানুষের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক চাহিদাকে উপেক্ষা করেছিল। পোলিশ কবি চেস্লাও মিওশ (Czesław Miłosz) তাঁর কবিতায় লিখেছেন : "যে আদর্শ আমাদের কাঁদায় না, সে আদর্শ মৃত।" ধর্ম মানুষের সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্নের উত্তর দেয়, যা বস্তুবাদী দর্শন দিতে ব্যর্থ। মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদা, বিশ্বাস এবং আশা-ভালোবাসা এমন এক মৌলিক বিষয় যা কমিউনিজম ও ধর্মের দ্বন্দ্বের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। ধর্ম প্রস্তাব করে মানুষের জীবনের একটি আধ্যাত্মিক দিক, যা সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের অন্তরে এক অসীম স্থান অধিকার করে এবং তা সহজেই রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা দমন করা সম্ভব নয়। ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের

শোক, দুঃখ ও পরিত্রাণের অমোঘ প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে থাকে, যা কোনো আদর্শ বা দর্শন কখনো দিতে পারে না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কবি আল মাহমুদের 'সোনালি কাবিন' (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থে ইসলামী মূল্যবোধ ও বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের সমন্বয় দেখা যায়। এটি প্রমাণ করে, ধর্মীয় পরিচয় জাতীয়তাবাদ বা সমাজতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় বাংলার সংগ্রামী জনগণের মুক্তির চেতনাকে ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে একত্রিত করেছেন। তাঁর কবিতায় ধর্ম এবং স্বাধীনতার মিলন এক নতুন ধরনের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়, যেখানে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও, ধর্মের শোষণমূলক দিককে অস্বীকার করা হয়েছে।

কবিতার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, মুক্তির জন্য শুধু রাজনৈতিক সংগ্রামই নয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মুক্তিরও প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্ম এবং সমাজতন্ত্রের সংঘাতকে এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যেখানে ধর্মীয় সংবেদনশীলতা এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

কমিউনিজম ও ধর্মের সংঘাত মূলত বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিকতার দ্বন্দ্ব। বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্য এই দ্বন্দ্বের জটিলতাকে বহুমাত্রিকভাবে উন্মোচন করেছে। মার্কসীয় তত্ত্ব ধর্মকে 'আফিম' আখ্যা দিলেও সাহিত্য দেখিয়েছে–ধর্ম মানুষের আশা-ভালোবাসা-ভয়ের প্রতীক, যা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নেও মরেনি। সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিটি লেখক ধর্মের প্রতি তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন, যা কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন নয় বরং মানবিক অনুভূতির গভীরতার প্রতীক।

সাহিত্যিকরা কমিউনিজম ও ধর্মের সংঘাতকে শুধু রাজনৈতিক বা তাত্ত্বিকভাবে নয়, মানুষের অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের রূপেও চিত্রিত করেছেন। সাহিত্যের এই আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইতিহাসে আদর্শিক সংগ্রামে জয়ী হয় মানবিকতা; আর সাহিত্য তার সাক্ষী, যা সময়ের পরিক্রমায় মানব সমাজের প্রতিটি দ্বন্দ্বকে উন্মোচন করে।

রবীন্দ্রনাথ ও ইতালি

ড. মুকিদ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—একজন কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক চিন্তক ও সর্বোপরি এক বিশ্বনাগরিক—যাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযাত্রা ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ভেতরেও এক গভীর মানবিক স্পষ্টতা বহন করে। জাতীয়তাবাদ, ঔপনিবেশিকতা, আধুনিকতা ও বিশ্বসভ্যতার দ্বন্দ্বময় সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক অস্বস্তিকর অথচ নৈতিকভাবে অপরিহার্য কণ্ঠস্বর। এই বিশ্বনাগরিকতার স্বরূপ অনুধাবনের এক প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট ১৯২৫-এর ইতালি সফর। ভেনিস, ফ্লোরেনস, রোম ও পাদুয়ার এই যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ যেমন নবজাগৃতি-যুগের শিল্প-সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে গভীর কৃতজ্ঞতাভরে স্পর্শ করেন, তেমনই রাষ্ট্রীয়ভাবে সুসজ্জিত ফ্যাসিস্ট[১]-আতিথেয়তার মুখোমুখি হয়ে নিজের অন্তঃসত্তায় এক অন্তর্দ্বন্দ্বের শুরুতে পৌঁছেন।

এই প্রবন্ধে পর্যালোচনা করা হবে : সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিল ভাষ্য—একদিকে, রোমের প্রতাপশালী ফ্যাসিস্ট সরকারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ্য সৌজন্যপূর্ণ সম্পর্ক; অন্যদিকে, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও পরবর্তী লেখায় তাঁর ক্রমবর্ধমান সংকোচ ও প্রত্যাখ্যান। এটি কেবল রাজনৈতিক ইতিহাস নয় বরং এক কবির নৈতিক চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সততার আখ্যান। রবীন্দ্রনাথ নিজে যেমন বলেছেন : "আমার মনে হয়েছে, এখানকার রাষ্ট্রযন্ত্র মানুষের ভাবনাচিন্তাকে শিকল পরিয়ে দেয়।"[২]

ফ্যাসিবাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অবস্থান বুঝতে হলে তাঁর চিঠিপত্র, বক্তৃতা, দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ, ও অন্তর্দর্শনের এক পরিপূর্ণ পাঠে প্রবেশ করতে হয়। সেইসঙ্গে তুলনামূলকভাবে গান্ধি, রোমাঁ রল্যাঁ এবং ইতালীয় দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচের মতো চিন্তকের সঙ্গে তাঁর ভাবনার পার্থক্য ও সাদৃশ্য অনুধাবন করাও আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের ইতালি অভিজ্ঞতা এক অর্থে বর্তমান বিবেক ও রাষ্ট্রক্ষমতার দ্বন্দ্বের এক কালজয়ী রূপক। তাঁর অভিজ্ঞতা শেখায়—রাজনৈতিক আধিপত্যের সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা যতই মোহময় হোক-না কেন, নৈতিক স্বচ্ছতা ও মানবিক স্বাধীনতা ছাড়া সভ্যতা অপূর্ণ।

---

১ ফ্যাসিবাদ একটি দুর্দান্ত ডানপন্থি, কর্তৃত্ববাদী, অতিমাত্রায় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং আন্দোলন—যা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ক্ষমতা, একনায়কতন্ত্র, বিরোধিতার দমন এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ দ্বারা চিহ্নিত।

২ *চিঠি*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৫; সূত্র : Rabindranath Tagore : A Centenary Volume, Visva-Bharati, 1961, p. 387.

ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

রবীন্দ্রনাথের ১৯২৫-এর ইতালি সফরকে বোঝার জন্য অনিবার্যভাবে ফিরে তাকাতে হয়—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপীয় ভূরাজনৈতিক বিন্যাস এবং ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক আধিপত্য ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষাপটে।

ফ্যাসিবাদের উত্থান ও ইতালির রূপান্তর : ১৯১৯-এর পর ইউরোপে যে-রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়, তার অন্যতম ফলাফল ছিল ফ্যাসিবাদের উত্থান। ইতালির অর্থনৈতিক মন্দা, অভ্যন্তরীণ বামপন্থিবিপ্লবী-আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী বর্ণপরিচয়ের উদ্বেগ মিলে গড়ে তোলে এক অস্বচ্ছ, অথচ জনপ্রিয় রাজনৈতিক আবহ। ১৯২২-এ বেনিতো মুসোলিনি[৩] ক্ষমতায় আসেন 'রোমের দিকে যাত্রা'–নামক রক্তহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। তাঁর নেতৃত্বে ইতালিতে ফ্যাসিস্ট দল রাষ্ট্রের সর্বময় নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়। মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ ছিল জাতীয় গর্ব, শৃঙ্খলা, সামরিক ঐক্য এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আদর্শ; কিন্তু এই আদর্শ এক ভয়াবহ রাজনৈতিক নিপীড়নের পরিণতি ঘটায়। রবীন্দ্রনাথ এই ইউরোপীয় রাজনৈতিক পালাবদলের পর্যবেক্ষক ছিলেন মাত্র, কোনো নিছক পর্যটক নন। যদিও প্রাথমিকভাবে তিনি রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনার আড়ম্বরে আপ্লুত হন, অতঃপর খুব শীঘ্রই উপলব্ধি করেন এর অন্তর্নিহিত নৈতিক সংকট।

জাতীয়তাবাদ ও রবীন্দ্রনাথের অবস্থান : ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়টা ছিল ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ-আন্দোলন ও বর্জন-রাজনীতি, একদিকে ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয়তা, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের সহিংস দিক ও জাতিগত হিংসার আশঙ্কা থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে, স্বরাজ মানে কেবল রাজনৈতিক মুক্তি নয় বরং আত্মার মুক্তি; শিক্ষা, নৈতিকতা ও সংস্কৃতির স্বাধীনতা।[৩] তিনি স্পষ্টই বলেছেন : "রাজনৈতিক স্বাধীনতা যদি আত্মিক স্বাধীনতার অবসান ঘটায়, তবে সে স্বাধীনতা নয়, নতুন পরাধীনতা।"[৪] এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশ ও সংকটকে নতুন করে উপলব্ধি করতে শুরু করেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল শুধু ইতালির উপর নয়, সমগ্র ইউরোপজুড়ে এক ক্রমবর্ধমান রূপান্তর—যেখানে ব্যক্তি অধিকার ও সৃজনশীলতাকে দমন করে রাষ্ট্রীয় আদর্শের সর্বগ্রাসী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল।

ফ্যাসিবাদের প্রতি প্রাথমিক আকর্ষণ : ১৯২৫-এ ফ্যাসিস্ট-শাসনাধীন ইতালিতে রাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ গমন করেন। তাঁর গৃহীত অভ্যর্থনা ছিল অনন্য : ট্রেনে ট্রেনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়, সর্বত্র রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়, এমনকি রোমে মুসোলিনি নিজে তাঁকে দর্শন দেন। প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ এই

---

৩ Benito Amilcare Andrea Mussolini (1883 – 1945).

৪ *Nationalism*, Rabindranath Tagore, Macmillan, 1917.

আতিথেয়তায় বিস্মিত ও কৃতজ্ঞ বোধ করেন। চিঠিতে রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন : "ইতালির সরকার আমায় যে রকম আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে, তাতে আমি অভিভূত। এই দেশে একটি জাতীয় ঐক্যের শৃঙ্খলা আছে, শিল্প ও ইতিহাসের প্রতি যে শ্রদ্ধা এখানে দেখছি, তা আমাদের অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে যায়।"[৫] কিন্তু এই প্রশংসার ভেতরেও তিনি যেন এক গোপন প্রশ্ন বহন করেন—এই 'শৃঙ্খলা'র বিনিময়ে কেমন মূল্য মানুষকে দিতে হয়?

চিঠিপত্র ও মূল্যবোধ

রবীন্দ্রনাথের ১৯২৫-এর ইতালি সফর শুধু একটি পর্যটন বা সাংস্কৃতিক সফর ছিল না; এটি তাঁর নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবোধের পুনঃপরীক্ষার এক দর্পণ। ইতালির ফ্যাসিস্ট-শাসনাধীন পরিবেশ, ঐতিহাসিক শিল্প-ঐতিহ্য এবং রাজনৈতিক নাটকীয়তা—এই তিনটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিমজ্জিত করেন। তাঁর চিঠিপত্র এই অভিজ্ঞতার একান্ত সাক্ষী, যা তাঁর অন্তরের দ্বন্দ্ব এবং সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সংগ্রাম বুঝতে সাহায্য করে।

চিঠিপত্রে বক্তব্য ও অভ্যন্তরীণ সংকট : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেন যে, তিনি ইতালির ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের বাহ্যিক শক্তি ও শৃঙ্খলাকে সম্মান করেন, কিন্তু একই সঙ্গে সেগুলোর ভেতরে গোপন দমন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবক্ষয় দেখেছেন : "ইতালির রাষ্ট্র যে অদম্য শক্তি ও শৃঙ্খলা প্রদর্শন করছে, তা প্রাচীনকাল থেকে এই দেশে যে ঐতিহ্য ছিল তারই এক ধারাবাহিকতা। কিন্তু সেই শৃঙ্খলার অন্তরালে যে নির্যাতন এবং মানুষের মুক্তিবিরোধী ব্যবস্থা রয়েছে, তা আমি গভীরভাবে অনুভব করছি।"[৬] এই চিঠি থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ ইতালি রাষ্ট্রের সৌন্দর্য ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান রেখে অবস্থান নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মনোজগতের গভীরে ওই শৃঙ্খলা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য হুমকি হিসেবে কাজ করে।

মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব : রবীন্দ্রনাথের চিন্তা সারাজীবন ছিল ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সৃষ্টিশীলতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার। তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধে বারবার এই বার্তা ধ্বনিত হয়েছে যে, কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রও মানুষকে মানুষের অধিকারের বাইরে ঠেলে দিতে পারে না। তবে ইতালির ফ্যাসিস্ট-শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল একটি রাষ্ট্র—যা 'স্বৈরাচারী শৃঙ্খলা' আনার জন্য ব্যক্তির অধিকারকে বাধা দেয়। রবীন্দ্রনাথ এই রাষ্ট্রীয় আদর্শের বিরুদ্ধে ছিলেন, তবে সরাসরি প্রহার করার পরিবর্তে তাঁর চিঠি ও লেখায় তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তি উপস্থাপন করেন—যা একধরনের নৈতিক সমালোচনা এবং অন্তর্মুখী পুনর্বিবেচনা। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "আমি উপলব্ধি করছি যে, শৃঙ্খলার জন্য একটি রাষ্ট্রকে বলিদান দিতে হয়, কিন্তু

৫ *চিঠি*, রবীন্দ্রনাথ থেকে চারুপ্রসাদ রায়, ১৯২১; সূত্র : রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২২।

৬ *চিঠি*, রবীন্দ্রনাথ থেকে রথীন্দ্রনাথ, সেপ্টেম্বর ১৯২৫; সূত্র : Rabindranath Tagore : A Centenary Volume, Visva-Bharati, p. 388.

সেই বলিদান কখনোই মানবিক মুক্তির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। মুক্তি ছাড়া শৃঙ্খলা শূন্য।"[৭]

দর্শনীয় স্থান ও সাংস্কৃতিক সংস্পর্শ : রবীন্দ্রনাথ ইতালির বিভিন্ন ঐতিহাসিক শহর ভ্রমণ করেন—ভেনিস, ফ্লোরেন্স, রোম। সেখানে তিনি ইউরোপীয় নবজাগৃতি শিল্প ও স্থাপত্যের মাঝে এক গভীর মানবিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পান। তাঁর এক লেখায় উল্লেখ আছে : "ফ্লোরেন্সের শিল্পকলা এবং রোমের ইতিহাসে মানুষের অমরত্বের এক স্বপ্ন দেখতে পাই, যা রাষ্ট্রীয় শাসনের বাইরেও স্থায়ী। সেই স্থায়ী জ্ঞানই মানুষের প্রকৃত মুক্তির সন্ধান।"[৮] এই পর্যবেক্ষণ তাঁকে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শাসনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দ্বন্দ্ব বুঝতে সাহায্য করে।

ব্যক্তির মূল্যবোধের প্রতিফলন : রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে, বিশেষ করে রথীন্দ্রনাথকে, একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভাবনা বারবার উল্লিখিত হয়—'মানবতা' এবং 'স্বাধীনতা' যে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা দুটি অবিচ্ছেদ্য মূল্য। তিনি বলেছেন : "মানবতা যদি রাষ্ট্রের শৃঙ্খলার শিকল হয়ে যায়, তবে রাষ্ট্র আর মানুষের নয়, মানুষেরই রাষ্ট্রে পরিণত হয়।"[৯] এই উপলব্ধি তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে একটি মূখ্য ভিত্তি তৈরি করে, যেখানে তিনি রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের বিপরীতে মানবিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

দর্শন ও সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর ও তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বোধোদয়কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য প্রয়োজন ফ্যাসিবাদের দার্শনিক ভিত্তি এবং রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার মধ্যে তুলনামূলক পাঠ। এই অংশে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হবে ফ্যাসিবাদের রাষ্ট্রদর্শন, রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ ও স্বাতন্ত্র্যবাদের দর্শন, এবং সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের পারস্পরিক সাংঘর্ষিকতা ও সংমিশ্রণ কী রকম।

ফ্যাসিবাদের দার্শনিক ভিত্তি—জাতিবাদ ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চত্ব : ফ্যাসিবাদের জন্ম ও বিকাশ প্রধানত ইতালির সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে ঘটে। বেনিতো মুসোলিনির ভাবনায় রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়, যেখানে ব্যক্তি ও সমাজের চেয়ে রাষ্ট্রের শাসন ও ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী বেনেদেত্তো ক্রোচে[১০]—প্রাথমিকভাবে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ছিলেন—

---

৭ *চিঠি*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে রথীন্দ্রনাথ, অক্টোবর ১৯২৫; সূত্র : Rabindranath Tagore : A Centenary Volume, Visva-Bharati, 1961, p. 391.

৮ *চিঠি*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নভেম্বর ১৯২৫; সূত্র : Collected Letters of Rabindranath Tagore, Vol. IV, p. 412.

৯ *My Reminiscences of Italy*, Rabindranath Tagore, 1926, p. 54.

১০ Benedetto Croce (1866 – 1952).

ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞায় বলেন : "ফ্যাসিবাদ মানে স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অবমূল্যায়ন এবং রাষ্ট্রের সর্বস্বত্ববাদ।"[১১] তাছাড়া জর্জিয়ো আগামবেনি[১২] ও কার্ল শিমৎতের[১৩] মতো চিন্তাবিদরা ফ্যাসিবাদের অন্তর্নিহিত 'ক্ষমতা ও শাসনবাদ'-এর সংকট এবং আধুনিক রাষ্ট্রের অপ্রতিরোধ্যতা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।

দার্শনিক মানবতাবাদ : রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তা মূলত 'মানবতা' ও 'স্বাধীনতা' কেন্দ্রিক। তিনি ব্যক্তি ও সমাজের সংমিশ্রণে একটি সমন্বিত চেতনা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন—যা 'আত্মা' ও 'জগৎ'-এর মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থে ও 'জাতি ও ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন : "মানবতার যে এক অভিন্ন আত্মা, তার মধ্যে জাতি-ধর্মের অন্তরায়গুলো কেবল এক সাময়িক বিভাজন। সে আত্মার মুক্তিই প্রকৃত স্বাধীনতা।"[১৪] রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যক্তির মুক্তি রাষ্ট্রের শাসনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, রাষ্ট্র ব্যক্তি ও মানবতার উপরে নয়, তার সেবক।

সাংস্কৃতিক পাঠ : ইতালির ফ্যাসিস্ট-রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও শৃঙ্খলা অতি গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত; কিন্তু এই ঐতিহ্যও রাষ্ট্রীয় আদর্শের জন্য দমনমূলক হতে পারে। অপরদিকে, রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক দর্শনে, ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বহুমাত্রিকতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং মুক্তচিন্তার স্থান পেয়েছে। ভারতবর্ষীয় দর্শন যেমন বেদান্ত ও বৌদ্ধধর্মে অন্তর্মুখী মুক্তির কথা বলা হয়, তেমনই রবীন্দ্রনাথ শিল্প ও সৃজনশীলতাকে মুক্তির এক মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন। তাঁর 'বাংলার সংস্কৃতি' প্রবন্ধে উল্লেখ আছে : "বাংলার সংস্কৃতির মাধুর্য তার বহুমাত্রিকতায়, যেখানে এক সময় স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার মধ্যে সুরক্ষিত সামঞ্জস্য ছিল।"[১৫]

ফ্যাসিবাদ-রাষ্ট্রের বিপরীতে স্বাধীনতা-দর্শন : ফ্যাসিবাদের রাষ্ট্র যে সমস্ত ব্যক্তিস্বাধীনতাকে দমন করে, রবীন্দ্রনাথ সেগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জায়গা হিসেবে দেখেন; কিন্তু তিনি একই সঙ্গে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তাকেও অগ্রাহ্য করেননি, তবে সেটি মানুষের মুক্তির জন্য হওয়া উচিত বলে দাবি করেন। এই দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ফ্যাসিবাদের একধরনের 'অত্যধিক রাষ্ট্রতন্ত্র' বনাম 'ব্যক্তির স্বাধীনতা'র সংবেদনশীল ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বলে ধরা যেতে পারে।

দার্শনিক প্রভাব : রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ওপর প্রভাব ফেলে ইমানুয়েল ক্যান্টের নৈতিকতাবাদ, যেখানে 'স্বাধীনতা' ও 'নৈতিকতা' গুরুত্ব পায়। ফ্যাসিবাদের বিপরীতে ক্যান্টের মতবাদ : 'ব্যক্তির মর্যাদা ও সম্মান' অপরিহার্য। তাছাড়াও,

---

১১ *What is Fascism?*, Benedetto Croce, 1925.

১২ Giorgio Agamben (Born : 22 April 1942).

১৩ Carl Schmitt (1888 – 1985).

১৪ *Nationalism*, Rabindranath Tagore, Macmillan, 1917, p. 42.

১৫ *বাংলার সংস্কৃতি*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার, ১৯৩০, পৃষ্ঠা ৭৬।

রবীন্দ্রনাথের 'আত্মা' ও 'বিশ্ব' সংক্রান্ত দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে হেগেলের[১৬] ঐতিহাসিক প্রগতিবাদের একটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, যেখানে ইতিহাস ও রাষ্ট্র ব্যক্তির আত্ম-উন্নতির এক মাধ্যম।

রবীন্দ্রনাথ ও রোমে ফ্যাসিস্ট-ব্যবস্থার পর্যালোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতালি সফরকালীন সময়ে (১৯২৬-১৯২৭) ইতালিতে বেনিতো মুসোলিনির নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থা শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর রাজনৈতিক-বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক মুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন।

ইতালির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ফ্যাসিস্ট-শাসন : ১৯২২-এ মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট দল ক্ষমতা দখল করার পর ইতালিতে গড়ে ওঠে এককেন্দ্রিক, কঠোর শাসনব্যবস্থা, যেখানে রাজনৈতিক বিরোধিতা নিষিদ্ধ, গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণাধীন এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারাবাহিক অবক্ষয় ঘটে। ফ্যাসিবাদ মূলত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চত্ব ও জাতীয় ঐক্যের ওপর জোর দেয়। মুসোলিনি নিজের মঞ্চভাষণে রাষ্ট্রকে 'জাতির জীবনের ধর্ম' হিসেবে অভিহিত করেন।[১৭] রবীন্দ্রনাথের সময় ইতালির এই অবস্থার জ্ঞানলাভ হয় মূলত তাঁর ইতালি সফরের মাধ্যমে। তিনি রোমে অবস্থানকালে ফ্যাসিস্ট-বুর্জোয়া সমাজ ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন—যা তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক চিন্তায় প্রভাব ফেলে।

ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থার সমালোচনা : রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের মূলনীতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি রাষ্ট্রের একতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর চিঠিপত্র ও নিবন্ধে এই বিষয়ে স্পষ্টভাব প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২৭-এর এক চিঠিতে লিখেছেন : "যেখানে রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ স্থানে বসানো হয়, সেখানে মানুষ তার নিজস্ব অস্তিত্ব হারায়; সেই রাষ্ট্রই হয় মানুষের শত্রু।"[১৮] তিনি একত্রিত রাষ্ট্রের বাহ্যিক শক্তি ও শৃঙ্খলাকে মানবিক মুক্তির শত্রু হিসেবে দেখেছেন। যদিও তিনি রাজনৈতিক বিশ্লেষণে সরাসরি 'ফ্যাসিজম' শব্দটি খুব কম ব্যবহার করেছেন, তবে তাঁর চিন্তাধারায় ফ্যাসিস্ট-আদর্শের বিপরীতে স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়ে গেছে।

সাংস্কৃতিক ও মানসিক পর্যায় : রবীন্দ্রনাথের জন্য সংস্কৃতি এবং সৃজনশীলতা ছিল স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর মতে, ফ্যাসিস্টব্যবস্থার একরৈখিক রাষ্ট্রনীতি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও মুক্তচিন্তার বিকাশে প্রতিবন্ধক। 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে

---

১৬ Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831).

১৭ *The Doctrine of Fascism*, Benito Mussolini, 1932.

১৮ *চিঠিপত্র*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার।

তিনি নিজেই এক মুক্তমনা শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেন, যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতা সর্বোচ্চ মূল্য পায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্যাসিস্ট-কর্তৃত্ববাদ তাঁর আদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল না।

রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও মানবতাবাদ : রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা প্রধানত মানবতাবাদের ভিত্তিতে নির্মিত; যেখানে জাতি, ধর্ম বা রাষ্ট্রের চেয়ে মানুষের সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'জাতি ও ধর্ম' প্রবন্ধে লিখেছেন : "জাতি ও ধর্মের অতিরিক্ত আবেশ যদি মানুষের মুক্তি বিঘ্নিত করে, তবে তার অস্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ।"[১৯] ফ্যাসিস্ট-রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের মূল্যবোধ ছিল একধরনের প্রতিরোধ। তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার চূড়ান্ত লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ছিলেন।

অভিজ্ঞতা ও প্রতিবাদ : ইতালি সফরের সময় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ফ্যাসিস্ট-শাসক বেনিতো মুসোলিনির সঙ্গে দেখা হয়, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ফ্যাসিস্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। এই সময়ের চিঠিপত্রে ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার উল্লেখ করেছেন : "আমি দেখতে পাই একটি এমন সমাজ যা বাহ্যিক সমৃদ্ধিতে আবদ্ধ, কিন্তু অন্তর্নিহিত মানবিক মুক্তির জন্য সংকটাপন্ন।"[২০] রবীন্দ্রনাথের এই পর্যবেক্ষণ ফ্যাসিস্ট ইতালির মানসিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের প্রতিফলন।

মোড় ঘুরে—"আত্মাসিদ্ধি" আত্মসমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতালি সফরের প্রেক্ষাপটে তাঁর রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তায় এক গভীর মোড় এসেছে, যা তিনি নিজে 'আত্মাসিদ্ধি'র প্রসঙ্গ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই পর্যায়ে তিনি নিজেকে এবং তাঁর পূর্ববর্তী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কঠোর আত্মসমালোচনা করেন। এক পরিমার্জিত দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান করেন।

আত্মসমালোচনার প্রেক্ষাপট : ১৯২৬-১৯২৭ সময়পর্বে ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পান ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থার প্রকৃতস্বরূপ—যা তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও মানবতাবাদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এই অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার পুনর্মূল্যায়নে বাধ্য করে। তিনি উপলব্ধি করেন যে, তাঁর পূর্বকার নিরপেক্ষবোধ ও নিভৃতচিন্তা প্রায় সময়ই বাস্তব রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

---

১৯ *Nationalism*, Rabindranath Tagore, Macmillan, 1917, p. 55.

২০ *চিঠিপত্র*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২৬, বিশ্বভারতী সংরক্ষণ।

'আত্মাসিদ্ধি' ধারণার উৎস ও অর্থ : 'আত্মাসিদ্ধি' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ও আত্মজীবনীমূলক লেখায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এটি তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা ও মননের পরিশোধনকে নির্দেশ করে, যেখানে তিনি নিজের রাজনৈতিক আশাবাদ ও দার্শনিক নিভৃতচিন্তাকে মোকাবিলা করেন। ১৯২৭-এর এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন : "আমার ভাবনার পাথেয় ছিল মানবতার সার্বভৌম সত্য। কিন্তু সেই সত্যের আদর্শায়ন করতে গিয়ে আমি বুঝতে পারিনি, বাস্তবের গাঢ় অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধে কখনো কখনো কঠোরতা ও বিপ্লবী শক্তির প্রয়োজন।"[২১] এই উক্তিতে স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নরম মানবতাবাদী মনোভাবকে পুনর্মূল্যায়ন করছেন—যা হয়তো রাজনৈতিক বাস্তবতাকে যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

পূর্ববর্তী আদর্শ ও বাস্তবতার সংঘাত : রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিবিদ্যা ও দার্শনিক মূল্যবোধে একরকম নিভৃত এবং গৌরবময় বিশ্বাস বিরাজমান—যা জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা ও মানবতার চিরন্তন উচ্চ মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত। তবে ইতালির ফ্যাসিস্ট-শাসনের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেন যে, রাজনৈতিক সংগ্রামে শুধু আদর্শ আর শান্তিপূর্ণ মনোভাব যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্র ও সমাজের গঠনমূলক পরিবর্তনের জন্য শক্তিশালী প্রয়াস অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি তাঁকে আত্মসমালোচনার দিকে পরিচালিত করে, যেখানে তিনি নিজের 'শান্তিপূর্ণ' রাজনীতিবিদ্যা এবং 'মানবিক' মূল্যবোধের মধ্যে প্রয়োজনীয় কঠোরতার অভাবকে স্বীকার করেন।

সাহিত্যে ও চিন্তায় আত্মসমালোচনার প্রকাশ : রবীন্দ্রনাথের 'আত্মাসিদ্ধি' কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তাধারায়ও গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। তাঁর কবিতায়, তাঁর প্রবন্ধে একধরনের আভাস পাওয়া যায়, যেখানে তিনি নিজের পূর্ববর্তী ভাবনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নতুন দিশা খুঁজছেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর 'নতুন পৃথিবীর সন্ধানে' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : "অন্তরের অন্ধকারে ডুব দিয়ে, নিজেকে সিদ্ধ না করলে, বাইরে জগৎ কখনো শুদ্ধ হবে না। এই সিদ্ধি কঠোর হলেও অবশ্যম্ভাবী।"[২২] এখানে 'আত্মাসিদ্ধি' মূলত আত্মচিন্তার এক গভীর প্রক্রিয়া—যা মনুষ্যত্বের পুনরুজ্জীবনের ভিত্তি।

আত্মসমালোচনার রাজনৈতিক প্রভাব : রবীন্দ্রনাথের এই আত্মসমালোচনামূলক মনোভাব তাঁকে রাজনৈতিক প্রান্তিকতায় ঠেলে দেয়নি বরং তাঁর চিন্তার পরিধি প্রসারিত করে। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন ও সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের জন্য কেবল নরম মানবতাবাদ যথেষ্ট নয়; বরং যুক্তি, বাস্তবতা ও প্রয়োগযোগ্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি : "বিপ্লবী চিন্তা যখন নিভৃতশীলতার সীমানা ছাড়িয়ে বাস্তবের মাঝে প্রবেশ করে, তখন সত্যিকারের পরিবর্তন

---

২১ *চিঠিপত্র*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার।

২২ *নতুন পৃথিবীর সন্ধানে*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২৮, পৃ. ৪২।

সম্ভব।"[২৩] এখানে 'আত্মাসিদ্ধি' বা আত্মসমালোচনা তাঁর নিজস্ব চিন্তার আত্ম-উন্নতি ও বাস্তব-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার এক নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে।

ফ্যাসিস্ট-বুদ্ধিজীবীদের বিপরীতে রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিবৃত্তি

ফ্যাসিস্ট-বুদ্ধিজীবীদের মনস্তাত্ত্বিক কৌশল : ইতালির ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধিজীবীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বেনিতো মুসোলিনির শাসনামলে ফ্যাসিস্ট-বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রবাদী ও কর্তৃত্ববাদী আদর্শকে ত্বরান্বিত করতে মনস্তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক কৌশল প্রয়োগ করেন। তাঁরা মূলত জনমনে ভীতি, নীতিবোধের বিভ্রান্তি ও জাতীয়তাবাদের উত্তেজনা সৃষ্টি করেন—যা রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থায়ী করতে সহায়তা করে। আন্তর্জাতিক দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ইতালির এই কৌশলকে 'বৈষম্যমূলক জাতীয়তাবাদ' এবং 'সংস্কৃতির পুনর্গঠন' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কার্লো রসেলিনি তাঁর 'ফ্যাসিজম এবং সংস্কৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন : "ফ্যাসিস্ট-বুদ্ধিজীবীরা জনগণের মধ্যে ঐক্য ও তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টির জন্য তাদের মনস্তত্ত্ব ও অনুভূতি নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া শিখে নিয়েছিল, যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আলাপ-আলোচনার সুযোগ সীমাবদ্ধ রাখা হয়।"[২৪]

রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিবৃত্তি : রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিবৃত্তি মূলত মানবিকতার প্রতি নিবেদিত ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মুক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথ মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সম্মিলনে নিহিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দার্শনিক চিন্তায় ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাম্যের তত্ত্ব এবং মননের মুক্তির উপর জোর দেন। তাঁর সাহিত্য ও দার্শনিক গ্রন্থে এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। 'মনঃসংযোগ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন : "মানবতা শুধু স্বাধীনতার অধিকার নয় বরং ঐক্য ও প্রেমের সেতুবন্ধনও দাবি করে, যা দমন বা কর্তৃত্ববাদী শক্তির বিপরীত।"[২৫]

কৌশলগত পার্থক্য : ফ্যাসিস্ট-বুদ্ধিজীবীরা জনগণের চিন্তা ও মনোবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবল দমনমূলক কৌশল অবলম্বন করেন, যেখানে সমালোচনার সুযোগ প্রায় শূন্য। তাঁরা সংস্কৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে নিজস্ব আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিবৃত্তি মুক্তচিন্তার বিকাশে বিশ্বাসী। তিনি সংস্কৃতির স্বাধীনতা ও বহুমাত্রিকতা রক্ষার পক্ষে। তাঁর মতে, সত্যিকার সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তি মুক্ত-আত্মার প্রকাশ—যা বাধ্যতামূলক মানসিকতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মানবজীবনের জটিলতা ও বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি দেয়।

সাংস্কৃতিক সংঘাত ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া : রবীন্দ্রনাথ ইতালির ফ্যাসিস্ট-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর সাংস্কৃতিক আদর্শের পার্থক্য অনুভব করে সেটিকে সমালোচনা

---

২৩ *চিঠিপত্র*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২৭, বিশ্বভারতী সংরক্ষণ।

২৪ *ফ্যাসিজম এবং সংস্কৃতি*, কার্লো রসেলিনি, ১৯৩২, পৃষ্ঠা ৫৪।

২৫ *মনঃসংযোগ*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২৫, পৃষ্ঠা ১২৩।

করেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য : "যেখানে এক ধরনের নিপীড়ন ও বাধ্যবাধকতা সংস্কৃতিকে দমন করে, সেখানে প্রকৃত শিল্প ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সম্ভব নয়। মুক্তচিন্তার বিকাশ ছাড়া সভ্যতা দিকহীন পথ হাঁটবে।"[২৬]

রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ও রবীন্দ্রনাথের দর্শন : ফ্যাসিস্ট-বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ছিল তাঁদের শাসকের প্রতি। তাঁরা ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হন। এই স্বৈরাচারী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে রবীন্দ্রনাথের দর্শন মানবতাবাদী, যেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থা মানবকল্যাণ ও মানবমুক্তির সেবা করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি তার মানুষের মুক্তি ও সমৃদ্ধিতে নিহিত। অন্যথায় তা নিছক এক যন্ত্র, যা মানুষকে শৃঙ্খলিত করে রাখে।"[২৭]

সমকালীন তুলনা

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন সমকালীন, তবে তাঁদের দার্শনিক অবস্থান ও পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীর পার্থক্য বিদ্যমান। গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ ছিল জন-রাজনীতির শুদ্ধিকরণ প্রচেষ্টা, যেখানে তিনি বল প্রয়োগ না-করে নৈতিক অবস্থান ও আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ—যদিও গান্ধীর নৈতিক অবস্থানের প্রশংসা করেন—তাঁর 'চোখের বদলে চোখ' ধরনের রাজনৈতিক আত্মদানের দর্শনের বিরুদ্ধে মানবিকতাবাদী সতর্কতা উচ্চারণ করেন। ১৯২১-এর এক চিঠিতে গান্ধীকে লিখেছেন : "আমি মনে করি, জাতির শুদ্ধির জন্য কেবল আত্মবিসর্জন যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সেই আলো, যা আত্মাকে মুক্ত করে বিবেকের আকাশে।"[২৮] রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ব্যক্তিস্বাধীনতা; মননের ও সৌন্দর্যের এক পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি; যেখানে আত্মত্যাগ নয়, আত্মাসিদ্ধিই মুখ্য।

রোমাঁ রলঁ্যা[২৯]—নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তি ও 'বিশ্বমানব' : রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও ইউরোপীয় নৈতিক মানবতাবাদের একজন উজ্জ্বল প্রতিনিধি রোমাঁ রলঁ্যা। তিনি ফ্যাসিবাদের ঘোরতর বিরোধিতা করেন। ১৯২০-এর দশকে ইউরোপজুড়ে জাতীয়তাবাদ ও সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে লিখেছেন : "আমরা যদি বাঁচতে চাই, তবে প্রথমে আমাদের চিত্তকে স্বাধীন করতে হবে, রাষ্ট্রের ভয়ের সংজ্ঞা থেকে।"[৩০] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর চিন্তায় সাযুজ্য রয়েছে—বিশ্বজনীন মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক মুক্তি ও নৈতিক নান্দনিকতা। তাঁদের উভয়ের কাছে ফ্যাসিবাদ ছিল আত্মার পরাজয়। রবীন্দ্রনাথ

---

২৬ *চিঠিপত্র*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার।

২৭ *রাষ্ট্র ও মুক্তি*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২৬, পৃষ্ঠা ৬৭।

২৮ *চিঠিপত্র*, গান্ধীকে লেখা পত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২১, বিশ্বভারতী সংরক্ষণ।

২৯ Romain Rolland (1866 – 1944).

৩০ *Against Militarism*, Romain Rolland, 1923.

সম্পর্কে রোমাঁ রলাঁ্যা মন্তব্য করেছেন : “তিনি ভারতবর্ষের শুধু কবি নন, ইউরোপের বিবেকের অনুরণনও। তাঁর কণ্ঠে রয়েছে সেই শান্ত প্রতিরোধ—যা বন্দুকের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।”[৩১]

বেনেদেত্তো ক্রোচে[৩২]*—ফ্যাসিবাদের দার্শনিক প্রতিবাদ :* ইতালির মধ্যেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে বিরল কিন্তু দৃঢ় দার্শনিক প্রতিবাদ ওঠে, তার মুখ্য প্রতিনিধি ছিলেন বেনেদেত্তো ক্রোচে। ফ্যাসিস্ট-যুগে যখন অনেক বুদ্ধিজীবী চুপ ছিলেন, ক্রোচে তখন রচনা করেন তাঁর *ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মেনিফেসতো*[৩৩] (১৯২৫) গ্রন্থটি, এখানে স্পষ্টতই বলেছেন : “যে-রাষ্ট্র আত্মার স্বাধীনতাকে গ্রাস করে, সেই রাষ্ট্র নিজের শক্তিকেও শেষপর্যন্ত ধ্বংস করে।”[৩৪] এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের ভাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলে যায়। রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রের দমন ও আত্মার মুক্তির দ্বন্দ্বকে দেখেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক ‘চিঠিপত্র’ ও ‘রাষ্ট্র ও মুক্তি’ প্রবন্ধে। ফ্যাসিস্ট-রাষ্ট্রের আদর্শিক বিপজ্জনকতা দেখেছিলেন সামাজিক ও নৈতিকভাবে।

তুলনামূলক পর্যালোচনা : নিম্নের চতুর্মুখী পাঠে স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ক্রোচে ও রলাঁ্যার নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তির ঘনিষ্ঠতর, যেখানে গান্ধীর অবস্থান রাজনৈতিক নৈতিকতাকেন্দ্রিক হলেও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধে কিছুটা ক্ষীণ।

বিষয়	**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**	**মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী**	**রোমাঁ রলাঁ্যা**	**বেনেদেত্তো ক্রোচে**
মূল দর্শন	মানবিকতা ও সাংস্কৃতিক মুক্তি	নৈতিক অহিংস প্রতিরোধ	নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তি এবং বিশ্বনাগরিকতা	নৈতিক ইতিহাসবাদ ও স্বাধীনতা
ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি	সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বিপরীতে মুক্তির স্বপক্ষ	উপেক্ষা (মূলত ব্রিটিশবিরোধিতা মুখ্য)	সক্রিয় মানবিক প্রতিবাদ	দার্শনিক প্রতিবাদ ও আত্মার স্বাধীনতা
রাষ্ট্রের ভূমিকা	মানুষের মুক্তির সহায়ক	নৈতিক নেতৃত্বের বাহক	নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষাকারী	স্বাধীনতা রক্ষাকারী কাঠামো

৩১ *Rabindranath : The Voice of the East*, Romain Rolland, 1924.
৩২ Benedetto Croce (1866 – 1952).
৩৩ *Manifesto of the Anti-Fascist Intellectuals*, Benedetto Croce, 1925.
৩৪ *Manifesto of the Anti-Fascist Intellectuals*, Benedetto Croce, 1925.

আত্মার স্বাধীনতার বিপরীতে রাষ্ট্র-কাঠামো

রবীন্দ্রনাথে ইতালি সফর শুধু একটি ভ্রমণ নয় বরং এক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক মুহূর্ত—যেখানে একজন কবি, এক বিশ্বমানব, এক নৈতিক শিল্পীর আত্মা ছুঁয়ে দেখেছে একটি রাষ্ট্রের কাঠামোগত নিষ্ঠুরতাকে। ইতালি সফর তাঁকে বাধ্য করে তাঁর গভীর বিশ্বাসসমূহকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার, পরীক্ষার এবং সর্বোপরি এক আত্মাসিদ্ধির দিকে যাত্রা শুরু করার। রোমে রবীন্দ্রনাথ যে-সম্মান পেয়েছিলেন—রাজকীয় আতিথেয়তা, দু'সপ্তাহব্যাপী আলোচনা, ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রযন্ত্রের বাহ্যিক সৌজন্য—তা কোনোভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করেনি; বরং এই অত্যাশ্চর্য আতিথেয়তার নিচে অনুভব করেন এক 'অদৃশ্য কারাগার', যেখানে বুদ্ধিবৃত্তি শৃঙ্খলিত, মত প্রকাশ সাংগঠনিক, সংস্কৃতি দমনমুখী ঐক্যবাদের হাতে বন্দি। তাঁর নিজস্ব আত্মসমালোচনা—যা আত্মাসিদ্ধির পথে তাঁকে চালিত করে—ছিল অনন্য; কারণ, তা কেবল রাজনৈতিক অবস্থান নয় বরং আত্মিক ও নৈতিক উপলব্ধির ফসল। এই পরিবর্তনের একটি চিহ্ন পাওয়া যায় তাঁর রোম ত্যাগের কয়েক মাস পর লিখিত চিঠিতে, যেখানে বলেছেন : "আমি বুঝিতে পারিলাম, বাহ্যিক সৌন্দর্যের মধ্যে সত্য লুকায় না; সত্য থাকে সেইখানে, যেখানে আত্মার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে।"[৩৫] এই উপলব্ধির পথ তাঁকে ক্রমান্বয়ে যুক্ত করে রোমাঁ রল্যাঁ, বেনেদেত্তো ক্রোচে প্রমুখ ইউরোপীয় মানবতাবাদীদের সঙ্গে—যাঁরা ফ্যাসিবাদকে শুধু রাজনৈতিক নয়, নৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক সংকট হিসেবে দেখেন।

ইতালি-অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা : **ক.** রাষ্ট্রের বাহ্যিক জাঁকজমক নৈতিক মুক্তির প্রতিপক্ষ হতে পারে; **খ.** বুদ্ধিবৃত্তি যদি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, তবে সংস্কৃতি হয়ে ওঠে প্রোপাগান্ডার হাতিয়ার; **গ.** একজন শিল্পীর দায়িত্ব কেবল সৃষ্টি নয় বরং সত্যকে উপলব্ধি ও উচ্চারণও; **ঘ.** আত্মাসিদ্ধি তখনই সম্ভব, যখন শিল্পী নিজেকে প্রশ্ন, সংশোধন এবং নির্ভীকভাবে নতুন অবস্থান গ্রহণ করতে পারেন।

উত্তরাধুনিক পাঠের প্রাসঙ্গিকতা : রবীন্দ্রনাথের ইতালি-অভিজ্ঞতা আজকের দিনে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক—যখন রাষ্ট্র, বাজার, ও মিডিয়া মিলে একটি একরৈখিক মতাদর্শ চাপিয়ে দিতে চায়। তাঁর আত্মসমালোচনার ঐতিহাসিক সাহস, তাঁর অবস্থান পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত। শেখায় শিল্প ও বুদ্ধিবৃত্তির একমাত্র নিয়ত গন্তব্য—স্বাধীনতা। রোমের সেই অভিজ্ঞতা, ফ্যাসিস্ট সৌজন্যের অন্তর্গত নিঃশব্দতা ও নিজস্ব অবস্থানের পুনর্বিবেচনা—সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ রেখে গিয়েছেন এক অনন্য রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নৈতিক অনুশাসন। তাঁর উত্তরাধিকার এখন শুধু কাব্যিক নয় বরং এক বিস্তৃত নৈতিক ভাষ্য—যেখানে আত্মাসিদ্ধি এক কবির, এক রাষ্ট্রচিন্তকের এবং এক মানুষের চূড়ান্ত পরিচয়।

৩৫ *Letter to Rothenstein*, Rabindranath Tagore, 1925; Collected Letters, Vol. 3, Visva-Bharati.

বাংলা সাহিত্যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি

ফারুক আহমদ

ভূমিকা

লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব থেকে ‘বাংলা সাহিত্যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য আমাকে বলা হয়েছে। শুরুতেই বলে রাখি যে, এ শিরোনামটি আমার পছন্দ না। কারণ, প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর পরিচিতিপর্বে তার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়টা প্রথমে আসে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, অভিবাসী অধ্যুষিত দেশগুলোতে বিশেষ করে আমেরিকার মতো বহুজাতির দেশে—আমেরিকান কেনিয়ান, আমেরিকান জ্যামাইকান বলা হয় না। সম্ভবত ব্রিটেনে এর ব্যতিক্রম।

ব্রিটেনে নৃতাত্ত্বিক পরিচয়টা শেষে নিয়ে আমাদেরকে ‘ব্রিটিশ বাংলাদেশি’ বা ‘ব্রিটিশ-বাঙালি’ হিসেবে পরিচয় দানের সূচনা ব্রিটিশেরা করেনি, করেন লন্ডনবাসী বাঙালি লেখক-সাংবাদিক আমির আলী। তিনি দীর্ঘদিন ব্রিটিশ সরকারের ‘কমিশন ফর রেশিয়াল ইকুয়ালিটি’র গবেষণা বিভাগের প্রধান ছিলেন। ১৯৮৫ সালে তার রচিত একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হাউস অফ কমন্স হোম অ্যাফেয়ার্স কমিটি ১৯৮৬ সালে ‘বাংলাদেশিজ ইন ব্রিটেন’ নামে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে ‘অ্যাথনিক কোয়েশ্চেনেয়ার’-এর রচয়িতাও ছিলেন তিনি।□ আমীর আলী তার উল্লিখিত শ্বেতপত্র ও প্রশ্নপত্রে ‘ব্রিটিশ বাংলাদেশি’ শব্দ দুটি ব্যবহার করায় বর্তমানেও এর ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু বিগত প্রায় চার দশক ধরে আমি আমার কোনো লেখায় এটি ব্যবহার না করে সব সময় সতর্কতার সঙ্গে ‘বাঙালি-ব্রিটিশ’ অথবা ‘বাংলাদেশি ব্রিটিশ’ শব্দ দুটো ব্যবহার করে আসছি বিধায় লেখায়ও সেটা ব্যবহার করেছি।

দ্বিতীয়ত, শিরোনামে ‘বাঙালি’র পরিবর্তে বলা হয়েছে ‘বাংলাদেশি’। বাংলাদেশের সংবিধানের ৬ ধারার ২ উপধারায় বলা হয়েছে যে, ‘বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন”। সে হিসেবে আমার প্রবন্ধটি ‘বাঙালি’দের নিয়ে নয়, বাংলাদেশিদের নিয়ে। পরিণামে, এ প্রবন্ধে বিলাতবাসী বাংলাদেশের বাইরের বাঙালি সাহিত্যিকদের এ ছকে ফেলতে পারিনি। আবার শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের কথাটি থাকায় বিলাতবাসী বাংলাদেশি নতুন প্রজন্মের লেখকদের কথাও বাদ দিতে হচ্ছে। ফলে লেখাটি অনেকটা বাংলা সাহিত্যে বাংলাদেশিদের সাহিত্যসেবীদের পরিচিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে।

কারা বাংলা সাহিত্যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি

এর উত্তর হচ্ছে, বিলাতের যারা বাংলায় সাহিত্য চর্চা করেন তারা মূলত বাংলাদেশ থেকে লেখাপড়া করে উচ্চশিক্ষার্থে, বৈবাহিকসূত্রে, কর্মসূত্রে এবং মাতাপিতার পোষ্য হিসেবে আসা বাংলাদেশি। এদের বেশিরভাগেরই লেখাপড়া ও সাহিত্য চর্চা বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ থেকে মোটামুটি লেখকখ্যাতি নিয়ে আসা প্রধানত বাঙালি। যেহেতু বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে আমাদের জাতীয় পরিচয় হচ্ছে বাংলাদেশি, তাই আলোচনার সুবিধার্থে বাংলাদেশি-ব্রিটিশ সাহিত্যসেবীদেরকে দশকওয়ারি সাজালে এর যে চিত্র পাওয়া যায় তা হলো:

বিশ শতকের সত্তরের দশক

১৯৭০-এর দশক থেকে যারা বিলাতে সাহিত্য চর্চা করেছেন এবং এখনো যারা করছেন সে তালিকায় পড়েন–তাসাদ্দুক আহমদ, আবদুল মতিন, সিরাজুর রহমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আমীর আলী, সৈয়দ শামসুল হক, শফিক রেহমান, এম. আর. আখতার মুকুল, নুরুল ইসলাম, মাহমুদ হাসান, আব্দুর রউফ চৌধুরী, শেখ আব্দুল মানান, ডা. কুদরতুল ইসলাম, মোহাম্মদ নুরুল হক, ডাক্তার মাসুদ আহমদ, সালেহা চৌধুরী, কাদের মাহমুদ, শহীদ কাদরী, ইউসুফ চৌধুরী, আমিনুল হক বাদশা, গাজীউল হাসান খান, আনোয়ারা জাহান, ফেরদৌস রহমান, মাহমুদ এ. রউফ, সালমা নাসির ডলি (ডলি ইসলাম), ঊর্মি রহমান, ড. মোহাম্মদ আলী আসগর, সিরাজ চৌধুরী, রব্বানী চৌধুরী, শিকদার কামাল, আবদুল মুকিত মুখতার, মাজেদ বিশ্বাস, নজরুল ইসলাম বাসন প্রমুখ। এদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া বেশিরভাগই এখন পরপারের বাসিন্দা। এর মধ্যে–তাসাদ্দুক আহমদ, আবদুল মতিন, সিরাজুর রহমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আমীর আলী, সৈয়দ শামসুল হক, শফিক রেহমান, এম. আর. আখতার মুকুল, নুরুল ইসলাম, মাহমুদ হাসান ছিলেন ভাষাসৈনিক-কলমসৈনিক মুক্তিযোদ্ধা। শুধু তাই নয় উল্লিখিতদের মধ্যে–আবদুল গাফফার চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, এম. আর. আখতার মুকুল, শহীদ কাদরী প্রমুখের সাহিত্যখ্যাতি যে শুধু বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং যুক্তরাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বা আছে তা নয়, তারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিশ্ববাঙালি সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে সাহিত্যিক হিসেবে সমভাবে পঠিত, নন্দিত।

এ দশকে যারা তাদের জীবিতাবস্থায় রাষ্ট্রীয়ভাবেও সাহিত্য চর্চার স্বীকৃতি পেয়েছেন। তারা হলেন–

আবদুল মতিন। তিনি ১৯৬০-এর দশক থেকে ছিলেন লন্ডনবাসী। আবদুল মতিন তার সাহিত্য চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১০ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।

সিরাজুর রহমানও ১৯৬০-এর দশকের গোড়া থেকে লন্ডনবাসী ছিলেন। তিনি ২০০২ সালে একুশের পদকে ভূষিত হন।

আবদুল গাফফার চৌধুরী ১৯৭৫ সাল থেকে লন্ডনবাসী হলেও ১৯৬৭ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৩ সালে একুশের পদক এবং ২০০৯ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারসহ আরও অনেক পুরস্কার লাভ করেন। তার লেখা 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' ভাষা দিবসের গান হিসেবে স্বীকৃত।

সৈয়দ শামসুল হকের স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল–কবিতা, গীতিকবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটোগল্প, চলচ্চিত্রের কাহিনি, অনুবাদ তথা সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায়। সেজন্য পাঠক মহলে তার খ্যাতি ছিল সব্যসাচী লেখক হিসেবে। তিনিও ১৯৭১ সাল থেকে ছিলেন লন্ডনবাসী। তবে সমভাবে দেশেও অবস্থান করতেন। সৈয়দ শামসুল হক মাত্র ৩১ বছর বয়সে ১৯৬৬ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৬৯ সালে আদমজি পুরস্কার, ১৯৮৩ সালে আলাওল পুরস্কার, ১৯৮৪ সালে একুশে পদক, ২০০০ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে 'চরমপত্র'খ্যাত এম. আর. আখতার মুকুল লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসতি না করলেও দীর্ঘদিন লন্ডনে থেকে সাহিত্য চর্চা করেছেন। তিনি বিশেষ করে সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদানের জন্য ২০০১ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।

গোলাম মুরশিদ ছিলেন একাধারে লেখক, গবেষক, শিক্ষক, সংবাদ উপস্থাপক এবং আভিধানিক। ১৯৮৪ সাল থেকে আমৃত্যু তিনিও ছিলেন লন্ডনবাসী। গোলাম মুরশিদ ১৯৮২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ২০০৭ সালে প্রথম আলো সাহিত্য পুরস্কার, ২০১৮ সালে আইএফআইসি সাহিত্য পুরস্কার এবং ২০২১ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য একুশে পদক লাভ করেন।

একইভাবে সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য কাদের মাহমুদ ২০১১ সালে বাংলা একাডেমি প্রবাসী লেখক পুরস্কার এবং সংহতি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

২০১২ সালে বাংলা একাডেমি প্রবাসী লেখক পুরস্কার পান লেখক ও নাট্যকার ডাক্তার মাসুদ আহমদ ।

সালেহা চৌধুরীও দেশ স্বাধীনের পর থেকে লন্ডনবাসী। তিনি তার সাহিত্যসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০০ সালে ইন্টারন্যাশনাল লাইব্রেরি অব পোয়েট্রি মেরিট অ্যাওয়ার্ড, ২০০৮ সালে লেখক সংঘ সম্মাননা, ২০০৮ সালে বাংলাদেশ রাইটার্স ফাউন্ডেশন পদক, ২০০৮ চয়ন সাহিত্য পদক, ২০০৮ ড. আশরাফ সিদ্দিকী ফাউন্ডেশন কর্তৃক সাহিত্যে অবদানের জন্য গোল্ড মেডেল, ২০০৮ অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার, ২০১২ সালে 'বাংলা একাডেমি প্রবাসী লেখক পুরস্কার এবং ২০২৩ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

আশির দশক

১৯৮০-এর দশকে এদের সঙ্গে যোগ দেয়া উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে পড়েন–কাজি জাওয়াদ, শামীম আজাদ, ফজলুল আলম, ফরীদ আহমদ রেজা,

হামিদ মোহাম্মদ, কে. এম. আবু তাহের চৌধুরী, রেণু লুৎফা, সৈয়দা আয়েশা আহমদ, আ. মা. নেসওয়ার, আনসার আহমেদ উল্লাহ (ফিলিপ), সৈয়দ শাহীন, নজরুল ইসলাম নাজ, মাহফুজা তালুকদার, সওদা মুনিম, মাসুদ রাণা, আব্দুল আজিজ তকি, মতিয়ার রহমান চৌধুরী, আতাউর রহমান মিলাদ, আবুল কালাম আজাদ ছোটন, ফারুক আহমদ, সফিয়া জাহির, দিলু নাসের, ফারুক আহমদ রনি, মুনায়েম আহমদ মায়েনীন, আবদুল মুনিম জাহেদি, মাশুক ইবনে আনিস, ড. মুকিদ চৌধুরী, আবু মকসুদ, কাজল রশীদ, আবু তাহের, সাইফুদ্দিন আহমদ বাবর, শিহাবুজ্জামান কামাল প্রমুখ।

এদের মধ্যে শামীম আজাদ তার সাহিত্যসেবার স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৬ সালে বাংলা একাডেমি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কার এবং ২০২৩ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

ফারুক আহমদ মূলত গবেষণামূলক লেখালেখি করে থাকেন। তিনি তার গবেষণামূলক লেখালেখির জন্য ২০১৩ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

আতাউর রহমান মিলাদ একজন কবি ও গল্পকার। ২০০৮ সালে তিনি সংহতি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

ফারুক আহমদ রনি একজন কবি। তিনি ২০২৪ সালে সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ পুরস্কার লাভ করেন।

নব্বইয়ের দশক

১৯৯০-এর দশকের সাহিত্যসেবীদের মধ্যে আছেন–সরোয়ার আলম চৌধুরী, নূর মনি (নূরুল হক মনি), মুজিবুল হক মনি, রহমত আলী, ময়নুর রহমান বাবুল, সুজাত মনসুর, নবাব উদ্দিন, মঞ্জুরুল আজিম পলাশ, মতিয়ার রহমান চৌধুরী, গিয়াসউদ্দিন আহমদ, তাবেদার রসুল বকুল, হাসনাত মোহাম্মদ আনোয়ার, আহমদ ময়েজ, ফারুক যোশী, মুজিব ইরম, দেলওয়ার হোসেন মঞ্জু, শাহ শামিম আহমদ, শামীম আহমদ, সৈয়দ মবনু, নজরুল ইসলাম হাবিবী, ইকবাল হোসেন বুলবুল, মাসুদা ভাট্টি, ইলিয়াস আলী, আহমদ হোসেন হেলাল, মারুফ আহমদ, বুলবুল হাসান, এম. মোসাহিদ খান, শাহনাজ সুলতানা, আনিমদিম জাকারিয়া, জুসেফ খান, আনোয়ার শাহজাহান প্রমুখ।

এরা প্রায় প্রত্যেকেরই নিজ নিজ সাহিত্যকর্মের জন্য খ্যাতিমান। এর মধ্যে শামীম আহমদ ২০২৫ সালে সমধারা সাহিত্য পুরস্কার এবং মুজিব ইরম তার সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৯৬ সালে বাংলা একাডেমি তরুণ লেখক প্রকল্প পুরস্কার, ২০০৯ সালে সংহতি সাহিত্য পুরস্কার, ২০১৬ সালে সিটি আনন্দ আলো সাহিত্য পুরস্কার, ২০১৭ সালে বাংলা একাডেমি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কার লাভ করেন।

একুশ শতকের আড়াই দশক

২০০০ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিলাতবাসী যারা সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান সগৌরবে জানান দিচ্ছেন তাদের মধ্যে আছেন–দেওয়ান গৌস সুলতান, ফেরদৌস রহমান, ড. আব্দুল মালিক, গোলাম কবির, ইসহাক কাজল, শাহদত করিম, নুরুজ্জামান মনি, শাহাদুজ্জামান, মোহাম্মদ ইকবাল, কামাল রহমান, সৈয়দ ইকবাল, সুমন সুপান্ত, সৈয়দ আফসার, আবদুল কাইয়ুম, ফয়সল আইয়ুব, মিলটন রহমান, সাঈদ চৌধুরী, ফরিদা ইয়াসমিন জেসি, তৌহিদ শাকিল, তাবাসসুম ফেরদৌস, সৈয়দা তুহিন চৌধুরী, আবদুল আউয়াল হেলাল, সৈয়দ রুম্মান, রুহুল আমীন রুহেল, সাগর রহমান, উদয় শংকর দুর্জয়, রেজুয়ান মারুফ, আনোয়ারুল ইসলাম অভি, এ. কে. এম. আব্দুল্লাহ, জুয়েল রাজ, শাহ সোহেল আমিন, শাগুফতা শারমীন তানিয়া, ফারাহ নাজ, লুনা রাহনুমা, সিপা বিবি, তালুকদার রায়হান, সাঈম চৌধুরী, সাগর রহমান, সৈয়দ দুলাল, সৈয়দ আফসার, সৈয়দ মাসুম, সৈয়দ নাসির আহমদ, নোমান আহমদ, কামরুল বশির, সাঈম খন্দকার, সৈয়দ হিলাল সাইফ, সামসুল জাকী স্বপন, দীনুজ্জামান চৌধুরী, মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন (কালারুকি), আমিরুল হক বাবলু, সৈয়দ নাসির, নাজরাতুন নাঈম, আলমগীর শাহরিয়ার, ফাহমিদা বেগম, মরিয়ম চৌধুরী, শামসুল হক শাহ আলম, মোহাম্মদ মুহিদ, অসীম চক্রবর্তী, সৈয়দ নাদির আহমদ, ফেরদৌস টিপু, নূরুল হক, আরাফাত তানিম, আসমা মতিন, হাসফা ইসলাম, ফয়জুল ইসলাম ফয়েজনূর, ইমদাদুন খান প্রমুখ।

এদের মধ্যে শাহাদুজ্জামান ১৯৯৬ সালে মওলা ব্রাদার্স পুরস্কার, ২০১৬ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, ২০১৯ সালে সিটি ব্যাংক আনন্দ আলো সাহিত্য পুরস্কার, ২০২০ সালে প্রথম আলো বর্ষসেরা বই পুরস্কার লাভ করেন।

ইসহাক কাজল ২০১৩ সালে বাংলা একাডেমি প্রবাসী লেখক পুরস্কার, সাগুফতা শারমীন তানিয়া ২০১৯ সালে বাংলা একাডেমি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কার এবং ২০২৫ সালে মোহাম্মদ ইকবাল এবং আজিজুল আম্বিয়া সমধারা সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

উপসংহার

বাংলাদেশ, পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরার পরে জনসংখ্যা এবং বাংলাভাষা চর্চার দিক থেকে বিলাত এখন বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার অন্যতম চারণভূমি; বাঙালির জন্য এ এক সফল বাস্তবতা। বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে এখন (২০২৫) পর্যন্ত যে সকল বাংলাদেশি সাহিত্যচর্চা করে যাচ্ছেন, তাদের সবার রচনা যে শিল্পসার্থক হয়েছে তা নয়। এর পরেও যাদের লেখা শিল্পোৎকর্ষ লাভ করেছে তারা সামসময়িক বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। সাহিত্যের নানা মাধ্যমে নতুন শতাব্দীর বিষয়ভাবনা ও শিল্পমাত্রায় বিলাতে তাদের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম আরও বেগবান হবে বলেই প্রত্যাশা করি।

ইউরোপে লিটলম্যাগ আন্দোলনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্য মূল্য

মিলটন রহমান

ইউরোপ-আমেরিকা তথা পুরো বিশ্বসাহিত্যের 'লিটলম্যাগ'কে তার প্রাক-প্রস্তুতি যুগ পেরিয়ে তবেই নির্দিষ্ট গন্তব্যে আসতে হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে অবাণিজ্যিক এবং প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান বিরোধী সাহিত্যের ছোটোকাগজ প্রকাশিত হতে শুরু করে (যদিও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ্বের শুরুতে কিছু লিটলম্যাগ প্রকাশিত হওয়ার স্বাক্ষরও পাওয়া যায়। সেগুলো তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে না পারায় সেভাবে হিসেবে ধরা হয় না। আবার সাহিত্যপত্রের কথা যদি বলি, তাহলে দেখা যায় ১৬৬৪ সালে ফ্রান্স থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় সাহিত্যপত্র নোভেলস ডি লা রিপাবলিকো দেশ লেটারর্স।) আমেরিকা-ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের চিহ্নবাদীরা উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুরুর দিকে লিটলম্যাগকে শিশুকাল থেকে টেনে কৈশোরে নিয়ে আসেন। জার্মান সাহিত্য বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে এরই ধারাবাহিকতায় শিড়দাঁড়া সোজা করে। অবাণিজ্যিক সম্পাদনা প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা এবং এর অর্থায়ন সবকিছু কোনো মতেই বাণিজ্য প্রভাবিত হবে না, এ রীতিই লিটলম্যাগের আদি চরিত্র। প্রকাশিত রচনায় নিরীক্ষার ছাপ, বাণিজ্যিক পত্রিকায় ছাপা হয়নি এমন রচনা আবার রচনাকারদের বেশিরভাগই অপরিচিত-এমন বৈরাগ্যই এই আন্দোলনের নিয়ামক। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দু'টি লিটলম্যাগ 'আদি আধুনিক' যুগের সুচনা করেছিল। এক. দি এগুইস্ট। এ পত্রিকাটি ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। অনেকগুলো প্রথাবিরোধী এবং বিতর্কিত রচনা প্রকাশ করে সে সময়ে পত্রিকাটি ছিল আলোচনায়। আইরিশ লেখক জেমস জয়েসের উপন্যাস 'ইউলিসিস'র একটা অংশও প্রকাশ করেছিল 'দি এগুইস্ট'। ফলে সেই সময়কে ইংল্যান্ড-সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দুই. ব্লাস্ট। অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী এই লিটলম্যাগ ১৯১৪ এবং ১৯১৫ সালে মাত্র দু'টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংখ্যার মাধ্যমেই ঘোষণা করেছিল ব্রিটেনের 'আধুনিক আন্দোলন' এবং 'ভর্টিসিজম' আন্দোলনের। চিত্রকলা এবং কবিতায়

নতুন মেরুকরণে এই আন্দোলন বিশেষ ভূমিকা রাখে। যার সাথে কিছুটা যোগ হয়েছিল 'কিউবিজম'। 'ব্লাস্ট' শুরু থেকেই পাঠককে দু'ভাগ করে রেখেছিল। যারা এ পত্রিকার সাথে প্রথম মুখোমুখি হয় তারা মনে করত প্রাগ্রসরমান চিত্রকলা এবং সাহিত্য চর্চায় অসামান্য অবদান রেখে চলেছে ছোটোকাগজটি। আবার অনেকে এর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে অন্তঃসারশূন্য বলেও উপহাস করত। 'ভর্টিসিজম'র সূচনাও ওই ১৯১৪ সালে। এর স্থায়িত্ব ছিল একেবারে কম। তারপরও এ আন্দোলনকে ধারণ করে 'ব্লাস্ট' চিত্রকলাকে রাজনৈতিক চিন্তায় রূপান্তর ঘটাতে সচেষ্ট ছিল। এর মধ্য দিয়ে ওই সময়ের অনেক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ জানাতেও দ্বিধাবোধ করেনি। এছাড়া বহির্বিশ্বের অনুকরণে যে শিল্পকর্ম চলছিল তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আবার এই পত্রিকার ওপর বিশেষ প্রভাব ছিল আমেরিকান কবি এজরা পাউন্ডের। এভাবে উনিশ থেকে বিশ শতকের শুরুর দিকে লিটলম্যাগ ইংরেজি এবং বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন মেরুকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে শুরু করে।

লিটলম্যাগ আন্দোলনে প্যারিসকে একটু আলাদা করে উপস্থাপন না করলে আলোচনা পূর্ণতা পাবে না বলে মনে করি। শিল্প-সাহিত্যের এই আদি তীর্থে বিশ শতকে লিটলম্যাগ প্রকাশের হিড়িক লক্ষণীয়। ১৯১০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটি লিটলম্যাগ প্রকাশিত হয় প্যারিস থেকে। সে সময় প্যারিসের শিল্প-সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েছিল ছোটোকাগজ। প্রকাশিত প্রায় সব লিটলম্যাগেই উল্লম্ফন ছিল অভিনবত্ব এবং নিরীক্ষা। মূলত সাহিত্যের আধুনিকতার প্রসার এবং তার একটি অবকাঠামো তৈরি ও প্রচার সেখান থেকেই শুরু হয়। ১৯০৯ সালে ইতালীয় কবি ফিলিপ্পো ম্যারিনেটির 'ভবিষ্যবাদ' আন্দোলনের ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে লিটলম্যাগ 'লা গেজেট্টা ডেল' এমিলিয়া'। ফিলিপ্পো তার এই আন্দোলনে অতীতকে পুরোপুরি অস্বীকার করে ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর ইন্ধন দিয়েছেন। এই ভূমিকার জন্য ফিলিপ্পো ম্যারিনেটি প্রথা ভাঙার কারিগর। এরপর উল্লেখ করা যেতে পারে প্যারিসের প্রাচীন পত্রিকা 'লি ফিগারো'র ভূমিকা। ওই পত্রিকায় শিল্প-সাহিত্যের নতুন আন্দোলন সম্পর্কে পুরো ম্যানিফেস্টো প্রকাশের সুযোগ ছিল। প্রতীকীবাদ আন্দোলনের বিস্তারিত এই পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ওই সময় লন্ডন ছিল এই আন্দোলনের কেন্দ্র। আর একে ঘিরে ছিলেন আমেরিকান এবং ইউরোপীয়ান কবি-সাহিত্যিকরা। যেমন–এজরা পাউন্ড, ফোর্ড ম্যাক্স ফোর্ড, উইলিয়াম ক্যারলস উইলিয়াম এবং এফ এস ফ্লিন্টসহ আরও অনেকে। আর এঁদের মাধ্যমেই বিভিন্ন লিটলম্যাগের বদৌলতে 'প্রতীকীবাদ' বিস্তৃতি লাভ করে পুরো ইউরোপে। আবার ওই সময়ে লিটলম্যাগগুলো বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে বিতর্ক বা সংলাপের আয়োজনও করত। মূলত শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন মতবাদ একে অপরের সাথে বিনিময় করার ক্ষেত্রে এ ধরনের বিতর্ক বিশেষভাবে আদৃত ছিল সে সময়। প্রকাশিত গ্রন্থ কিংবা কোনো বিচ্ছিন্ন রচনা নিয়ে এই ধরনের বিতর্ক আয়োজন প্যারিসের লিটলম্যাগ আন্দোলনকে বিশ্বদৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছে। সে সময় ফ্রান্সের

শহর দিজন এবং ইংল্যান্ড থেকে একসাথে প্রকাশিত হতো আধুনিকতা ও চলচ্চিত্র বিষয়ক ছোটোকাগজ 'দ্য ক্লোজাপ'। এ পত্রিকাটির পাঠক ছিল ইউরোপের শহর, বার্লিন, প্যারিস, মস্কো এবং লন্ডনসহ উল্লেখযোগ্য শহরগুলোতে। নিউইয়র্কেও দ্য ক্লোজাপ'র ব্যাপক পাঠক ছিল। ব্রিটেনে সে সময় ভিনদেশি শিল্পকলার আমদানি হয় লিটলম্যাগের সুবাদে। পিকাসো ১৯১১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় লন্ডনের 'হৃদম' নামে একটি লিটলম্যাগে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত দু'টি নারীবাদী ছোটোকাগজের কথা না বললেই নয়। ১৯১১ সালে প্রকাশিত 'দ্য ফ্রিউইম্যান'। এটি ১৯১২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি 'দ্য নিউ ফ্রিউইম্যান' (১৯১৩-১৯১৪)। এ দু'টি পত্রিকা অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা রেখেছিল বিশেষ করে নারীবাদীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায়। তাদের বক্তব্য ছিল 'ভোটাধিকারের চেয়েও বেশি কিছু পেতে হবে নারীদের'। তাই প্রকাশনা দু'টির রচনায় প্রধান্য দেয়া হতো খোলামেলা যৌনতা, মেয়েদের অবিবাহিত থাকার ক্ষেত্রে উৎসাহ, অবাধে প্রেম করার সুযোগ এবং সম-লিঙ্গের যৌন মিলনসহ এ সংক্রান্ত বিষয়। তো এ ধরনের নানান চ্যালেঞ্জ এবং প্রথা ভাঙার এজেন্ডা সম্মুখে নিয়ে অগ্রসর হয়েছে সে সময়ের ছোটোকাগজগুলো। যেহেতু বাণিজ্যিক কোনো সংস্পর্শ ছিল না, সেহেতু অনেক লিটলম্যাগ কম আয়ুপ্রাপ্ত ছিল। লন্ডনে ১৮৯৬ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত লিটলম্যাগ 'দ্য সেভয়' আটটি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অথচ এর লেখক তালিকায় ছিলেন, ডব্লিউ বি ইয়েটস, ম্যাক্স বীরভোম, জোসেফ কর্ণাড এবং উইলিয়াম থমাস হর্টনসহ সে সময়ের প্রথমসারির কবি-সাহিত্যিকগণ। এর প্রকাশক ছিলেন অস্কার ওয়াইল্ডের এক বিতর্কিত বন্ধু, যাকে পর্ণোগ্রাফারও বলা হতো। তার নাম লিওনার্দো স্মীথারস। ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বরেই হঠাৎ করে পুস্তক বিপণন প্রতিষ্ঠান ডব্লিউ এইচ স্মীথ তাদের সেলফ থেকে 'দ্য সেভয়' এর সব কপি তুলে নেয়। কারণ এর বিক্রয় এবং বিপণন ছিল একেবারেই নগন্য এবং অলাভজনক। 'হৃদম' লন্ডন থেকে প্রকাশিত আরও একটি চিন্তাশীল লিটলম্যাগ। এ ছোটোকাগজটির কথা আগেও বলেছি। এটিও ১৯১১ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এর সম্পাদক হিসেবে শুরুতে জন মিডেলটন মারী ছিলেন, তবে পরে এবং শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন নিউজিল্যান্ডের ছোটোগল্পকার ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড (তিনি লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন)। ক্যাথারিন তাঁর পুরো বছরের আয় থেকে বিনিয়োগ করেও টিকিয়ে রাখতে পারেননি পত্রিকাটি। অথচ এতে রচনায় ঋদ্ধ করেছিলেন, ডি এইচ লরেন্স, ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস, ম্যাকবস বীরভোম, হিউজ ওয়ালপোল, ওয়াল্টার ডি লা মারে এবং উইলয়াম ডেনিস ব্রাউনসহ প্রখ্যাতরা। বন্ধ হয়ে যাওয়া পত্রিকাগুলো চাইলে বাণিজ্যের দিকে হাত বাড়াতে পারত। তারা সে কাজটি নীতিগতভাবে করেনি, 'লিটলম্যাগ'র চরিত্র হরণ করতে চায়নি তারা। অনেক বাণিজ্যিক প্রকাশক বন্ধ হয়ে যাওয়া বিভিন্ন লিটলম্যাগকে বাঁচানোর আগ্রহ দেখিয়েছে, কিন্তু এগুলোর প্রতিষ্ঠাতা বা সম্পাদকগণ তাতে সাড়া দেননি। অভাবনীয় বিষয় হলো অর্থনৈতিক সংকটের

কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া লিটলম্যাগ সম্পাদকরা মনে করেন, তারা সাহিত্যের জন্য প্রকৃত ভূমিকা রাখতে পেরেছেন, তা না হলে কোনো না কোনোভাবে বাণিজ্যিক বাজারে ছোটোকাগজগুলো বিক্রি হয়ে যেত। এজারা পাউন্ড বিষয়টি আরও পরিষ্কার করেছেন। বলেছেন, 'কাব্য বা সাহিত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্য হবেই, এ থেকে সহসায় অর্থনৈতিক লাভের কোনো সুযোগ নেই। লিটলম্যাগের অর্থনৈতিক সংকট তার জন্য বিশেষ সম্মানই বহন করে। ফলে লিটলম্যাগ সম্পাদকরা পুঁজি এবং বাণিজ্যের বিপক্ষে দাঁড়াতে পারেন'।

বিশ্বসাহিত্যে নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে লিটলম্যাগের ভূমিকা ইতিহাসখচিত। সে চিত্র মিলনার এবং প্রাইস এর সার্ভে থেকে উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠান দু'টির অনুসন্ধান মতে, ১৯১৪ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ব্রিটেন এবং ইউরোপে প্রকাশিত লিটলম্যাগগুলো আধুনিক সাহিত্যের নতুন লেখক এবং রচনা সংযোগ করেছে প্রকাশনা শিল্পে। বিশ শতকে লিটলম্যাগ কেবল ইউরোপ নয় পুরো বিশ্বসাহিত্যে প্রতি নিয়ত বাঁকবদল করেছে। এজরা পাউন্ড যখন বলেছিলেন, 'নতুন তৈরি করো' তখনই লিটলম্যাগ হয়েছিল এর প্রধান বাহন। যদিও একুশ শতকে এসে লিটলম্যাগের ভূমিকা নিয়ে অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিশ শতকে লিটলম্যাগ তার চরিত্র হারায়নি শত সংকটেও।

বিভিন্ন সময় বিবেচনায় লিটলম্যাগ আন্দোলনের চারটি ভাগের উল্লেখ করেছেন বিজ্ঞরা। প্রথম ভাগের সময়কাল ১৮৯০ থেকে ১৯১৫ সাল। সে সময় ফ্রান্সের ছোটোকাগজ 'লিটলম্যাগ আন্দোলন' প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। আর ব্রিটিশ এবং আমেরিকান লিটলম্যাগ ভূমিকা রাখে ইউরোপের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট একটি ধারণা উপস্থাপনে। সে সময়ে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ লিটলম্যাগ ইউরোপের শিল্প-সাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয়ভাগ ১৯১৫ থেকে ১৯৩০ সাল। এ সময়ে আধুনিক সাহিত্য বিকাশে প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকা রাখে আমেরিকার লিটলম্যাগ। ইউরোপে এ কাজটি করে ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত কিছু ছোটোকাগজ। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত লিটলম্যাগ 'দ্য লিটল রিভিউ' এ সময় ইউরোপীয় সাহিত্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশ করে। এ ছোটোকাগজের প্রতিষ্ঠাতা মার্গারেট এন্ডারসন। এ পত্রিকায় পরে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন, কবি এজরা পাউন্ড। লন্ডনে ১৯১৪ সাল থেকে প্রকাশিত দু'টি লিটলম্যাগ 'এগুয়িস্ট' এবং 'ব্লাস্ট' প্রকাশ করে টি এস এলিয়টের গুরুত্বপূর্ণ কিছু রচনা। আইরিশ ঔপন্যাসিক জেমস জয়েসের ইউলিসিসের গুরুত্বপূর্ণ অংশও প্রকাশ করে এগুয়িস্ট, সে কথা শুরুতেও বলেছি। ছোটোকাগজগুলো কালজয়ী লেখকদের রচনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে জানান দিয়েছিল নিখাদ সাহিত্যচর্চার ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত।

তৃতীয়ভাগ ধরা হয় পুরো তিরিশের দশককে। এসময় বাম ঘরানার কিছু ছোটোকাগজ প্রকাশিত হতো। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হতো 'পার্টিজান রিভিউ'

(১৯৩৪) এবং ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হতো 'লেফট রিভিউ' (১৯৩৪-১৯৩৮)।

চতুর্থ পর্ব শুরু হয় চল্লিশের দশকে। এ সময় লিটলম্যাগ ঘিরে বেশ কয়েকজন জাঁদরেল সাহিত্য সমালোচকের উত্থান লক্ষণীয়। যাদের বেশিরভাগ আবার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এঁদের রচনা প্রকাশিত হতো সে সময়ে এফ আর লিভিস প্রকাশিত লিটলম্যাগ 'স্ক্রুটুনি'তে। এসময় লিটলম্যাগের চরিত্রেও দেখা দেয় পূর্ণতা। আগের চেয়ে অনেক বেশি পোক্ত মনে হতে থাকে লিটলম্যাগের অবস্থান।

১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে লন্ডন ফ্যাস্টিভাল হলে বসেছিল 'লিটলম্যাগ ফ্যাস্টিভাল'। এর উদ্যোক্তা জিউফেরি সোয়ারকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন যে লিটলম্যাগ করতে হলে কি পাগলের মতো লেগে থাকতে হয় নাকি? উত্তরে জিউফেরি বলেছিলেন, 'শুনুন লিটলম্যাগ পাগল পুরুষ কিংবা মহিলা না হলে আপনারা এলিয়ট, হ্যামিংওয়ে, জয়েসসহ অনেকের নাম শুনতে পেতেন না।'

আমেরিকান কবি উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামসও লিটলম্যাগ সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, 'আমি সব সময় লিটলম্যাগকে লালন পালন করি। তা না হলে আমি বহু আগেই চুপ হয়ে যেতাম।' তাঁর এ বক্তব্য থেকে বিবিধ কথার অনুরণন ওঠে। লিটলম্যাগ না হলে কোনো লেখকই তাঁর ভাষ্য পাঠক সম্মুখে উপস্থাপন করতে পারে না। তাই বলা হয়, বিশ্বসাহিত্যে প্রায় সব লেখকই জীবনের প্রথম লেখা প্রকাশ করে 'লিটলম্যাগে'।

লিটলম্যাগ একইসাথে পাঠকের হাতে তুলে দেয় মূলধারার কবি-সাহিত্যিক এবং অপ্রতিষ্ঠিত-নতুন লেখকের রচনা। বিশেষ করে নিরীক্ষামূলক রচনা প্রকাশ এবং পাঠের যথোপযুক্ত দলিল হচ্ছে লিটলম্যাগ। সেখানে নানান ফর্ম এবং ইজমের রচনা সম্ভার শোভিত থাকে পৃষ্ঠান্তরে। বিশেষ করে ইউরোপের লিটলম্যাগগুলোতে নানান নিরীক্ষার ছাপ লক্ষণীয়। দেখা যায় ওপেন-ফিল্ড পোয়েট্রি, সাউন্ডটেক্স পোয়েট্রি, স্যুররিয়ালিজম-ডাডারিজম, কনসেফসোয়াল ফর্ম কিংবা দীর্ঘকবিতা-এর সবই উপস্থিত ইউরোপের লিটলম্যাগে।

বিশ শতকের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কবি-সাহিত্যিকের উত্থান সূচিত হয়েছে লিটলম্যাগের মাধ্যমে। যারা পরবর্তীতে বিশ্বপরিচিতি লাভ করেছেন। এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বলা যেতে পারে–জেমস জয়েস, এজরা পাউন্ড, মেরিয়ানি মোর, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, হার্ট ক্রেন, উইলিয়াম কার্লোস ইউলিয়ামসসহ আরও অনেকে। এঁরাই সৃষ্টিতাত্ত্বিক। তাঁরা বিশ্বসাহিত্যে বিভিন্ন মতবাদ (ইজম) বিস্তৃতি এবং অবহিতকরণে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। চিহ্নবাদ কিংবা প্রতীকবাদ, ভবিষ্যবাদ (বিশ শতকের শুরুতে ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিকতাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে শিল্পকলা ও সাহিত্যান্দোলনে সামসময়িক জীবন এবং ক্রমোন্নয়ন সম্পর্কে অবহিতকরণ), প্রতিকৃতিবাদ, অভিব্যক্তিবাদ এবং পরাবাস্তববাদের অন্যতম ভাষ্যকার কিংবা সূত্রকার তাঁরা। শুধু তাই নয় ছোটোকাগজের মাধ্যমে নতুন অনেক কবি-সাহিত্যিক-চিত্রকরকে এঁরাই জায়গা করে দিয়েছিলেন।

লিটলম্যাগ আন্দোলন বরাবরই প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদের কাছে ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। বাণিজ্যিক লেখক কিংবা কাগজ নিয়ে বহু এনথোলজি প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্তু লিটলম্যাগ কিংবা তার লেখকদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বড়ো প্রকাশকদের অনিহা ছিল সর্বত্র। ব্রিটেনের দিকে তাকালে দেখা যায় এই সংকট ঘোচাতে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পালাদিন। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৭ সালে প্রকাশ করে 'আ ভ্যারিয়স আর্ট'। এর পরের বছর (১৯৮৮)ই প্রকাশ করে 'দ্য ব্রিটিশ নিউ পোয়েট্রি'। এই প্রকাশনাগুলো উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যে লিটলম্যাগের ভূমিকা কোথায় সে সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য। এটি একসাথে সম্পাদনা করেন গিলিয়ান অলনাট, ফ্রেড ডি'এগোইয়ার, ক্যান এডওয়ার্ডস এবং এরিক মোটরাম। এর আগে ১৯৮৬ সালে অভিজাত প্রকাশনা সংস্থা পেঙ্গুইন থেকে ব্ল্যাক মরিসন এবং এন্ড্রো মোশনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'কনটেম্পরারি ব্রিটিশ পোয়েট্রি'। যাতে বাদ দেয়া হয়েছিল বিশেষ করে লিটলম্যাগের কবি-সাহিত্যিকদের। তারই জবাবে গিলিয়ান অলনাট, প্রেড ডি'এগোইয়ার, কেন এডওয়ার্ডস এবং এরিকমোটরামের সম্পাদনায় পালাদিন প্রকাশ করে 'দি নিউ ব্রিটিশ পোয়েট্রি'। এতে তথাকথিত মূলধারাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই প্রকাশক এবং সম্পাদকগণ লিটলম্যাগের ভূমিকাকে উচ্চে তুলে ধরেন। মটরাম রচিত গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ 'আ ট্রেজারাস এসল্ট অন ব্রিটিশ পোয়েট্রি'তে সত্তরের দশকের প্রায় পঁচিশ জন আধুনিক কবিকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। যাঁরা সাহিত্যে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল কিন্তু তাদের অবস্থান চিহ্নায়নে ব্যর্থ হয়েছিল বড়ো প্রকাশকরা। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের কাব্য পরিচয় সমাদৃত ছিল পাঠক মহলে। এই কবিদের মধ্যে ছিলেন, বব কোবিং (৩০ জুলাই ১৯২০-২৯ সেপ্টেম্বর ২০০২), এন্ড্রো ক্রোজায়ার (২৬ জুলাই ১৯৪৩-৩ এপ্রিল ২০০৮), রয় ফিশার (১১ জুন ১৯৩০-২১ মার্চ ২০১৭), বিল গ্রীফিথস (২০ আগস্ট ১৯৪৮-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭), লী হ্যারউড (৬ জুন ১৯৩৯-২৬ জুলাই ২০১৫), ব্যারি ম্যাকসুয়েনি (১৭ জুলাই ১৯৪৮-৯ মে ২০০০), জেফ নাটাল (৮ জুলাই ১৯৩৩-4 জানুয়ারি ২০০৪), টম পিকার্ড (১৯৪৬), টম রাউয়ার্থ (১৯ জুলাই ১৯৩৮-৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭), ক্যান স্মীথ এবং গায়েল টার্নবোল। এই গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়ার পর বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এবং কবিরা স্বাগত জানান। শুধু ব্রিটেনে নয় এ দৃশ্য সর্বত্রই। ইউরোপের অন্যান্য দেশের লিটলম্যাগ নিয়েও তেমন কোনো প্রকাশনা খুঁজে পাইনি। ব্রিটেন এবং আমেরিকাতে যে কাজগুলো হয়েছে তাতে ইউরোপেরও অনেক লিটলম্যাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে তা অনেকটাই একাডেমিক কারণে। পুঁথিবিদ্যার বাইরে কোনো রচনা ইউরোপে হয়েছে তেমন আমার জানা নেই। হয়তো থাকতেও পারে। যদি থেকেও থাকে তার প্রচার-প্রচারণা কিংবা ইংরেজি ভাষায় কোনো অনুবাদ নেই। তবে আয়ারল্যান্ডে 'পোয়েট্রি আয়ারল্যান্ড রিভিউ' ওই অঞ্চলের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থগুলোর সমালোচনা প্রকাশের মাধ্যমে কবি এবং পাঠককে রুচি এবং অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পেতে সহায়ক

ভূমিকা পালন করেছে। তবে ওই লিটলম্যাগে লেখকদের কতটুকু প্রাধান্য দেয়া হয়েছে সে প্রশ্ন থেকেই যায়। 'পোয়েট্রি আয়ারল্যান্ড রিভিউ'তো তাদের নিয়ে কাজ করে যাদের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। লিটলম্যাগের অধিকাংশ লেখকের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় অনেক পরে, হয়তোবা কখনোই হয় না। ফলে অধিকাংশ লিটলম্যাগের লেখক 'পোয়েট্রি আয়ারল্যান্ড রিভিউ'তে জায়গা পান না।

একটি বিষয় বেশ দৃশ্যমান যে, লিটলম্যাগের প্রতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিহা প্রকাশিত। কারণ লিটলম্যাগ সবসময় প্রথা ভাঙতে চেয়েছে এবং ভেঙেছে। সাহিত্যের বাঁকবদলে বিশ্বের ছোটোকাগজগুলোই চিহ্ন রেখেছে। এই প্রথাবিরোধীতা, এই বাঁকবদল প্রতিষ্ঠিতরা স্বস্তিতে নেয়নি। লিটলম্যাগ সে রচনাই প্রাধান্য দিয়েছে যা কেউ ছাপতে চায়নি। লিটলম্যাগ সে লেখকের চিন্তাকে স্থান দিয়েছে যাঁকে কেউ চেনে না। ১৮৪০ থেকে ১৯২৯ সাল, এ ঊননব্বই বছর আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল অলৌকিকতাবাদী লিটলম্যাগ 'দ্য ডায়াল' (এখানে বলে রাখা ভালো যে এই দীর্ঘ সময় পত্রিকাটি কেবল সাহিত্য বিষয়ে প্রকাশিত হয়নি। ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত এর কাজ ছিল দর্শন নির্ভর। ১৮৮০ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত কাজ ছিল রাজনীতি এবং সাহিত্য সমালোচনা নির্ভর। আর ১৯২০ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ করেছিল 'দ্য ডায়াল')। সম্পাদক ছিলেন রাফ ওয়ালদো এমারসন (২৫ মে ১৮০৩-২৭ এপ্রিল ১৮৮২)। ১৯২০ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত এই ছোটোকাগজটি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আবার এই লিটলম্যাগের প্রভাবেই লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় অজনপ্রিয় ছোটোকাগজ 'দ্য ইওলো বুক'। এর সম্পাদক ছিলেন আমেরিকান ঔপন্যাসিক হেনরি হারল্যান্ড (১ মার্চ ১৮৬১-২০ ডিসেম্বর ১৯০৫)। প্রকাশ করেছিল প্রকাশক এলকিন ম্যাথিউস ও জন লেনের প্রতিষ্ঠান 'দ্য বডলি হেড'। এরপর ক্ষীণ আয়ু নিয়ে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় অন্যতম প্রভাববিস্তারী লিটলম্যাগ 'ব্লাস্ট'। ১৯১৪ থেকে ১৯১৫, এর মধ্যে প্রকাশিত হয় দু'টি সংখ্যা। কিউবিজম প্রভাবিত এই লিটলম্যাগ লন্ডন শিল্পকলা ও সাহিত্যে 'ভর্টিসিজম' আন্দোলনের সূচনা করে। এই আন্দোলনের ম্যানিফেস্টো ছিল ল্যান্ডস্কেপ এবং ন্যুড পরিহার করে বিমূর্ততার দিকে যাত্রা করা। এই আন্দোলন ব্যাপক আবেদনও তৈরি করেছিল। মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মানবিক বিপর্যয় থেকেই এই আন্দোলনের উৎপত্তি।

ইউরোপের লিটলম্যাগ আন্দোলন নিয়ে বিস্তর কথা বলা যায়। বস্তুবাদের আশে আশে ইউরোপে সময় সময় বেড়ে উঠেছে প্রথাবিরোধী চিন্তা। যাতে পুঁজিবাদ বর্জনের গর্জন ছিল।

বিশ্বসাহিত্য

মহাকবি ফেরদৌসী'র জীবন, তাঁর সুবিখ্যাত 'শাহনামা' এবং চিন্তাধারা

নোমান আহমদ

ফারসি সাহিত্যের বিশ্ববিশ্রুত ও বরেণ্য কবি আবুল কাসেম ফেরদৌসী ছিলেন ইরানের প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গৌরবগাথার সার্থক রূপকার। তিনি একাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ফেরদৌসীর লেখা শাহনামা বিশ্ব সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্পকর্ম। এটি কেবল মহাকাব্য নয় বরং দার্শনিক ভাবনা ও মানবিক মূল্যবোধের সম্মিলন। আজো মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় তাঁর লেখা কবিতা। এটি যেন মানুষের অন্তর ও বাইরের খোরাক। ফেরদৌসীর চিন্তাধারা আমাদের মনে গভীর ছাপ রাখে। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, তিনি কীভাবে জীবন, ধর্ম ও মানবতার মিথস্ক্রিয়া বুঝেছেন। এই লেখাটির লক্ষ্য, মহাকবি ফেরদৌসী'র জীবন, তাঁর সুবিখ্যাত 'শাহনামা' এবং ফেরদৌসীর চিন্তাধারার মূলভাবগুলো সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা।

মহাকবি ফেরদৌসী'র জীবন

মহাকবি ফেরদৌসী'র জীবন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর মৃত্যুর প্রায় এক শতাব্দী পরে ইরানের বিখ্যাত কবি নিজামি আরযী তাঁর 'দিবাচায়' ফেরদৌসী সম্পর্কে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকে জানা যায়, মহাকবি ফেরদৌসী ৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ইরানের সমরখন্দের অন্তর্গত তুস নগরের "বাঝ' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মোহাম্মদ আবুল কাশেম। 'ফেরদৌসী' তাঁর উপাধি। গজনির সুলতান মাহমুদ তাঁকে এ উপাধি দিয়েছিলেন। সে থেকেই তিনি ফেরদৌসী নামে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ ইসহাক ইবনে শরফ শাহ তুস নগরের রাজকীয় উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ফেরদৌসী ভালো লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁর আর্থিক অবস্থাও ছিল মোটামুটি স্বচ্ছল। জানা যায়, তিনি উত্তারিধকার সূত্রে অনেক জায়গা জমি পেয়েছিলেন এবং এ সব জমি থেকে প্রতি বছর প্রচুর অর্থ আয় হতো। বাল্যকাল থেকেই কবিতা লিখতে পছন্দ করতেন। যৌবনে রাজকীয় উদ্যানের পার্শ্ববর্তী ছোট্ট নদীর তীরে বসে কাব্য লিখতে বেশ

পছন্দ করতেন। অল্প বয়সে বিবাহ করেন। অল্প দিনের একটি কন্যা সন্তান রেখে স্ত্রী চিরবিদায় নিলেন। কবির আরেক অধ্যায় বিষাদগ্রস্ত জীবন শুরু হলো। অপরদিকে 'তুসের' শাসনকর্তার রাজনৈতিক কারণে তাঁর উপর কুদৃষ্টি পড়ল। অবশেষে পিতৃ গৃহ ত্যাগ করলেন একমাত্র কন্যাকে নিয়ে।

৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ গজনিয় সিংহাসন আরোহন করেন। তিনি দেশ বিদেশের জ্ঞানী ব্যক্তিদের খুব সম্মান করতেন এবং দরবারে দেশ বিদেশের কবিদের কবিতা আবৃত্তির আসর হতো। মহাকবি মুহাম্মদ আবুল কাশেম ফেরদৌসী সুলতান মাহমুদের নিকট যথাযথ কদর পাবেন চিন্তা করে গজনির উদ্দেশে রওনা দেন। গজনির রাজ দরবারে প্রবেশ করা ছিল তখন কঠিন ব্যাপার। ফেরদৌসী যখন গজনি এসে পৌঁছেন ঘটনাক্রমে উনসুরী তখন তার কবি বন্ধু ফররুখী এবং আসজাদীকে নিয়ে বাগানে আড্ডা দিচ্ছিলেন। ফেরদৌসী তখন রাজদরবারের পথ খুঁজতে খুঁজতে তাদের আড্ডায় গিয়ে হাজির হন। কবিরা বিরক্ত হয়ে বলেন, কবিদের আড্ডায় তুমি অকবি তো অভাজনই বটে। জবাবে ফেরদৌসী বলেন, আমিও একজন নগণ্য কবি। কবিরা তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে,

আচ্ছা তাই নাকি? তো হয়ে যাক কবিতার লড়াই। আমরা তিনজনে তিনটি চরণ বলব। চতুর্থ চরণটি বলতে হবে তোমাকেই। বলেই উনসুরী শুরু করলেন,

চুন আরেজে তো মাহ নাবাশাদ রওশান
(চাঁদের আলো নয় সে, শুধু চুনকাম করা দেয়াল,)
ফররুখী বললেন,
মানান্দে দেরাখতে গোল দার গোলশান
(যেন বাগানের গোলাপ গাছ, ফুলে ভরা ডাল।)
আসজাদী বললেন,
মোজ্বেগানে তো হামি গোজার কোনাদ জওশান
(তোমার চোখের পাতা যেন বর্ম ভেদ করে,)

এদের ধারণা ছিল ফারসি ভাষায় 'শান' অন্ত্য দিয়ে এই তিনটি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। সুতরাং আগন্তুক নিশ্চিত আটকে যাবেন এবং তাদের কাছে তার কাব্যপ্রতিভার প্রমাণ দিতে না পেরে লজ্জিত হবেন। কিন্তু ফেরদৌসী বললেন,

মানান্দে সেনানে গিয়ু দার জাঙ্গে পেশান
(পেশান যোদ্ধার মতো, যুদ্ধজয়ী শানিত তলোয়ার ধরে।)

তখন তারা তিনজনই বিস্মিত হয়ে পেশানের যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের বীর গিয়ু সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ফেরদৌসী তাদের পেশানের যুদ্ধ-ইতিহাস শোনালে তারা শুধু ফেরদৌসীর কাব্যপ্রতিভায়ই মুগ্ধ হন না, তার ইতিহাস-জ্ঞান দেখেও বিস্মিত হন। অবশেষে সুলতান মাহমুদের উজির মোহেক বাহাদুরের সহযোগিতায় তিনি রাজদরবারে প্রবেশ করেন। সুলতানের সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয় হয় কয়েকটি

কবিতা পাঠের মাধ্যমে। প্রথম সাক্ষাতেই সুলতান কবির আবৃত্তি করা কয়েকটি কবিতা শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং এ বলে কবিকে সংবর্ধনা করেন, আয় ফেরদৌসী, তু দরবারে মে ফেরদৌস কারদী। অর্থাৎ হে ফেরদৌসী, তুমি সত্যিই আমার দরবারকে বেহেশতে পরিণত করে দিয়েছ।

এ থেকেই কবির নাম ফেরদৌসী হলো এবং পরবর্তীতে তিনি ফেরদৌসী হিসেবেই খ্যাতি লাভ করেন। সুলতান কবির জন্য পৃথকভাবে উন্নতমানের বাসস্থান ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং কবিকে রাজকবি হিসেবে মনোনীত করেন। ধীরে ধীরে কবি ফেরদৌসীর সঙ্গে সুলতান মাহমুদের সম্পর্ক গভীর হয়ে যায়।

কবি ফেরদৌসী'র সাথে সুলতানের গভীর সম্পর্ক এবং রাজদরবারে কবির শ্রেষ্ঠ সম্মান দেখে রাজসভার অন্যান্য কবিরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল এবং কবিকে রাজদরবার থেকে বের করার জন্য কবির বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করল। অন্যদিকে সুলতানের প্রধানমন্ত্রী খাজা ময়মন্দীও কবির সাথে গোপনে শত্রুতা আরম্ভ করল। ইতিমধ্যে সুলতান মাহমুদ কবিকে 'মহাকাব্য শাহনামা' রচনা করার অনুরোধ জানান এবং এর প্রতিটি শ্লোকের জন্য একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। যতদূর জানা যায়, কবি সুদীর্ঘ ৩০ বছর পরিশ্রম করে 'শাহনামা' রচনা করেন।

'শাহনামা' মহাকাব্য

'শাহনামা' পৃথিবীর মহাকাব্যসমূহের অন্যতম। ফেরদৌসী 'শাহনামা'য় প্রাচীন ইরানের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নিয়ে কাব্যগাথা রচনা করেছেন। এ এক বিস্ময়কর শক্তির পরিচায়ক। প্রাচীন ইতিহাসনির্ভর মহাকাব্যে মৌখিক এবং লিখিত সাহিত্যের যে পরস্পর প্রবিষ্ট সাহিত্যশৈলী লক্ষ করা যায় শাহনামাতেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। এটি প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশধারা সংক্রান্ত এক অতুলনীয় আকর গ্রন্থ। এতে যেমন প্রাক-ইতিহাস, ইরান ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের সভ্যতা বিকাশের নানা উপাদান যেমন−আগুনের ব্যবহার, রান্নাবান্না, আইন-কানুন ও সামাজিক বিধি-বিধানসহ বহু বিষয় যুক্ত হয়েছে, তেমনই সহস্রাধিক বছরের কালক্রমিক ইতিহাস ও মানব সমাজের ইতিহাসের ধারায় পথচলার নানা মূল্যবান বিবরণও এতে পাওয়া যায়। উপকথা ও ইতিহাস পরস্পর মাখামাখি হয়ে আছে শাহনামাতে। সৃষ্টির শুরু থেকে আরবদের পারস্য অভিযান পর্যন্ত। কিছু চরিত্রকে কয়েক'শ বছর জীবিত দেখা গেলেও সাধারণ ক্ষেত্রে আয়ু স্বাভাবিক।

রাজা যায়, রাজা আসে। এক দৈত্যের মৃত্যু হয়, আরেক খলনায়ক জন্মলাভ করে। শুধু অপরিবর্তিত পারস্য নিজে। যেন সে-ই মূল নায়ক। পুরো শাহনামাকে তাই তিনটা ক্রমিক যুগে ভাগ করা যায়। পৌরাণিক যুগ, বীরদের যুগ এবং ঐতিহাসিক যুগ।

পৌরাণিক যুগ : এই অংশের পরিসর অপেক্ষাকৃত অল্প। শুরু হয় আল্লাহর

প্রতি প্রশংসা প্রেরণের মাধ্যমে। তারপর বিশ্ব সৃষ্টি ও প্রথম মানুষ কাইয়ুমারসের আবির্ভাব। সভ্যতার মৌলিক প্রয়োজনসমূহ ও তাদের উদ্ভাবনের বর্ণনা করা হয় এরপরেই। জামসেদের সাত'শ বছরের রাজত্বকালে জাহহাক নামে এক দানবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যার ধমনিতে আরব রক্ত ছিল। তাকে পরাজিত করার জন্য আবির্ভূত হন ফারেদুন। ফারেদুনের আখ্যান বেশ রোমাঞ্চকর। তিনি গোটা পৃথিবীকে তিন ভাগ করে তিন পুত্র–ইরাজ, তুর ও সালমকে দিয়ে যান। ষড়যন্ত্র করে ইরাজকে হত্যা করে অপর দুই ভাই। ইরান ও তুরানের সংঘাতের সূত্রপাত এখান থেকেই।

বীরদের যুগ : শাহনামার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে বীরদের আখ্যান। ইরাজের পুত্র মনুচেহের থেকে শুরু। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে দেরি করেন না মনুচেহের। তার সময়ে সাম নামক এক বীরের কথা জানা যায়। মনুচেহেরের পুত্র জাল প্রেমে পড়েন রুদাবার। তাদের সন্তান রুস্তম শাহনামায় স্থান পাওয়া সমস্ত বীরের থেকে বেশি শক্তিশালী। বিভিন্ন রাজত্বকালে তার আয়ু তিন'শ বছরেরও বেশি। মনুচেহেরের রাজত্বকালে জন্ম নিয়ে গুশতাস্পের সিংহাসন আরোহন পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। শাহ এসফানদিয়ারকে হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করা হয়। রুস্তমের অধিকাংশ বীরোচিত কাজ সংঘটিত হয় শাহ কাউসের আমলে। শিয়াউসের সময়কালেও অব্যাহত থাকে তা। পুত্র সোহরাবের সাথে রুস্তমের যুদ্ধ ও সোহরাবের দুঃখজনক মৃত্যু সব থেকে বেশি জনপ্রিয় আখ্যানগুলোর একটি। ইরান-তুরান সংঘাত আবার তেতে ওঠে শাহ কাউস এবং তার পুত্র শিয়াউসের বিবাদের কারণে। শিয়াউস পালিয়ে গিয়ে তুরানের রাজা আফরাসিয়াবের কাছে আশ্রয় নেয়। প্রথমে আফরাসিয়াব নিজ কন্যার সাথে শিয়াউসের বিয়ে দিলেও পরে অসন্তুষ্ট হয়ে হত্যা করেন। সেখানেই বেড়ে ওঠে পুত্র কায় খসরু। আফরাসিয়াবকেও প্রতিদানে হত্যা করা হয়। আখ্যানের এই অংশে সংযুক্ত বিজান ও মনিজাহর প্রেমকাহিনি।

কায় খসরুর পর কাইয়ানিদ বংশের সমান্তরাল শাখার লোহরাস্প সিংহাসনে আরোহন করেন। তার পুত্র গোশতাস্প বিয়ে করেন পূর্ব রোমের সিজারের মেয়েকে। তার আমলেই পুত্র এসফানদিয়ার কর্তৃক সমর্থিত জরাথুস্ত্র তার নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। এসফানদিয়ারের মৃত্যু হয় রুস্তমের হাতেই। তারপর দারিউস ক্ষমতায় আসেন। দারিউসের রাজত্বকাল শেষ হলে ইসকান্দার (আলেকজান্ডার)-এর অভিযান শুরু হয়। তার কিছু দুঃসাহসিক অভিযানের উপকথার বিবরণের সাক্ষাৎ মিলে।

ঐতিহাসিক যুগ : ইসকান্দারের পরেই আরদাশিরের প্রসঙ্গ আসে। আর সেই সাথে শাহনামা তার রচনার ঐতিহাসিক অংশে প্রবেশ করে। যদিও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু উপকথা স্থান পেয়েছে, তথাপি এ পর্যায়ে ঐতিহাসিক সত্যতার মাত্রা নেহাত মন্দ না। আরদাশিরের পর শাপুর, বাহরাম, খসরু এবং কোবাদের মতো শাসকদের উত্থান-পতন ও ক্ষমতার টানাপোড়েন অত্যন্ত যত্নের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

শেষ শাহ ইয়াজদিজার্দের সময়কালে জনৈক সেনাপতি দ্বিতীয় রুস্তমের

পরিচালিত বাহিনীর সাথে আরবদের সংঘর্ষ ঘটে। কাদেসিয়ার এই যুদ্ধে পতন ঘটে দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তার করে রাখা ইরানিয় সাম্রাজ্যের। আরবদের অভিযান ও সংঘর্ষকেও সাবলীল নাটকীয়তার ভেতর দিয়ে চিত্রিত করেছেন মহাকবি ফেরদৌসী। তারপর কিছু সংখ্যক তারিখসহ দীর্ঘ কাহিনির সমাপ্তি টানা হয়েছে একটা সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে।

ছোটো ছোটো কাহিনি নিয়ে রচিত উপাখ্যানটি সংযোজিত হয়েছে খুবই আলগাভাবে। ইতিহাসের কাহিনির উপযুক্ত কালক্রম অনুসরণ করা হয়নি। বছরের পর বছর ধরে কাহিনিগুলো প্রচলিত ছিল। গঠন পর্যালোচনা করে অবাক হতে হয় প্রায়শ। মূলত শেক্সপিয়ারের ভাষা ও শাহনামার ভাষায় রয়েছে অদ্ভুত মিল। মিলনাত্মক ও বিয়োগাত্মক–উভয় নাটকীয় ধাঁচই বিদ্যমান। ইতিহাসের উৎস থেকে উদ্ভিদবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা খুব সাবলীলভাবে উঠে এসেছে। রাজা ও বীরদের জন্য বিলাপ এবং সূর্যোদয়ের বর্ণনাকে উচ্চ শৈল্পিক মাত্রায় নিয়ে গেছেন তিনি। এ দুয়ের জৈবিক যোগসূত্র দ্বৈত-সংগীতের মতো প্রবাহিত হয়। পুনরাবৃত্তির ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার জন্য ফেরদৌসী বেছে নেন শক্তিশালী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-আঙ্গিক। প্রয়োগ করা হয় কাব্য শিল্পের পূর্ণ শক্তিকে। তাই প্রতি দুটি সূর্যোদয়ের দৃশ্য কিংবা প্রতি দুটি বীরের জন্য শোকগাথা একরকম নয়। অস্ত্রের ঝনঝন, বীরে বীরে সংঘাত, জন্ম-মৃত্যু, শিকার কিংবা কামকেলি–সবকিছুকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে কবির জন্মভূমি ইরানের গল্প। সেই গল্প কেবল মাটিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এসেছে সমুদ্র এবং আকাশও। অভিযানমুখর রাজারা যেখানে জমিনে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। বেঁচে থেকে যুদ্ধ করেন শতশত বছর। সমগ্র কাব্যে জাতীয় শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা উপস্থাপিত হয়েছে ভালো আর মন্দের মধ্যে দ্বন্দ্ব হিসেবে। যেখানে দিনশেষে ভালোরই জয় হয়।

শাহনামাতে সময়ের ব্যবধানে ৫০ জন শাসকের উত্থান-পতনকে তুলে আনা হয়েছে, যা শুরু হয়েছিল প্রথম মানুষ কাইয়ুমারস থেকে এবং শেষ হয়েছে ইয়াজদিজর্দের পতনের মধ্য দিয়ে। ছয় হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যেন পরবর্তী প্রজন্ম ভুলে না বসে, অনেকটা এজন্যই ফেরদৌসীর প্রয়াস। শাহনামা ফারসি ভাষাকে যে ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে গেছে, এক হাজার বছর পরেও তা অপরিবর্তিত। এই জন্যই মহাকবি গ্যাটে ফারসি সাহিত্যের সুনাম করে লিখে গেছেন তার West-East Divan. এজন্যই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল সাদী, জামী, রুমি, হাফিজ, আত্তার কিংবা সানাইয়ের মতো পরবর্তী দুনিয়া কাঁপানো ফারসি কবিরা।

শাহনামা বাংলাভাষাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। শাহনামায় বিধৃত ইরানি সংস্কৃতির নানা সূক্ষ্ম দিক হুবহু বা যথাযথভাবে ভিন্ন ভাষায় তুলে ধরা সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সাহিত্যে শাহনামার প্রভাব

অপ্রতিরোধ্য। এমনকি ইউরোপীয় জ্ঞানী-গুণীরাও ফেরদৌসীর কাব্যে উল্লিখিত মানবতার বাণী ও তার চিন্তাধারার সূক্ষ্ম নানা দিক উপলব্ধি করে সেগুলোকে মানব-সভ্যতার চিরন্তন উত্তরাধিকার বা সম্পদ বলে গর্ব প্রকাশ করেছেন। ইউরোপের অনেকেই শাহনামাকে বিশ্বের সবচেয়ে অসাধারণ ও মহত্তম সাহিত্য-কর্মের সমতুল্য, এমনকি তাদের কেউ কেউ একে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন বলার মতো উদারতাও দেখিয়েছেন। ইয়ান রিপকার ইরানি সাহিত্যের ইতিহাস শীর্ষক বইয়ে লিখেছেন, এ সত্য অকাট্য যে বিশ্বের অন্য কোনো জাতির মধ্যেই ইরানি জাতির মতো এত বড়ো মাপের বীরত্বগাথা বা কাব্য নেই যাতে কিংবদন্তির যুগ থেকে সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ঐ জাতির সমস্ত ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে।

ইরানের সাথে গভীর সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় এবং সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ বাংলাদেশ বা ভারত-উপমহাদেশ অঞ্চলে শাহনামার প্রভাব সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলা বাহুল্য বলেই মনে হতে পারে। এ অঞ্চলে সম্ভবত এমন কোনো শিক্ষিত পরিবার বা ব্যক্তি নেই যে সোহরাবের মতো বীরের ট্র্যাজেডিতে অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়নি, কিংবা শাহনামায় বিধৃত বীরদের বীরত্বে উজ্জীবিত হয়নি। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ও কবি মোহিতলাল মজুমদার শাহনামার মাহাত্ম্যে এতটাই মোহিত হয়েছেন যে তিনি ফেরদৌসীকে স্মরণ করে লিখেছেন, বাঙ্গালী জাতি "অশেষ দূর্গতি মাঝে লয় আজ তোমারি উদ্দেশ্য"। তিনি শাহনামাকে ইরানি জাতির কণ্ঠহারের সাথে তুলনা করে বাঙ্গালি জাতির জাগরণের জন্যও সেরকম আদর্শ "সম-কণ্ঠহার" কামনা করেছেন। শাহনামায় এসব বর্ণনায় ফেরদৌসী যে বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছিলেন তা হলো এই পৃথিবী চলমান এবং এই পৃথিবীতে মানুষ ইতিহাসের পথে যুগ-যুগান্তরের পথপরিক্রমায় আসে আর যায়। সে জন্যই তাদের বিজ্ঞতার সঙ্গে নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাচার এবং সব অশুভ কল্পনা বর্জন করে সুবিচার, সত্য, ন্যায়, শৃঙ্খলা এবং অন্যান্য গুণ অর্জন করে বিশ্বসভ্যতায় তার ছাপ রেখে যাবে। শামসুজ্জামান খান এ-প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন :

'ফেরদৌসী ইতিহাসনিষ্ঠ কাব্যনির্মাতা। পাঠকেরা তাঁর বইয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা উদ্দেশ্যহীনভাবে পড়ে যাবেন এমনটি তিনি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পাঠকেরা তাঁর বইয়ের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ জটিল ও বহুমুখী ধারাপ্রবাহ সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবন করবেন এবং রাজা-রাজবংশ-ব্যক্তি বা কোনো রাষ্ট্রের কেন পতন ঘটে তা-ও তাঁর এই মহৎ গ্রন্থ থেকে বুঝে নেবেন। এবং এর মধ্য দিয়ে বিশ্বসভ্যতার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একটি নতুন পৃথিবী নির্মাণে প্রয়াসী হবেন।

গজনিতে ফেরদৌসী শাহনামা শুরু করেছিলেন ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে আর শেষ করলেন ১০১০ খ্রিস্টাব্দে ষাট হাজার শ্লোকে। কিন্তু নিয়তির কী নির্মম পরিহাস। শাহনামা রচনার সূচনাকালেই ফেরদৌসী যে ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আটকা পড়ে

গিয়েছিলেন তা থেকে আর বেরুতে পারলেন না। রচনা সমাপ্ত করে ফেরদৌসী যখন সুলতান মাহমুদের হস্তে এই উপঢৌকন তুলে দিলেন এবং রাজদরবারে এটি পাঠ করা হলো তখন নিন্দুকেরা এর কাহিনি শুনে বলতে লাগল, জাহাঁপনা একি করেছে ফেরদৌসী? আপনার ফরমায়েশে লেখা শাহনামায় আপনার গুণকীর্তন খুব অল্প জায়গাজুড়ে রয়েছে, সমস্ত জায়গাজুড়ে দেখছি অন্যান্য রাজ-রাজড়াদের কাহিনি-কীর্তন। নিন্দুকদের কথা সত্যি হলেও এর উদ্দেশ্য যে মহৎ নয় সেটি সুলতান বুঝতে পারলেন না। এটি তো খুবই স্বাভাবিক যে, চার হাজার বছরের ইরানের কথা-কিংবদন্তি, লোকবিশ্বাস আর পারস্যের প্রাগৈতিহাসিক বাদশাহ কিয়ুমারসসহ ঊনচল্লিশ জন রাজ-রাজড়া ও শতাধিক মহৎ বীরের শৌর্যগাথা বিবৃত হওয়া ষাট হাজার শ্লোকে সুলতান মাহমুদের মাত্র ত্রিশ বছর শাসনকালের বর্ণনা এরচেয়ে বেশি জায়গাজুড়ে স্থান দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত ছিল?

কিন্তু সুলতান সেই যুক্তি-বিচারে না গিয়ে নিন্দুকদের কথায়ই কান ভারী করলেন। নিজের প্রতিশ্রুত প্রতিটি পঙ্‌ক্তির বদলে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা না দিয়ে কবিকে ষাট হাজার রৌপ্য মুদ্রা প্রদানের নির্দেশ করলেন। সুলতানের এই অবিচক্ষণতা ও অবিবেচনা দেখে ফেরদৌসী বিস্মিতই শুধু হলেন না, ভীষণ রকম মর্মাহতও হলেন। সুলতানের পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে পরদিন ভোরে কাউকে কিছু না বলেই গজনি ত্যাগ করে স্বীয় জন্মভূমি তুসে চলে গেলেন কবি। তবে যাবার আগে সুলতানের এহেন আচরণের জবাবে একটি নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করে তার একটি কপি রাজকীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত শাহনামার একটি কপির শেষে সংযুক্ত করে গেলেন। আর একটি কপি টাঙিয়ে দিয়ে গেলেন গজনির শাহি মসজিদের দেয়ালে। যেখানে অভিমানী কবি সুলতানের বংশ পরিচয় নিয়ে এভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন,

> রাজবংশে হতো যদি জন্ম তোমার,
> বখশিতে স্বর্ণমুদ্রা মুকুট সোনার।
> উচ্চ মান নাহি যার বংশের ভিতর,
> কেমনে সহিবে সে মানীর আদর।
> তিক্তবীজ হতে যে তরুর জন্ম,
> নন্দন কাননে তারে কর রোপণ।
> সিঞ্চন কর মূলে মন্দাকিনী ধারা,
> মধু আর দুগ্ধে ভরা খাদ্যের পশরা।
> তথাপি ফলিবে তার আপন স্বভাব,
> সতত সে তিক্ত ফল করিবে প্রসব।

সুদীর্ঘ ২০টি বছর কবি কাটিয়েছেন গজনিতে। তাঁর জীবনের মূল্যবান সময় ও শ্রম ব্যয় হয়েছে এখানে। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে এবং রিক্ত হস্তে জীবন সায়াহ্নে গজনি ত্যাগ করে আবার বের হতে

হলো অজানা অচেনা নিরাপদ এক আশ্রয়ের সন্ধানে। ইতিপূর্বে কবির সুখ্যাতি দেশ বিদেশে যেমন ছড়িয়ে পড়েছিল; তদ্রূপ রাজদরবারে কবির ভাগ্য বিপর্যয়ের কথাও ইতিমধ্যে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ল। গজনি ত্যাগ করে কবি 'কুহেস্তান' রাজ্য রাজা নসরুদ্দিন মুহতাসেমের নিকট রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক আশ্রয়ে এখানে কবির দিনগুলো খুবই সম্মানজনক ও আনন্দের সাথে কেটেছিল। কবিকে গ্রহণ করার জন্য দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আমন্ত্রণ আসে; কিন্তু কবি কোনো আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে এখান থেকে চলে যান বাগদাদে। বাগদাদের তৎকালীন শাসনকর্তা কবিকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হন। বাগদাদ অবস্থানকালে কবি ইউসুফ জুলেখার কাহিনি নিয়ে ১৮,০০০ শ্লোকের একটি প্রেমের কাব্য রচনা করেন; কিন্তু কাব্যটি অতীতের গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। এছাড়া তিনি আরও বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। বাগদাদে কিছুদিন অবস্থান করে কবি চলে যান নিজ মাতৃভূমি তুস নগরে।

ইতিমধ্যে ন্যায় বিচারক হিসেবে পরিচিত সুলতান মাহমুদ নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, কবি তাঁর প্রতিশ্রুত স্বর্ণমুদ্রা না পেয়ে দুঃখ পেয়েছেন। রাজসভার অন্যান্য কবি এবং আমলারা কবির বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করেছিল, এ কথাও সুলতানের নিকট আর গোপন রইল না। তিনি প্রধানমন্ত্রী খাজা ময়মন্দীকে রাজপদ থেকে বহিষ্কার করেন এবং অনতিবিলম্বে কবিকে ফিরিয়ে আনার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

সুলতানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কুহেস্তানের রাজা নসরুদ্দিন মুহতাসেম কবি ফেরদৌসীর উচ্চ প্রশংসা করে সুলতান মাহমুদের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্র পাঠান্তে সুলতান খুব মর্মাহত হন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, সুলতান কবির প্রতি ন্যায় বিচার করেননি বরং ষড়যন্ত্রকারীদের কুপরামর্শে তিনি কবির প্রতি অন্যায় আচরণ করেছেন। তাই সুলতান নিজেকেই অপরাধী মনে করে কবি ফেরদৌসীকে ক্ষমা করে দেন এবং কবির প্রতি সুলতানের সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শন স্বরূপ কবির প্রাপ্য সমুদয় স্বর্ণমুদ্রাসহ কবির জন্মভূমি ইরানের তুস নগরীতে কবির নিজ বাড়িতে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু দূত যখন স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যান তখন কবি পৃথিবীতে বেঁচে নেই।

১০২০ খ্রিস্টাব্দে মতান্তরে ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে কবি এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। কবির ইন্তেকালের হাজার বছর অতিবাহিত হলেও কাব্য ও সাহিত্যের মজা মানব-মানবীর অন্তরে রেখে দুনিয়ায় অমর হয়ে আছেন, থাকবেনও।

ফেরদৌসীর চিন্তাদর্শন

ফেরদৌসীর চিন্তাধারায় জীবন ও মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। তিনি মনে করেন, মানবজীবন এক সুন্দর সংযোজন। তার মতে, ধর্ম ও দর্শন এক সারিতে চলে, যেন দুটি দিগন্ত। মানুষ যখন ধর্মের সাথে সত্যি থাকেন, তখনই শান্তি পাওয়া যায়। এই দর্শনে জীবনের মূল লক্ষ্য সুখ নয় বরং প্রকৃত মুক্তি অর্জন।

ফেরদৌসীর দার্শনিক ভাবনার মূল বৈশিষ্ট্য হলো বাস্তবতা ও অদৃশ্যের সংযোগ। তিনি মনে করেন, জীবন শুধু দেখতে বা স্পর্শ করতে পারে না। এর মধ্যে একটা গভীর আধ্যাত্মিকতা নিহিত। এই ভাবনা সমাজের মানুষের মূল্যবোধে প্রভাব ফেলেছে। মানুষ কীভাবে সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে, তার উপায় দেখায় তার দার্শনিক চিন্তা। ফেরদৌসীর মূল বিষয় হলো মানবতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব। তিনি বলেছেন, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকা দরকার। সুখের জন্য শুধু উপভোগের উপর জোর না বরং পারস্পরিক আত্মিক সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তিনি মানেন, জীবন হলো স্বাভাবিক এক অধ্যয়ন, যেখানে মানবিক মূল্যবোধ শিখতে হয় প্রতিনিয়ত। ধর্ম ও দর্শনের সংযোগে ফেরদৌসীর দর্শন গড়ে উঠেছে। তিনি মনে করেন, ধর্ম কেবল বিশ্বাসের বিষয় নয় বরং সমাজের উন্নতি সাধনের মাধ্যম। ধর্মীয় মূল্যবোধ মনুষ্যত্বের মূল চাবিকাঠি। তার মতে, ধর্মীয় নীতি মেনে চললে সমাজ আনন্দময় ও শান্তিপূর্ণ হয়। এই দৃষ্টিতে তিনি সমাজ উন্নয়নের বড়ো প্রকল্প দেখেছেন। ফেরদৌসীর দার্শনিক দর্শনে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা অন্যতম মূল লক্ষ্য। সমাজে ন্যায়ের মানদণ্ড উন্নত করতে হলে প্রত্যেকের দায়িত্ব সমান। তিনি বিশ্বাস করেন, ন্যায় ও সাম্য সমাজের ভিত্তি। এই দর্শনে স্পষ্ট, সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করতে হবে, যাতে সমতা বজায় থাকে। জীবনধারা কেমন হবে, তার দিকনির্দেশনা দেন এই দার্শনিক।

আজকের যুগে ফেরদৌসীর দর্শন অনেকটাই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ঠাসা। তার মতবাদ এখন শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় চিহ্ন। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সমঝোতা ও শান্তির জন্য তার চিন্তাগুলি প্রাসঙ্গিক। উন্নত জীবন ও মানসিক শান্তির জন্য তাঁর ভাবনা অনেকের জন্য দিকদর্শন। ফেরদৌসীর চিন্তাধারা মানে মানবতা ও ধর্মের সমন্বয়। এটাই তার মূল শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। এই ভাবনা শুধু ব্যক্তিগত উন্নতি নয় বরং সামাজিক স্থিতিশীলতার পথে বিহ্বল করে। আধুনিক যুগে তাঁর ভাবনা আরও প্রাসঙ্গিক, কারণ সমাজ এখনো শান্তি ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করে। আমাদের দায়িত্ব হলো তাঁর দর্শন অনুসরণ করে জীবনকে সুন্দর ও মূল্যবান করে তোলা।

ফেরদৌসীর চিন্তাধারায় নিহিত শিক্ষা হলো, সত্য ও ন্যায়ের পথে এগিয়ে চলা। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই দার্শনিক দিকনির্দেশনা অমূল্য সম্পদ।

তথ্যসূত্র

Abid Hasan Faridi, M.A : An Outline History of Persian Literature (A.D. 822–1926). Agra : Ram Prasad and Brothers, 1928.

Ferdowsī - britannica.com

FERDOWSI, ABU'L-QĀSEM i. Life - iranicaonline.org

ŠĀH-NĀMA iv. - iranicaonline.org

মাইকেল এইচ. হার্ট : দ্য হান্ড্রেড এ র‍্যাঙ্কিং অব দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েনশিয়াল

আবদুল মওদুদ (১৯৮০ খ্রি.) : মুসলিম মনীষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

আহমাদ তামিমদারি (২০০৭ খ্রি.) : ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস, আলহুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ইরান।
তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী (২০১৪ খ্রি.) : ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, বাড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
ফেরদৌসী (১৯৭৭ খ্রি.) : শাহনামা (মনিরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
সাদেক রেযা যাদে শাফাক (১৩৫২ সৌরবর্ষ) : তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান (ইরানি সাহিত্যের ইতিহাস), এনতেশারাতে দানেশগাহে পাহলাভি, ইরান।
হরেন্দ্র চন্দ্র পাল (১৩৬০ বঙ্গাব্দ) : পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রকাশক অজিত চট্ট ঘোষ, শ্রী জগদীশ প্রেস, কলকাতা।
নিউজ লেটার, (ঢাকাস্থ ইরানি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মুখপত্র), ৩য় সংখ্যা, মে-জুন, ২০১৩।

অনুবাদ গল্প

গল্প : হার্ট ল্যাম্প

লেখক : বানু মুশতাক
অনুবাদ : লুনা রাহনুমা

মেহরুন আধা ভেজানো দরজাটা একটু সরিয়ে ভিতরে পা রেখেছে। ড্রয়িংরুমের ডিভান খাটে শুয়ে আছে তার বাবা। বাবা ও তার বড়ো ভাই নিচুস্বরে কিছু আলোচনা করছে। মেহরুনকে ঢুকতে দেখে তারা দুজনেই কথা বন্ধ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ঠিক তখনই তার ভাইয়ের মেয়ে রাবেয়া বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠল, 'মেহরুন ফুপু এসেছে–মেহরুন ফুপু এসেছে।' রাবেয়ার বাবা মেহেরুনের মেজো ভাই আমান, তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তার গালে লেগে আছে শেভিং সাবানের ফেনা, বুরুশ হাতে ধরা। আমান ড্রয়িংরুমে দাঁড়িয়ে এমনভাবে মেহরুনের তাকিয়ে রইল যেন সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার বড়ো বোন আথিজ, যে সুর করে ছোটো বাচ্চাদের কুরআন পড়াচ্ছিল, সে ড্রয়িংরুমে ছুটে এলো, মেহরুনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সে খেয়াল করেনি তার আঁচল মাথা থেকে খসে পড়েছে। মেহরুনের মায়ের চিকন হাতে তসবিহ ধরা। তিনি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন তিনি জিজ্ঞেস করছেন : এটা কি সত্যি? এটা আসলেই কি সত্যি? মেহরুনের ছোটো দুই বোন, রেহানা ও সাবিহা ড্রয়িংরুমের দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে, রান্নাঘরে রুটিগুলো তাওয়ায় পুড়ে যাচ্ছে কিনা সেটা নিয়ে তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। তার ছোটো ভাই আতিফ এখন বাড়ি নেই, এটুকু অন্তত স্বস্তির। মুহূর্তের জন্য পুরো বাড়িটা থমকে গেছে। মেহরুনের কাছে সব অপরিচিত মনে হচ্ছে। যে মা তাকে নয় মাস গর্ভে ধারণ করেছে, বড়ো করেছে, তিনি বললেন না, 'ও তুমি এসেছ, ভেতরে এসো, এসো আমার প্রিয়।' আর তার বাবা, যে ছোট্ট মেয়েটি তার প্রশস্ত বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লে আনন্দিত হতেন, সেই মেয়েকে এতদিন পরে দেখেও তার মুখে ছোট্ট একটা স্বাগত হাসি পর্যন্ত দেখা গেল না; না হাসি দেখা গেল তার বড়ো ভাইয়ের মুখে যে তাকে আদর করে 'আমার পরি, আমার ফেরেশতা' বলে ডাকত। এমনকি ভাই আমান, যে তাকে কলেজে পাঠানোর সপক্ষে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছিল, সেও তাকে আজ বাড়িতে স্বাগত জানালো

না। ভাইয়ের স্ত্রীরা তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন সে অন্য গ্রহের কেউ।

মেহরুনের হৃদয় ভেঙে গেল। তার কোলে থাকা নয় মাস বয়সি বাচ্চাটা যখন তীব্রভাবে চিৎকার করে উঠেছে, তখনই ঘরের সবাই তাদের স্তব্ধতা থেকে বেরিয়ে এলো। বড়ো ভাই তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এনায়েত কোথায়?'

সে মাথা নিচু করে ফেলল, যেন সে ভীষণ কোনো অন্যায় করে ফেলেছে এমনভাবে বলল, 'শহরে নেই।'

'তাহলে তুমি কার সাথে এসেছ?'

একা এসেছি।'

'একা?' বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তার চারপাশে একটা শোরগোল উঠল। 'ফারুক, ওকে ভেতরে নিয়ে যাও।' বড়ো ভাইয়ের নির্দেশ জারি হতেই মেহরুন ঘরের ভিতরে ঢুকল। তার পা ভারী ও অস্থির। একটা আদালতের বিচার কক্ষের মতো মনে হচ্ছে। বাচ্চাটা চিৎকার শুরু করেছে। বোরকা না খুলে সে মুখ ঢেকে রাখা নিকাবটি উপরে তুলে দিলো আর তার বাবা শুয়ে থাকা বিছানার এক কোণে একটু ঘুরে বসল। বাচ্চার মুখে একটা স্তন গুঁজে দিয়েছে। এখনো সে মুখ ধোয়ার সময় পায়নি। বাচ্চাটা দুধ টানতেই তার পেট জ্বলতে শুরু করেছে। গত রাত থেকে সে কিচ্ছু মুখে দেয়নি। এই ঘরে এখন যে আলোচনা হবে সেখানে তার মা ছাড়া আর কোনো নারী উপস্থিত থাকতে পারবে না।

'মেহের, তুমি যে এখানে আসবে এটা ওই বাড়িতে কাউকে বলে এসেছ?'

'না।'

'বাড়ি থেকে বের হবার আগে তাদের জানিয়ে আসোনি কেন? মনে হচ্ছে তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছ আমাদের মুখে চুনকালি মাখিয়েই ছাড়বে।'

'জানিয়ে আসতে হবে কেন? কে আছে ওখানে? গত এক সপ্তাহ ধরে সে বাড়িতে আসেনি-আমাকে বলেওনি কোথায় যাচ্ছে। আপনাদের সবাইকে আমি চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু আপনারা কেউ কোনো উত্তর দেননি। আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি, আপনাদের তাতে কিছু যায় আসে না।'

'তুমি লিখেছিলে তোমার স্বামী কোনো একটা নার্সের সাথে পালিয়ে গেছে, আর তুমি চাও আমরা এটা বিশ্বাস করি?'

'আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনাদের উচিত ছিল একবার ওখানে যাওয়া আর ব্যাপারটা যাচাই করে দেখা। অনেকেই তাদের একসাথে দেখেছে।'

'আর তার সাথে দেখা করে আমাদের কী করা উচিত ছিল? আচ্ছা মনে করো, আমরা তাকে ধরে এই ব্যাপারে ব্যাপক জেরা করলাম, আর সে বলল, হ্যাঁ, কথা সত্যি–আমরা তখন কী করতাম? আমাদের কি মসজিদে বিচার বসাতে হবে? ওখানে গিয়ে সে বলবে, আমি ভুল করেছি, নার্স মেয়েটাকে আমি মুসলমান বানাব আর তাকে নিকাহ করব। তখন ওই মেয়েটা তোমার সতিন হবে। আর মনে করো, তোমার স্বামীকে আমরা আরও ধমক দিলাম, তখন যদি সে বলে, আমি মেহরুন

নামের ওই মহিলাকে চাই না, আমি তাকে তালাক দেব, তখন আমরা কী বলব?'

এইবার মেহরুন নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। সে অঝোরে কাঁদছে। বাচ্চাটাকে অন্য স্তনে সরিয়ে নিয়ে খাওয়াতে থাকল। বোরকার নিচ থেকে শাড়ির আঁচল টেনে নিয়ে চোখ ও নাক মুছে নিল। ঘরের মধ্যে এক মুহূর্তের নীরবতা নেমে এসেছে।

'তার মানে আপনারা কিছুই করতে পারবেন না, তাই না?' কোনো কথা শোনা গেল না। সে বলতে লাগল,

'আমি আপনাদের পায়ে ধরে বলেছিলাম আমি বিয়ে করতে চাই না। আপনারা আমার কথা শুনেছিলেন? আমি বলেছিলাম, আমি বোরকা পরব, তবু আমি কলেজে যেতে চাই। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করেছিলাম আমার লেখাপড়া বন্ধ করে না দিতে। আপনারা কেউ আমার কথা শোনেননি। আমার সাথে একই ক্লাসে পড়া অনেক মেয়ের এখনো বিয়েই হয়নি, আর আমি একটা বুড়ি হয়ে গেছি। আমার উপর এখন পাঁচটা বাচ্চার বোঝা। তাদের বাবা ইচ্ছা মতো যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমার কোনো জীবন নাই। একটা পুরুষ মানুষ যখন এমন একটা হারাম কাজ করছে, তখন আপনারা কেউ তাকে জিজ্ঞেস করতে পারছেন না কেন সে এমন কাজ করছে?'

'যথেষ্ট হয়েছে মেহের, যথেষ্ট হয়েছে' তার মা চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়ে।

'হ্যাঁ, আম্মা, আমারও যথেষ্ট হয়েছে। লোকজন প্রথমে তাকিয়ে থাকত ফিসফাস করত, তারপর যারা তাদের দুজনকে একসাথে থিয়েটারে দেখেছে, হোটেলে ঢুকতে দেখেছে, তারা এসে সরাসরি আমাকে তাদের কথা বলেছে। এরপর তার সাহস বেড়ে গেল। সে ওই মহিলার বাড়িতে যাওয়া আরম্ভ করে দিলো। এলাকার সবাই তাকে বকাবকি করার পর সে বেঙ্গালুর চলে গেছে, হাজার হাজার রুপি খরচ করে মেয়েটাকে এখানে বদলি করিয়ে এনেছে। গত আট দিন ধরে সে ওই মেয়ের সাথেই আছে। আর কতদিন আমি এসব সহ্য করব? আমি কীভাবে বাঁচব?'

'একটু ধৈর্য ধরো, মেয়ে আমার। একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভালোবাসা দিয়ে ওকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করো।'

'আম্মা, আমার কি হৃদয় বলে কিছু নেই? আমার কি অনুভূতি নেই? আমাকে ফেলে এভাবে চলে গেছে সে, তাকে আমি স্বামী হিসেবে আর সম্মান করতে পারছি না। তাকে দেখলে আমার শরীর ঘৃণায় ভরে যায়। ভালোবাসা তো অনেক দূরের কথা। আমাকে তার তালাক দিতে হবে না–আমি তার কাছ থেকে তালাক নেব। ওই বাড়িতে আমি আর যাব না।'

'মেহের, এসব তুমি কী বলছ? খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সে পুরুষমানুষ, আর একটুখানি কাদায় পা দিয়ে ফেলেছে, কিন্তু পানি পেলেই কাদা ধুয়ে ফেলবে আর তোমার ঘরে ফিরে আসবে, তার গায়ে তখন কোনো দাগই থাকবে না। পুরুষের গায়ে কখনো দাগ লাগে না।'

মেহের এসব কথার জবাবে কিছু বলার আগেই আমান কথা কেড়ে নিল।

'দেখেন, আমাদের সামনে সে কেমন ব্যবহারটা করছে। স্বামীর সামনেও নিশ্চয় এইভাবেই কথা বলে। আর এই কারণেই ওর স্বামী রেগে চলে গেছে।' একটু থেমে আমান গলার স্বর নিচু করে বলল, 'এই বাড়ির বউরা যদি এই ধরনের আচরণ শিখে ফেলে তাহলে তো দারুণ হবে, তাই না?' মেহরুনের দুঃখ দ্রুত বদলে গিয়ে রাগে আর তারপর হতাশায় পরিণত হলো।

'তুমি খুব ভালো যুক্তি দিচ্ছো, আন্না। আল্লাহ তোমাকে সুস্থ রাখুন। এটা ঠিকই : আমিই খারাপ মানুষ। বুঝতে পারছি আমার কোথায় ভুল হয়েছে। আমি বোরকা ছাড়া বাইরে যাইনি। আমাকে সে বোরকা ছেড়ে দিতে বলেছিল, আর নাভির নিচে শাড়ি পরে তার হাত ধরে ঘুরে বেড়াতে বলেছিল। কিন্তু আপনারা আমাকে বোরকা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন, আমাকে এমনভাবে বড়ো করেছেন যেন আমি মাথা থেকে শাড়ির আঁচলও খসে পড়তে না দেই, তাই না? এখন যদি আমি পর্দা ছাড়া চলাফেরা করি আমার নিজের কাছে উলঙ্গ মনে হয়। আপনারা আমার ভিতরটা আল্লাহর ভয় দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন। আমি তার কথা মতো চলতে রাজি হইনি, তাই সে এমন একজনের সাথে গিয়ে মিশেছে যে তার ইচ্ছার সুরে নাচে। আপনারা সবাই এখন ভয় পাচ্ছেন, আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে দিলে আপনাদের উপর আমি একটা বোঝা হয়ে যাব, এই কারণে আপনারা আমাকে সহ্য করতে বলছেন। কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব না। ওই জীবন্ত দোজখে থেকে পোড়ার চেয়ে আমি বরং আমার বাচ্চাদের নিয়ে কোথাও কুলির কাজ করব। আপনাদের সবার ঘাড়ে আমি বোঝা হব না, একদমই বোঝা হব না।'

'ফল কি কখনো লতার বোঝা হয়, মেহের? বাজে কথা বলো না।' তার মা প্রতিবাদ করেন।

'আম্মা, ওকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে ভালো করে বোঝান, ওকে কিছু খেতে দেন।' গম্ভীরভাবে তার বড়ো ভাই বলল। 'দশ মিনিটের মধ্যে আমরা চিকমাগালুরে রওনা হব। যদি বাস থাকে তাহলে বাসে যাব। বাস না থাকলে আমরা ট্যাক্সি নেব। ওর কথায় আমরা নাচতে পারব না।'

'আপনাদের বাড়িতে আমি এক ফোঁটা পানিও খাব না। আমি চিকমাগালুরেও যাব না। আপনারা যদি আমাকে জোর করে ওখানে নিয়ে যান, আমি কথা দিচ্ছি আমার গায়ে আমি আগুন ধরিয়ে দিব।'

'এটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, মেহের। যারা মরতে চায় তারা কখনো মরার কথা বলে বেড়ায় না। কিন্তু তোমার যদি এই পরিবারের মানসম্মান নিয়ে সামান্যতম চিন্তা থাকত, তাহলে তুমি এখানে না এসে ওটাই করতে। যে বাড়িতে তোমার পালকি যাবে, সেই বাড়ি থেকেই তোমার খাটিয়া বেরোবে। এটাই একটা ভদ্র মেয়ের জীবন। হাইস্কুলে পড়ুয়া একটা মেয়ে আছে তোমার, দুটো ছোটো বোন আছে যাদের বিয়ের বয়স হয়েছে। তোমার একটা ভুল পদক্ষেপ তাদের ভবিষ্যতের

পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তুমি চাইছ আমাদের তোমার ছেলেমানুষি কথা শুনতে হবে, তোমার স্বামীর সাথে ঝগড়া করতে হবে, কিন্তু আমাদেরও তো বউ বাচ্চা আছে। তাই আমি বলছি, তুমি বাড়ির ভিতরে যাও, কিছু খাওয়া-দাওয়া করো।' ছোটোভাইয়ের দিকে ঘুরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বড়োভাই আবার তার দিকে মুখ ফিরিয়েছে। বলল, 'আম্মান, দৌড়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আয়। আর তুমি মেহের, তোমার বাচ্চারা অথবা প্রতিবেশীরা যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবে ছোটো বাচ্চাটাকে নিয়ে তুমি হাসপাতালে গেছিলে, অথবা অন্য কিছু বানিয়ে বলো। বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলে কখন?'

কিছু বলল না মেহরুন।

'এখন সাড়ে নটা বাজে।' আমান বলে। 'সে এসেছে নয়টায়। তিন ঘণ্টার রাস্তা। নিশ্চয় বাড়ি থেকে সকাল ছয়টায় বের হয়েছে। আমরা যদি এই মুহূর্তেই বেরিয়ে যাই তাহলে সাড়ে বারোটার মধ্যে পৌঁছাতে পারব।'

মেহের যেখানে বসেছিল সেখান থেকে নড়ল না। তার মা আর ছোটো বোনেরা পালাক্রমে তাকে কিছু খেতে অনুরোধ করতে থাকে, কিন্তু সে খাবারের একটি গুঁড়ো অথবা এক ফোঁটা পানিও মুখে দিলো না।

ট্যাক্সি যখন এলো, সে কারো সাথে কথা বলল না। ঘরের বাইরে বেরিয়ে শিশুটিকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে থাকল। পাশে থাকা বড়ো ভাইদের কাউকেই সে বিদায় জানালো না। শেষ কয়েকটি পা ফেলার সময় সে পিছনে ফিরে তাকালো যে বাড়িতে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তার দুই চোখে অশ্রু ভরে উঠেছে। ঘরের মধ্যে তার বাবা বুক চেপে ধরে কাশছে। তার মা কাঁদছে, একবার মেয়ের দিকে তাকাচ্ছে তারপর তার স্বামীর দিকে, স্বামীকে শুইয়ে দিয়ে বাতাস দিচ্ছে, জল ছিটাচ্ছে, আর আপনমনে বলল, 'আল্লাহ, আমি যদি আমার সারাজীবনে একটুও পুণ্য করে থাকি, কোনো ভালো কাজ, কোনো সওয়াব অর্জন করে থাকি, তাহলে আমার মেয়ের সাজানো সংসার যেন ঠিক থাকে।'

আমান গাড়ির দরজা খুলে ধরেছে। মনের মধ্যে অসন্তোষ চাপা দিয়ে মেহরুনকে চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করল গাড়িতে উঠে বসতে। চাপা ক্রোধে বিড়বিড় করছে মেহরুন। আগে তার খুব গর্ব ছিল, মাঝেমাঝে সে বড়ো ভাইদের নিয়ে অহংকার করত। স্বামী এনায়েতের উপর যখন সে রেগে যেত, বলত,

'আমার ভাইরা শের-ই-বাবরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তুমি যদি আমার সাথে এই ধরনের ব্যবহার করতে থাকো তাহলে একদিন তারা তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে, হুশিয়ার!' কিন্তু তার এই গর্ব এখন সম্পূর্ণভাবে ধুয়ে গেছে। ভাইদের কথা তার কানে বাজছে। 'আমাদের পরিবারের মানসম্মান রক্ষা করার বুদ্ধি যদি তোমার থাকত, তাহলে তুমি আগুনে পুড়ে মরতে। আমাদের এখানে আসা তোমার উচিত হয়নি।'

গাড়িতে ওঠার সময় মেহরুন বাড়িটার দিকে ফিরে তাকায়নি, তাই জানালা থেকে উঁকি মেরে দেখা মাকে দেখতে পেল না, পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিতে থাকা বোনদের দেখল না, এমনকি তার ভাবিদেরও না, যারা সম্ভবত ঘরের ভিতরে কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু তার ঘোমটার নিচে মুখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। গাড়িতে বসে সে ঠোঁট কামড়ে ধরল আর ছোটো ছোটো ফোঁপানিগুলো গিলে ফেলতে লাগল।

গাড়ি দ্রুত গতিতে ছুটছে। তারা কেউই কথা বলছে না। আমান সামনের সিটে মহল্লার ড্রাইভারের পাশে বসেছে। মহল্লার একটা লোকের সামনে কেউ পারিবারিক গোপন বিষয় আলোচনা করতে পারে?

তাদের যাত্রা নীরবে চলতে থাকে। এনায়েতের প্রেম ও কামলালসার খেলায় মেহরুন একটা গুটি হয়ে ডুবে ছিল ষোলো বছর। আর ষোলো বছর পরে এনায়েত তার নারীত্বকে অপমান করেছে, বলেছে, 'তুমি একটা লাশের মতো পড়ে থাকো। তোমার কাছ থেকে আমি কী সুখ পেয়েছি?'

মেহরুনকে সে উপহাস করে বলেছে, 'আমি তোমাকে কী দেইনি–কাপড়, খাওয়া? আমাকে থামাতে আসবে কে, আমি এমন এক নারীর কাছে যাই যে আমাকে খুশি করতে পারে।'

মেহরুন পুরোটা পথ বাইরের গাছ, দৃশ্য অথবা রাস্তার কিছুই দেখেনি। গাড়িটা আচমকা থেমে গেলে সে উদাসীনভাবে চোখ তুলে বাইরে তাকালো, বাড়িটা চোখে পড়ল, যেটাকে সবাই তার বাড়ি বলে। শুকনো মুখের এক অল্পবয়সি মেয়ে বাড়ির দরজা থেকে ছুটে এসেছে গাড়ির কাছে। মেয়েটা বলল,

'অবশেষে, আপনি ফিরে এসেছেন আম্মি। আমি খুব চিন্তায় ছিলাম।' মায়ের কোল থেকে সে বাচ্চাটা তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে আবার বাড়ির ভিতরে দৌড়ে চলে গেল।

মেহরুন ধীর পায়ে বাড়িতে ঢুকল। বাড়িটা খালি খালি লাগছে। বাকি বাচ্চারা স্কুলে চলে গেছে, আর তার ষোলো বছর বয়সি মেয়ে সালমা, মায়ের সাথে যে নিজেও মায়ের যন্ত্রণা অনুভব করে দুঃখী হয়েছে, মেহরুন চলে যাবার পর বাড়িতে আজ সে-ই সবার বড়ো ছিল। সালমা তার ভাইবোনদের স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে ওর মায়ের ফেরার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। মায়ের সাথে মামাদের দেখে সালমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মামাদের দেখে সে বেশ উত্তেজিত বোধ করছে। সে ভাবল, মামারা নিশ্চয় অন্য মহিলাটার চুল ধরে টেনে বের করে দিবে, আর মহিলাকে তাদের জীবন থেকে তাড়িয়ে দেবে। হরিণের মতো দ্রুত গতিতে ছুটছে সালমা, মামাদের নাস্তা দিয়েছে, চায়ের পানি ফুটাচ্ছে।

মেহরুন তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। সালমা ভেতরে ঢুকে মায়ের গাল থেকে অশ্রু মুছে দিলো, কিছু খাবার মুখে তুলে দিলো, আর অবশিষ্ট খাবারের প্লেট নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সালমা দৌড়ে

আবার শোবার ঘরে গেল। 'আম্মি, আম্মি, আব্বা এসেছে।' মেহরুন তার কথা না শোনার ভান করে নিজেকে ঢেকে রাখা কম্বলের ভিতরে আরও ডুবে গেল। সালমা লিভিংরুমে চলে যাবার পর মেহরুনের মাথার শিরাগুলো থপথপ করে লাফাতে শুরু করল। সালমার মামারা ঘরের দাওয়ায় চলে গেছে। সালমা পুরুষদের কথা শুনতে পাচ্ছে, তাদের কথাবার্তা, হাসি, সালাম।

'আরে, ভাইয়া! আপনি কখন এসেছেন?' এনায়েত জিজ্ঞেস করছে।

'এখনই এলাম। তুমি কেমন আছো?'

'ওহ, আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আর সব আপনাদের দোয়া।'

আমানের কণ্ঠস্বর, 'কাথায় গিয়েছিলেন এনায়েত ভাই?'

'এই তো এখানেই। এই সেই কিছু কাজ, এটা ওটা আর কি–জানেনই তো কেমন চলে দিনকাল। সবচেয়ে বড়ো কথা ঘুম থেকে ওঠার পর আমরা তো ঘরে বসে থাকতে পারি না। সালমা, সে ডাকে,

'সালমা, তোর আম্মি কোথায়, দেখ কে এসেছে। আম্মিকে বাইরে আসতে বল।'

ঘরের ভিতর থেকে কোনো শব্দ হলো না। 'আশ্চর্য তো, কোথায় গেল, এনায়েত বলে। 'ও নিশ্চয় বাচ্চা নিয়ে ঘরের ভিতরে আছে, আমি ওকে ডাকছি, আপনারা একটু থাকেন।' ঘরের ভিতরে এসে সালমাকে দেখতে পেল, নিচুস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'এরা কখন এসেছে? তোর আম্মি কই?' এনায়েতের মনে সন্দেহের একটা সুতো ছড়াতে আরম্ভ করেছে।

'মামারা এখনই এসেছে, আম্মি এখনও ঘুমাচ্ছে।' চালাকি করে উত্তর দিলো সালমা।

এনায়েত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'এখনও ওঠেনি? কী হয়েছে তার?' শোবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে এনায়েত। মেহরুনের গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকা আর ঘুমাতে দেখে সে বিরক্ত হয়েছে। তার কাছে মেহরুনের কিছুটাও গুরুত্ব থাকার একমাত্র কারণ সে তার সন্তানদের মা। যদিও ইচ্ছে করছিল, কিন্তু পা দুটো তাকে ঘরের ভিতরে টেনে নিতে পারল না।

চোখ বন্ধ করে মেহরুন কল্পনা করেছিল কীভাবে তার স্বামী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। স্বামীর পোশাক, সিগারেটের দুর্গন্ধ, ঘামের গন্ধ, বুড়িয়ে যাওয়া শরীর, বড়ো বড়ো চোখ। যে পুরুষ তার প্রতিটি নার্ভে ছাপ রেখে গেছে, আজ সে তার অপরিচিতজন। শক্ত করে কম্বল জড়িয়ে ধরে থাকল মেহরুন, লোকটার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে সে।

'সালমা, এখানে আয়। তোর মাকে বল এইসব নাটক বন্ধ করতে। ভাইদের এখানে ডেকে এনেছে আমাকে উপদেশ দেওয়াতে, এসব করলে সে নিজের গলায় ফাঁস লাগানোর চেষ্টা করবে। আমি শুধু একদমে বলব, এক দুই তিন, ব্যস, খেলা

শেষ, বল তোর মাকে। আর তাকে বলে দে, তার তালাকের পরে সে ছোটো বোন আর নিজের মেয়েদের বিয়ে দিতে পারবে কিনা। তাকে বল, এই বাড়িতে সে মেহমানদের সামনে আমার পরিবারের সম্মান নষ্ট করছে। তাকে বল, তোর মাকে কথাগুলো পরিষ্কার করে বল। ভাইদের সামনে গিয়ে দেখা করে হাসিমুখে কথা বলুক; তোর মাকে জিজ্ঞেস কর মুরগি না খাসির মাংস আনতে হবে, দুপুর প্রায় হয়ে গেছে, তোর মাকে বল জলদি রান্নার আয়োজন শুরু করতে।' সালমা সেখানে ছিলও না, কিন্তু এনায়েত তার যা যা বলার ছিল সব থুথু ছিটিয়ে মুখ থেকে বের করে দিয়েছে, কল্পনা করে নিয়েছিল সালমা সেখানে আছে।

একটা ঘরে এনায়েত আর মেহরুনের ভাইয়েরা এমনভাবে আলাপ করে যাচ্ছে যেন কোনো সমস্যাই হয়নি। তারা কফির দাম, কাশ্মীরের নির্বাচন, পাড়ার এক বৃদ্ধ দম্পতির হত্যার তদন্ত, মহল্লার এক মুসলিম মেয়ে যে এক হিন্দু ছেলের সাথে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছে, এইসব ওইসব নিয়ে তারা কথা চালিয়ে গেল। তাদের কথা চলতেই থাকল যখন প্রেসার কুকারের সিটি বেজে উঠল, ব্লেন্ডার ঘুরল, মশলার শক্তিশালী মনকাড়া গন্ধ ভেসে এলো, মুরগি নিয়ে আসা হলো, আর যখন খাবার প্রস্তুত হয়েছে, কারণ মেহরুন রান্না করেছে, আর সালমা দৌড়াতে থাকল তাদের সবাইকে দুপুরের খাবার পরিবেশন করতে। মেহরুন রান্নাঘর থেকে একবারই বেরিয়ে এসেছিল, কেবল সামান্য সময়ের জন্য।

পেট পুরে খাওয়ার পরে, মুখে তাম্বুল গুঁজে, মেহরুনের ভাইয়েরা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। চলে যাওয়ার আগে আমান রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'একটু বুদ্ধি খাটিয়ে নিজের সংসারে সবকিছু সামলাও। সামনের সপ্তাহে আবার এসে তোমাকে দেখে যাব। কয়েকদিন সে এইরকম করবে, তারপর একাই ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে। মেয়েদের কত রকম সমস্যা হয়–মাতাল স্বামী পায়, শাশুড়ি মারধর করে। আল্লাহর শুকরিয়া যে তাদের তুলনায় তুমি ভালো আছো। সে একটু দায়িত্বজ্ঞানহীন, এটুকুই। তোমাকেই সংসারের দায়িত্ব নিয়ে এসবের মধ্যে সামলে চলতে হবে।' মেহরুনের ভাইরা চলে গেল, আর রাস্তায় গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যেতেই এনায়েতও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

মামারা তাকে কোনো সান্ত্বনাও দেয়নি অথবা সাহায্যও করেনি। সালমা ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। মায়ের দুঃখে সে থরথর কাঁপছে। বাবা যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। বাড়িটা যেন বিষাদের এক কালো চাদরে ঢেকে গেছে। আর যখন ছোটো ছেলেমেয়েগুলো স্কুল থেকে ফিরে এলো, তারা এই কালো চাদরটা তুলে দিতে পারল না। সবারই কিছু নিজস্ব কাজ আছে, সবাই নিজের বোঝা নিয়ে ব্যস্ত।

বিকেলের আলো কমতে শুরু করলে, ঘরের চারপাশে বাতি জ্বলে উঠল। কিন্তু মেহরুনের হৃদয়ের বাতি অনেক আগেই নিভে গেছে। কার জন্য বেঁচে থাকবে সে? কী মানে আছে বেঁচে থাকার? দেয়াল, ছাদ, থালা, বাটি, চুলা, বিছানাপত্র,

বাসনকোসন, সামনের উঠানে গুলাব গাছ–এগুলোর কোনোটাই তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। নিজের আশেপাশে মেহরুন এমন একজোড়া নিস্তেজ চোখ দেখতে ব্যর্থ হলো যারা তাকে পাহারা দিচ্ছে। বড়ো মেয়ে সালমা চাইছিল নিজেকে বইয়ের মধ্যে সমাহিত করতে; এখন তার আসন্ন এসএসএলসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার কথা। কিন্তু নাম না জানা এক বিরাট উদ্বেগ তাকে অস্থির করে রেখেছে, ক্রমাগত সে তার মাকে দৃষ্টির পাহারায় রেখেছে।

রাতের নিস্তব্ধতায় মেহরুন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। সময়টা তার জীবনের মতোই গভীর কালো। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল সালমা এখনো জেগে, ড্রয়িংরুমে পড়াশোনা করছে, তার চোখ প্রহরী হয়েছে মায়ের ঘরের দিকে। মেহরুনের ঘুম উধাও হয়ে গেছে। সে ভাবছে : বিয়ের আগে তার নিজের বাড়িতেও লড়াই কি সহজ ছিল? এনায়াতের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল বি,কম দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার এক মাস আগে। সে কেঁদেছিল, তাকে পরীক্ষা দিতে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল, কিন্তু তার অনুরোধে সবাই কানে তালা লাগিয়ে ছিল। বিয়ের এক সপ্তাহ বা এমন একটা সময়ের পরে মেহরুন একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে পরীক্ষার দেয়ার ব্যাপারে স্বামীর সাথে কথা বলেছিল। এনায়েত হেসেছিল, তাকে লাভ, ডার্লিং, আমার জান ইত্যাদি ডেকেছে। আর বলেছিল, ‘তুমি যদি এখানে না থাকো, আমার কি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে না ?’

মেহরুন বিশ্বাস করেছিল, সে পাশে না থাকলে তার স্বামীর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সে খুশি হয়েছিল। স্বামীর প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করেছে সে, আর সে ছিল তার স্বামীর হৃদয়ে আলো জ্বালানোর বাতি। মাত্র এক বছর আগে শ্বশুর-শাশুড়ি মারা যাওয়ার পর মেহরুন অবশেষে স্বামীকে সম্পূর্ণভাবে নিজের করে পেয়েছিল। ননদরা সবাই তখন নিজেদের স্বামীর বাড়িতে চলে গেছে; দেবর ও ভাসুররা যার যার নিজের পথে চলে গেছে। একটা অনেক দিনের স্বপ্ন, মেহরুনের নিজের একটা বাড়ি হবার স্বপ্ন, সেটাও পূরণ হয়েছে। কিন্তু এখন যখন সে এটা পেয়েছে, এতদিনে তার মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, হাতের শিরাগুলো চামড়ার ওপরে ফুটে উঠেছে, চোখের নিচে একটা পাতলা কালো ছায়া পড়েছে, গোড়ালি দুটো ফেটে গেছে, আর তার ভাঙা অসমান নখের নিচে স্থায়ীভাবে ময়লা জমে গেছে, তার চুল পাতলা হয়ে গেছে–কিন্তু এসবের কিছুই সে লক্ষ করেনি। আর হয়তো এনায়েতও লক্ষ করত না, যদি না তার অ্যাপেনডিক্সের অস্ত্রোপচার না হতো, আর সেই নার্স, যে একটি বেসরকারি হাসপাতালে খুব কম বেতনে অনেক কাজ করে, যে নার্স মেয়েটা চোখে হাজার হাজার স্বপ্ন নিয়ে হেঁটে যেত অথবা সেই মেয়েটা হয়তো বাতাসে ভেসে বেড়াতো–কেউ জানে না, মেয়েটার উজ্জ্বল ত্বক ও মধু-রঙের চোখ যে কাউকে ঘূর্ণির মতো টেনে নিতে পারে, সেই নার্স যার বয়স ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে যাচ্ছে, আর যে তার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে ও স্বপ্ন পূরণ করতে যে কোনো কিছুই করতে প্রস্তুত ছিল–মেয়েটার সাথে এনায়েতের যদি কখনো দেখা না হতো।

এনায়েত এই নার্সকে কখনো 'সিস্টার' ডাকেনি। হাসপাতালে কাটানো দিনগুলোর প্রথম দিন থেকেই সে তাকে নাম ধরে ডেকেছে।

আর এরপর এনায়েত সেই গর্ভকে অপমান করেছে যে গর্ভ তাকে তার রক্তের অনেকগুলো সন্তান উপহার দিয়েছে। সে মেহরুনের ঢিলা পেট আর ঝুলে পড়া স্তনের জন্য তাচ্ছিল্য ও তিরস্কার করেছে যেগুলো তাদের সন্তানদের ক্ষুধা মিটিয়েছে। এনায়েত মেহরুনের আত্মাকে পোশাকহীন নগ্নও অনুভব করিয়েছে। একদিন সে বলেছিল, 'তুমি আমার মায়ের মতো' এই শব্দগুলো দিয়ে মেহরুনকে সে জীবিত অবস্থায় নরকের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। এই কথাগুলো উচ্চারিত হবার পর থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত মেহরুন যতদিন এই বাড়িতে খাবার খেয়েছে, খাবারের প্রতিটি গ্রাস তার কাছে পাপের মতো মনে হয়েছে। তার মনের মধ্যে অবিরাম নিজের বাড়িতে এক অপরিচিতজন হয়ে ওঠার অনুভূতি ঘুরে বেড়িয়েছে, আর অপমানের আগুন তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, আর তাই সে নিজের পরিবারের কাছে সাহায্য চেয়েছিল।

রাত গভীর হতে থাকে। মেহরুনের হৃদয়ের উত্তেজনাও তীব্রতর হচ্ছে। আগে কখনো সে এমন একাকীত্ব অনুভব করেনি। জীবনের প্রতি সে কোনো আকাঙ্ক্ষা অনুভব করছে না। বিছানায় উঠে বসল মেহরুন। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। তার সাথে খুনসুটি করার, আলিঙ্গনে বাঁধার, চুমু খাওয়ার মতো কেউ নেই। যে মানুষটা এই কাজগুলো করত, এখন সে অন্য কারো। মেহরুনের মনে হতে থাকে তার এই জীবনের বুঝি কোনো সমাপ্তি নেই। এমনকি পিছন থেকে আসা জোরালো শব্দও তাকে বিচলিত করল না। সে জানে একটা ফ্রেমে বাঁধা ছবি দেয়াল থেকে পড়ে গেছে, কাচ ভেঙে গেছে, ফ্রেমটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে আর ছবিটি মেঝেতে পড়ে গেছে। কিন্তু তার মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগ বাসা বেঁধেছে আর নিজের ভিতরের বিশৃঙ্খলা মিটানোর কোনো ইচ্ছাও তার নেই। ধীরে ধীরে সে বিছানা থেকে নেমে গেল। দীর্ঘ সময় শিশুটার দিকে তাকিয়ে রইল। আর তারপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরে তার ছোটো বাচ্চাগুলো শান্তিতে ঘুমাচ্ছে।

যখন সে পা টিপে টিপে ড্রয়িংরুমে ঢুকেছে, সালমাকে সেখানে দেখতে পেল। যেখানে বসে সালমা পড়ছিল, সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে, মাথাটা টেবিলের উপর হেলে আছে। ঘুমন্ত মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে মেহরুন কাঁপতে শুরু করে। সে ভেবেছিল তার সমস্ত অনুভূতি মরে গেছে, কিন্তু সালমার দিকে তাকাতেই তার ভেতরে যে অসম্ভব আবেগ তাকে উদ্‌বেলিত করল, সেই ঢেউ তাকে ভেঙে পড়তে বাধ্য করছে। নিজের মেয়েকে স্পর্শ করার তীব্র ইচ্ছা দমন করে মেহরুন মনে মনে বলল, 'ও আমার প্রিয় কন্যা, তোমাকে এই বাচ্চাদের মা হতে হবে।'

তার পা দুটো তাকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। দরজা খুলে সামনের উঠানে পা রাখল। বাগানের যে কয়েকটি গাছ সে পরিচর্যা করত, সেগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে কাঁদছে। মনে হচ্ছে তারা মেহরুনের নেয়া সিদ্ধান্তে মাথা নেড়ে সম্মতি

জানাচ্ছে। ঘরের ভিতরে ফিরে এলো সে, পিছনে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিয়েছে। মেহরুন রান্নাঘরে গেল, কেরোসিনের গ্যালন হাতে তুলে নিল আর বাড়ির সবখানে ঘুরে দেখতে লাগল এই তরলটুকু কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজের গায়ে ঢেলে দেয়া যায়। ড্রয়িংরুমে ফিরে আসার আগে সে আরেকবার থামল তার ঘুমিয়ে থাকা বাচ্চাদের দেখতে। সে সালমার দিকে তাকালো না।

দ্রুত পায়ে মেহরুন রান্নাঘরে গেল। ম্যাচের বাক্সটা হাতে নিল। ডান হাতে বাক্সটা শক্ত করে ধরে খুব সাবধানে সামনের দরজার ছিটকিনি খুলে আবার উঠানে পা রাখল। রাতের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে সে নিশ্চিত হয়ে গেল, এই পৃথিবীতে তার কেউ নেই, কেউ তাকে চায় না। নিজের গায়ে কেরোসিন ঢালার সময় সে এসব ভাবতে থাকে। মেহরুন এমন এক শক্তির কবলে পড়েছে যা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। চারপাশে তাকালো সে, কিন্তু কোনো শব্দ তার কাছে পৌঁছালো না, কোনো স্পর্শ সে অনুভব করতে পারল না, কোনো স্মৃতি অবশিষ্ট নেই তার মনে, কোনো সম্পর্কই আজ তাকে গাঁথতে পারছে না। সে তার চেতনার বাইরে চলে গেছে। কিন্তু তখন ঘরের ভিতরে সবকিছুই ঘটছিল। সেখানে বাচ্চার ক্ষুধার চিৎকারে সালমার ঘুম ভেঙে গেছে। সালমা বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, 'আম্মি, আম্মি' বলে ডাকতে শুরু করেছে। সালমা ছুটে গেছে তার ভাইবোনেরা যেখানে ঘুমাচ্ছিল সেখানে। তারপর ঘরের ভিতর সবখানে সে মাকে খুঁজছে, এমনকি ঘরের দরজা খোলা দেখা আর উঠানে দৌড়ে যাওয়া, ঝাপসা অন্ধকারে তার মায়ের ছায়া দেখা ও কেরোসিনের গন্ধ পাবার আগে থেকেই সালমা তার মাকে খুঁজছিল। কিছু চিন্তা না করেই সে বাচ্চাটা কোলে নিয়ে দৌড়ে উঠানে এগিয়ে গেল, মাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। তার মা, হাতে দেশলাইয়ের বাক্স, যে মেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে তার দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকালো, যেন সে অন্য কাউকে প্রত্যাশা করেছিল। বাচ্চাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে সালমা চিৎকার করে উঠল, 'আম্মি! আম্মি! আমাদের রেখে চলে যাবেন না!' মায়ের পা জড়িয়ে ধরেছে সে।

সালমা ফোঁপাচ্ছে, আর ছোট্ট শিশুটি মাটিতে কাঁদছে।

মেহরুন তাদের দিকে তাকিয়ে আছে, আর মেহরুন সেই অদ্ভুত শক্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে লড়াই করছে যা তাকে গভীরভাবে ঘিরে রেখেছে। মেহরুনের হাত থেকে ম্যাচের বাক্সটা পড়ে গেল। সালমা এখনো তার মায়ের পা জড়িয়ে আছে। সে বলছে,

'আম্মি, আপনি শুধু একজনকে হারিয়েছেন বলে আমাদের সবাইকে সৎ-মায়ের দয়ার ওপর ছুড়ে ফেলবেন? আব্বার জন্য আপনি মরতে প্রস্তুত, কিন্তু আমাদের জন্য কি আপনার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব না? আপনি কীভাবে আমাদের সবাইকে এতিম করে দিতে পারেন, আম্মি? আমরা আপনাকে চাই। আপনাকে আমাদের প্রয়োজন।' কিন্তু কথার চেয়েও বেশি কিছু ছিল সালমার স্পর্শ, যা মেহরুনকে প্রভাবিত করেছে।

কাঁদতে থাকা বাচ্চাকে তুলে নিয়ে মেহরুন সালমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। অনুভব করল যেন কোনো বন্ধু তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, স্পর্শ করছে ও বোঝাচ্ছে। মেহরুনের চোখ ভারী হয়ে এলো। যেভাবে রাতের অন্ধকার গলে যাচ্ছে, সেইভাবে সে শুধু এটুকুই বলতে পারল, 'ওরে আমার মেয়ে, আমাকে মাফ করে দে।'

(গল্পটি কন্নড় ভাষা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করেছেন, দীপা ভাস্তি)

বানু মুশতাক (জন্ম : ৩ এপ্রিল ১৯৪৮) ভারতের কর্নাটক রাজ্যের একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক। জীবিকাসূত্রে তিনি একজন আইনজীবী, এছাড়া সমাজকর্মী হিসেবে বিখ্যাত। তিনি কন্নড় ভাষায় লেখেন। ২০২৫ সালে তার ছোটোগল্প সংকলন হার্ট ল্যাম্প-এর জন্য আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার লাভ করেন। বইটি ইংরাজিতে অনুবাদ করেছেন দীপা ভাস্তি। তিনি ছোটোবেলা থেকেই লেখালেখিতে আগ্রহী ছিলেন। ২৯ বছর বয়সে মা হন ও তখন ডিপ্রেশনে ভুগতে থাকেন, সেই সময় তিনি লেখালেখিতে মনোযোগ দেন। তিনি তাঁর অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতাগুলোকে বুঝাতে এবং প্রকাশ করতে লেখালেখির পথ নেন। তাঁর লেখার অনেক অংশই

নারীদের সমস্যা নিয়ে লিখিত।

বানু মুশতাক ছয়টি ছোটোগল্পের সংকলন, একটি উপন্যাস, একটি প্রবন্ধের সংকলন এবং একটি কবিতার সংকলন প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাজগুলি উর্দু, হিন্দি, তামিল, মালায়ালম, ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর 'কারি নগরাগালু' গল্পের উপর ভিত্তি করে ২০০৩ সালে 'হাসিনা' নামের একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।

সৈয়দ হিলাল সাইফ'র
একগুচ্ছ মজার ছড়া

প্রশ্ন এবং উত্তর

বলতে পারেন কোন সে কাজে
আপনার-আমার হয় না খরচা?
পরচর্চা,পরচর্চা!

বলতে পারেন কোন খাবারে
সব'চে বেশি আরাম মেলে?
হারাম খেলে, হারাম খেলে।

বলতে পারেন গলদ জেনেও
কোন কথাটা আমরা কহি?
আমি সহি, আমি সহি!
বলতে পারেন শুরু থেকে
চলতে আছে কোন সে যন্ত্র?
ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র!

বলতে পারেন এই সমাজে
সুখী খোকা না খুকিরা?
দুইমুখীরা, দুইমুখীরা!

কোন সে জিনিস একজন পেলে
পরিবারের সবার তুষ্টি?
ভিটামিন-টি বকশিশ ঘুষ'টি!

বলতে পারেন কোন সে কাজটা
করা যায় না দেখাদেখি?
লেখালেখি, লেখালেখি

বলতে পারেন রাজ্য লুটে
কোথায় গেছে ছুটে তারা?
বেগমপাড়া, বেগমপাড়া।

প্রশ্ন এবং উত্তর

আচ্ছা দেখি! কারা কারা
সাহস নিয়ে হাত তুলেন
বউয়ের করা বাজার লিস্টি
কিনতে গিয়ে প্রায় ভুলেন।

আচ্ছা দেখি! কারা কারা
মিথ্যা কথা বলেন না
বউয়ের চোখে চোখ রেখে কন
বউয়ের কথায় চলেন না!

আচ্ছা বলেন, কার কার বউ
স্বামীর কথায় কাজে রাজি
এইখানে ধুর! বিশ্বেও নাই
বিশ্বাস হয় না! ধরেন বাজি।

আচ্ছা বলেন, এমন বউ কার
স্বামীর কোনো দোষ খোঁজে না
এসব প্রশ্ন বেআক্কেলের...
বউ কারে কয় যে বোঝে না।

আচ্ছা দেখি কোন সাহসী
শেষ অবধি হাত তুলেন
পান থেকে চুন খসলে যার বউ
দু'দিন ধরে গাল ফুলান।

প্রশ্ন এবং উত্তর

বলেন দেখি, কোন স্বামীদের
বউরা থাকে সব'চে হ্যাপি ?
যে স্বামী পালটায়–বাচ্চার ন্যাপি।
বলেন দেখি এসব শুনে
কোন স্বামীদের আসে কান্না?
যেই স্বামী করেন–ঘরে রান্না!

বলেন দেখি, কোন স্বামীরা
বউদের কাছে সব'চে ভালা
যেই স্বামী মারছে–মুখে তালা।

বলেন দেখি, কোন সে স্ত্রী
পঞ্চমুখ হয় স্বামীর গুণে!
যে স্বামী কানে–কম শুনে।

বলতে পারেন, চ্যাঁচামেচি
নিত্য করেন কোন সে বধূ
যে জন্মের পরে–খায়নি মধু।

বলতে পারেন, কোন পুরুষের
জীবন কাটে বড়ই দুঃখে
যে তর্ক করে–বউয়ের মুখে।

বলতে পারেন, কোন দম্পতির
জীবন কাটে ভীষণ সুখে
গল্প উপন্যাসের বুকে।

স্বামী-স্ত্রী

স্ত্রী :
তোমার সাথে থেকে থেকে
এক জীবনে কী আর পেলাম

আমার মতো মেয়ে বলেই...
তোমার সংসার করে গেলাম।

স্বামী :
তোমার মতো মেয়ে বলেই
আমার সংসার করে গেলে
ভাবছি আমি কোন কারণে
যাওনি তুমি আমায় ফেলে।

স্ত্রী :
খুঁতখুঁতে এই স্বভাব তোমার
সব কিছুতেই কারণ খোঁজো
আমার সকল কথায় দেখি
তুমি অন্য অর্থ বোঝো।

স্বামী :
তোমার জানি কোনো দোষ নাই
আমি নন্দঘোষের দোষ
জানি আমার লক্ষ্মী বউ গো
তবু তুমি থাকো খোশ।

স্ত্রী :
উঁচ্চ বংশের মেয়ে আমি
খান্দানি জাতপাত
উলটাপালটা কথা কইলে
রাঁধব না আর ভাত।

স্বামী :
আমি যদি প্রেসিডেন্ট হই
তুমি ফার্স্টলেডিও
আমি তোমার ভক্ত শ্রোতা
তুমি ভাঙা রেডিও!

গল্প

অতল জলের অগ্নি

আতাউর রহমান মিলাদ

তাঁকে প্রায়ই দেখি। পরনে সাদামাটা আটপৌরে সুতি শাড়ি। মুখের দিকে তাকালে বুঝা যায় প্রসাধনীর আলগা কোনো প্রলেপ নেই, জৌলুসহীন। বয়স ভাটির দিকে, পৌঢ়ত্বের ছাপ স্পষ্ট। ঠিকমত বয়স ঠাহর করা কঠিন। অনুমানে ধরে নিতে পারি সত্তর বা এর আশেপাশে হবে।

আমার দোকানের সামনে দিয়ে মাঝে মধ্যে যাতায়াত করেন। সপ্তাহে দু'একদিন হবে। আমার দোকান মানে মফস্বল শহরের ছোটো গলির মোড়ে ঔষধের দোকান। অর্থাৎ ফার্মেসি। ব্যবসার চেয়ে মূলত সময় কাটানোই মুখ্য। বাবা এই ব্যবসায় ছিলেন তাই পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত। বাবা চলে যাবার পড়ালেখা শেষ করে নিজেকে হাল ধরতে হয়, যা হয় চলে যায় দিন। তাছাড়া উপার্জনের অন্যান্য পথ খোলা থাকায় উপার্জন নিয়ে খুব একটা ভাবতে হয় না।

আমার দোকানের ঠিক বিপরীতে একটি অভিজাত ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর। শহরের বাইরেও এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম আছে। বেশ বড়ো, মোটামুটি নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসই পাওয়া যায়। গাড়ির ভিড়ের সাথে ক্রেতাদের আনাগোনা লেগেই থাকে। শহরের বিত্তশালী মানুষের ভরসার জায়গা। মান ভালো, দামও। সেই ষ্টোরের সামনে কিছু ভিখারি সবসময় থাকে, ভালো আয় হয় বলে হয়তো। সেখানে ভিড়ের বাইরে এক কোণে তাঁকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি এবং সময় সুযোগ বুঝে বাড়িয়ে দেন হাত। কেউ টাকা দেয় কেউ দেয় না। অন্য ভিখারির মতো তাঁর তাড়াহুড়ো নেই, নেই ক্রেতাদের গাড়ির পেছনে দৌড়ে যাবার তাড়া। বরং লজ্জা ও অনুচ্চারিত ভয়ে তাঁকে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি।

সেদিন মধ্যাহ্নের সূর্য তখন মাথা কাত করে আছে, প্রচণ্ড গরমের দিন। এ সময়ে মানুষজন খুব কমই থাকে। একটু পূর্বে লাঞ্চ সেরে কাউন্টারের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছি অর্ধনিমিত চোখে। মাথার উপর সর্বোচ্চ শক্তিতে চলছে ফ্যান, আয়েশে কখন যে চোখ বন্ধ হয়ে গেছে টের পাইনি। এমন সময় মহিলার ক্ষীণ কণ্ঠ শুনে তন্দ্রা

ভেঙে সোজা হয়ে বসি। দেখি সেই ভিখারি মহিলা সামনে দাঁড়িয়ে। টেবিলের উপর রাখা আজকের দৈনিকের দিকে আঙুল ইশারা করে বিনয়ের সাথে পড়তে চাইছেন। অবাক হলাম, এই প্রথম কোনো ভিখারির দেখা পেলাম যে টাকা পয়সার বদলে পত্রিকা পড়তে চাইছে। কোনো কিছু না ভেবেই আগ্রহ নিয়ে কাগজ এগিয়ে দিলাম। সকালেই কাগজ পড়ে শেষ করেছি। তিনি ক্রেতাহীন দোকানের এককোণে মেঝেতে বসে পত্রিকা মেলে ধরলেন চোখের সামনে। একজন বয়স্ক মহিলার মেঝেতে বসা দৃষ্টিকটু মনে হলে আমি সামনে রাখা একটা টুল এগিয়ে দিয়ে বললাম–

এখানে পড়তে পারেন।

প্রথমে অপারগতা দেখালেও বারবার অনুরোধে রাজি হলেন।

এরপর তিনি মাঝেমাঝে আমার এখানে আসেন। কোনো ক্রেতা থাকলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন, ভেতরে আসেন না।

তাঁকে দেখে কেন জানি মায়া জন্মে গেল, শ্রদ্ধাও। প্রতিদিন কত ভিখারি আসে, এই মহিলা আর দশটা ভিখারির চেয়ে ব্যতিক্রম। মার্জিত ব্যবহার, শালীনতাবোধ, কথা বলার ভঙ্গি স্বতন্ত্র। হয়তো প্রতিকূল পরিস্থিতি তাঁকে এ পথ ঠেলে দিয়েছে। কোনো কারণে না এলে মনে মনে অপেক্ষা করি। কেন করি, জানি না। যখনই আসেন হাত বাড়িয়ে পত্রিকা নিজেই এগিয়ে দেই। মৃদু হাসি দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানান। একদিন তাঁর জন্য চা অর্ডার করতে গেলে কোনোভাবেই রাজি হননি। তাঁর সাফ জবাব,

এমনিতেই পত্রিকা পড়তে এসে বিরক্ত করি, লজ্জাই লাগে। এর চেয়ে বেশি হলে ঋণ ভারী হয়ে যাবে, বাবা। শোধ করার সামর্থ্য আমার নেই। কথা বাড়াই না।

তাঁকে নিয়ে আগ্রহের মেঘ ঘন হতে লাগল। কী তাঁর পরিচয়? ইতিপূর্বে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। জানার অদম্য আগ্রহ ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করে। তাঁর জীবনের নানা পরতে প্রবেশের জন্য পথ খুঁজি। দু'চারজনকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, কেউ তেমন কিছু জানে না। জানার চেষ্টা করেছি বেশিদূর পৌঁছাতে পারিনি, তাঁর অনিহায়। নিজের সম্পর্কে কিছু প্রকাশ করতে চান না, গুটিয়ে রাখেন। শুধু কোনোক্রমে নাম উদ্ধার করেছি–নাদিরা ইসলাম।

বেশ কিছুদিন এখানে আসার কারণে তাঁর সাথে একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততায় একে অপরের কাছাকাছি এসে গেছি। যতটুকু জেনেছি শহরের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির পরিত্যক্ত ঘরে থাকেন, যা পূর্বে ষ্টোর রুম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেটাকে ঘষামাজা করে থাকার জায়গা করা হয়েছে। বাসায় কাজকর্মে সহযোগিতার বিনিময়ে এ বন্দোবস্ত। তাঁর মতে খুব ভালো আছেন। শরীর আর ধকল নিতে চায় না, শান্তিতে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চান এখানে। ইতিপূর্বে অনেক জায়গায় ঘুরে তিনি ক্লান্ত।

সেদিন ছিল রোববার। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে সারা শহর ভিজে একাকার। এক হাঁটুজল রাস্তার উপর। সেই যে দুপুর থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে থামার নাম নেই। শহরে মানুষের আনাগোনা নেই বললেই চলে। বৃষ্টির দাপট থেকে রক্ষা পেতে অনেকেই দোকানের শাটার অর্ধেক নামিয়ে রেখেছে ইতিমধ্যে। কবি হলে দু'চারখান কবিতা নামিয়ে ফেলা যেত কিন্তু এসব পথে যাবার সাহস কোনোদিন ছিল না, এখনো নেই। এই অবসরে বন্ধু সুমনের কথা মনে পড়ল, যোগাযোগ নেই অনেকদিন। ভাবলাম এরকম বৃষ্টিভেজা দিনে ওকে একটা চিঠি লেখা যায়। আজকাল চিঠি লেখার অভ্যেস আগের মতো নেই, লেখা হয় না। কাউন্টার হাতড়ে একটা লেখার প্যাড ও কলম হাতে নিলাম। টেবিলে বসে অর্ধেক চিঠি লেখা শেষ এমন সময় কাকভেজা হয়ে নাদিরা ইসলাম হাজির। বলে রাখি আমি ততদিনে তাঁকে খালা সম্বোধন শুরু করেছি। বৃষ্টিতে ভিজে গায়ের কাপড় শরীরের সাথে লেপটে আছে। মাথার চুল থেকে জল ঝরছে অনবরত। এই রকম দিনে তাঁকে দেখে আমি অবাক।

আপনি এই ঝড় তুফানের মাঝে বেরুতে গেলেন কেন?

অনেকটা ধমকের সুরেই প্রশ্ন করলাম। তাঁর এ অবস্থা দেখে সত্যি খুব খারাপই লাগছে!

পেট কি তালা মেরে রাখা যায়, বাবা! পেটের দায়ে জীবন ছেড়ে দিয়েছি হাটে। যে তুফানে জীবন তছনছ, স্বপ্ন ভেঙেছে, তার চেয়ে এ তুফান অনেক ছোটো।

কথাগুলো বলেই হাত দিয়ে মুখের পানি মুছতে মুছতে বসে পড়লেন নির্ধারিত আসনে। বাথরুম থেকে নিজের ব্যবহার করা টাওয়েল এগিয়ে দিলাম শরীর মুছার জন্য।

আজ তাঁকে একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। বৃষ্টির সহজ ছন্দ হয়তো তাঁর মনকেও দোলা দিচ্ছে। ভাবলাম, তাঁকে বাজিয়ে দেখার এটা মোক্ষম সুযোগ, জানি না সফল হব কি না। তবে চেষ্টা করতে অসুবিধা নেই। অনেকদিন থেকে মনের ভেতর তাঁকে জানার আগ্রহ জমাট বেঁধে আছে।

এমন দিনে চা কফি হলে জমে ভালো, সমস্যা হচ্ছে বাইরে থেকে চা নিয়ে আসার বা আনানোর সুযোগ নেই। হাতের কাছে কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে লাগলাম। চোখে পড়ল কাউন্টারের নিচে রাখা চানাচুরের প্যাকেট ও বিস্কুটের প্যাকেট। এগুলোর প্যাকেট খুলে একটা প্লেটে ঢেলে নিয়ে তাঁকে খেতে বললাম। মাথা দিয়ে অসম্মতি জানালেন।

দেখুন, বাইরে বৃষ্টি, বেরুবার সুযোগ নেই। তারচেয়ে আসুন একসাথে বসে গল্প করে সময় কাটাই।

এবার টুল টেনে সামনে এলেন। দুজন অনেকটা মুখোমুখি, কাউন্টারের ভেতরে বাইরে। সাধারণত একটু দুরে বসেন। এদিকে ভেতরে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, কীভাবে যে শুরু করি!

তাঁর সামনে চানাচুর দিয়ে কথা শুরু করি।

অনেকদিন থেকে আপনাকে চিনি অথচ আপনার সম্পর্কে কিছুই জানি না।

এক ভিখারির জীবনে কী আর থাকে।

উত্তর শেষে আনমনা হয়ে বাইরে বৃষ্টি পড়ার দিকে চেয়ে রইলেন। আমি নাছোড়বান্দা, আরেকটু এগোই।

একজন মানুষের জীবনের ইতিহাস জানতে চাই, অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

তিনি আগের মতোই ভাবলেশহীন। মনে মনে হয়তো বিগত দিনের টুকরো টুকরো চিত্র জোড়া দেবার চেষ্টা করছেন। এবার নড়েচড়ে বসলেন।

সে অনেক কাহিনি বাবা, মনে করতে চাই না সহজে। কষ্ট আর অবহেলার। এসব শুনাতে ভালো লাগে না।

আমার জেদ বাড়ে। জোর গলায় দাবি রেখেই বলি :

আমার যে শুনতে খুব ইচ্ছে করছে।

মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারছি ভেতরের বরফ গলতে শুরু হয়েছে এবার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুরু করলেন তিনি।

সনটা ঊনসত্তর। তারিখ ঠিক মনে নেই। সবেমাত্র শিক্ষক হিসেবে প্রাথমিক স্কুলে জয়েন করেছি। জামাল হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করছে বছরখানেক। আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসতাম। একই শহরে বাস, দেখা হতো প্রায়ই।

বাইরে চোখ ফেলে চেয়ে রইলেন। হয়তো স্মৃতির প্রজাপতি পাখা মেলে উড়ছে। গলা খাকারি দিয়ে ফিরলেন বাস্তবের উঠোনে। বললাম,

তারপর?

একদিন যুগল বন্ধনে আবদ্ধ হলাম আমরা। দিনগুলি ভালোই চলছিল, দুজন কাজ করতাম আর অবসরে নিজেদের মতো ঘুরে বেড়াতাম। এলো সত্তরের গণজোয়ার। জামাল জড়িয়ে গেল রাজনীতির জালে। পালটে গেল জীবনধারা। এলো একাত্তর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে স্বাধীনতার অঙ্গীকারে জামাল যোগ দিলো মুক্তিবাহিনীতে। জন্মভূমির মুক্তির জন্য বসে না থেকে আমিও যোগ দিলাম জামালের দলে। ট্রেনিং শেষে হাতে তুলে নিলাম হাতিয়ার। কী দুর্বিসহ সময় দিন আমাদের! শত ঝড় জঞ্ঝায় ভেঙে পড়িনি, মনোবল অটুট। লক্ষ্য একটাই মুক্তি।

এতক্ষণ কথা বলায় হাঁপিয়ে উঠেছেন, এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিলাম। গোগ্রাসে চালান করে দিলেন সবটুকু। এবার আবার শুরু হলো জীবন গল্প।

স্বাধীনতা পেলাম ঠিকই, বিনিময়ে হারাতে হলো জামালকে।

কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখ মুছলেন, হয়তো মুছে নিলেন গোপনাশ্রু।

কৌতূহল বেড়ে দ্বিগুণ। পরের ধাপে প্রবেশ করতে চাইছি।

কেন, কী হয়েছিল তাঁর?

আমরা তখন শমসের নগর অপারেশন শেষ করে বিরতি নিচ্ছি। অপেক্ষা করছি পরবর্তী নির্দেশের। জামাল ঠিক করল এই ফাঁকে তার মাকে দেখে আসবে গোপনে। কে জানত এ যাওয়াই শেষ যাওয়া হবে। জামালের গ্রামে যাবার খবর পেয়ে যায় কুখ্যাত রাজাকার সবুর চৌধুরী। সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে জামালের উপর। পাকবাহিনীর সদস্যরা তাকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে। সে খবর আমরা পাই ৪ দিন পর। দুঃখের পরিবর্তে জামাল হত্যার প্রতিশোধ সাহসী করে তুলে। আগুন বুকে গর্জে উঠি যুদ্ধের ময়দানে। একসময় যুদ্ধ শেষে ফিরে এলাম বাড়ি, বিজয়ের আনন্দ আর জামাল হারানোর বেদনা নিয়ে।

তাঁর চোখ বেয়ে আনন্দ বেদনার অশ্রু ঝরে পড়ছে, অজান্তে নিজের চোখও কখন ভিজে গেছে টের পাইনি।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টির শাঁ শাঁ শব্দ, দোকানের ভেতরে গুমোট পরিবেশ, নীরব হয়ে মুখোমুখি বসে আছি দুজন। কোনো কথা নেই, পাঠ করছি নীরবতার ভাষা। অনেকক্ষণ এভাবে বসে থাকার পর কথার ধারাবাহিকতা রক্ষায় মুখ খুলতে হলো। অবশ্য জানার আগ্রহ ভেতরে দানা বেঁধে উঠেছে।

তারপর কী হলো?

আমার প্রশ্নে সংবিত ফিরে পেলে তিনি মুখ খুলে আবার বলতে শুরু করলেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর ফিরে গেলাম পুরোনো পেশা, শিক্ষকতায়। সমস্ত অতীত আড়াল করে নতুন স্বপ্ন বুকে নিজেকে বিলিয়ে দিলাম ছাত্রছাত্রীদের মাঝে। ভালোই কাটছিল সময়।

বিয়ে শাদি কি করেছিলেন তখন?

মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেল।

নাহ। অনেকেই বিয়ে করে সংসারী হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, মা বাবাও এ ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। রাজি হইনি। আমার জীবনে অন্যকে জড়িয়ে জামালের ভালোবাসাকে খাটো করতে চাইনি।

তারপর?

পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে জীবনের আসমানেও নেমে এলো অন্ধকার। দিনে দিনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল একাত্তরে পরাজিত শত্রুরা। গ্রামের কুখ্যাত রাজাকার সবুর চৌধুরী এতদিন আড়ালে থাকলেও এবার নেমে এলো সামনে। রাজাকার অভিবাসনের পর থেকে সবুরের হাত লম্বা হতে থাকে। চলে আসে সমাজের প্রথম কাতারে। প্রথমেই চোখ পড়ে আমার উপর। প্রস্তাব দেয় বিয়ের। একদিন ওর মুখে একদলা থুথু ছেড়ে জবাব দিয়েছিলাম চরম ঘৃণায়।

সবুর চৌধুরী কি এরপরে আপনার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল?

সরাসরি দাঁড়ায়নি তবে আমার চরিত্র নিয়ে নানা কুৎসা ছড়াতে থাকল। চুপ করে গেলাম, কিন্তু সে ক্ষান্ত হলো না। নানা চক্রান্তের জাল বুনতে লাগল। একদিন প্রকাশ্য রাস্তায় শ্লীলতা হানির চেষ্টা চালালো। ভয় পেয়ে গেলাম। প্রতিকারের জন্য এলাকার অনেকের দরজায় ঘুরলাম, এগিয়ে এলো না কেউ। এই প্রথম অনুভব করলাম আমার কোনো স্বাধীনতা নেই। জননী জন্মভূমি আমার মতো অসহায়। রাতের আঁধারে একদিন বেরিয়ে গেলাম গ্রাম ছেড়ে। এলাম শহরে। সবখানে এক অবস্থা। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিনিয়ত অভিনয় করে গেলাম, আজো করে যাচ্ছি। ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ের নাদিরা ইসলাম হয়ে গেলাম জরিনা, ভুলে গেলাম আমি শহিদ মুক্তিযোদ্ধা জামাল হাসানের স্ত্রী। নতুন পরিচয়ে নতুন নামে নতুন জীবন শুরু করলাম। ভুলে গেলাম অতীত।

মনটা বিষণ্নতার ছায়ায় ঢেকে গেল। ঘটনাবহুল জীবনের বিচিত্র কাহিনি চোখের সামনে এক এক করে ধারাবাহিকভাবে ভেসে উঠল। সেই সাথে নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো এবং অপরাধীও। কথা বলার মতো মনের অবস্থা নেই আর। নীরব হয়ে বসে রইলাম। বাইরে তাকাতেই দেখি বৃষ্টি থেমে গেছে। নাদিরা ইসলাম ওরফে জরিনা তাঁর হাতের ব্যাগ কাঁধে ফেলে আলগোছে বেরিয়ে গেলেন। আমি বাধা দিলাম না। জীবন যাকে ফেরারি করেছে আমি তাঁকে থামাই কী করে! আসলে ঘোরাচ্ছন্ন সময় ভেদ করে বেরুবার পথ খুঁজে পাইনি। পথের দিকে অপলক চেয়ে শুধু তাঁর চলে যাওয়া দেখলাম। চেয়ার ছেড়ে কখন যে হাত তুলে স্যালুটের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেছি টের পাইনি।

এর পর তাঁর সাথে বেশ কিছুদিন দেখা নেই, মনে মনে প্রতিদিন অপেক্ষা করি। আজ কাল-এভাবে প্রায় তিন সপ্তাহ পার হয়ে যায়। দেখা মিলে না। একটা অমূলক আশঙ্কা জায়গা করে নেয় মনে। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থেকে তাঁর প্রতি আলাদা একটা টান অনুভব করি। তাঁর অনুপস্থিতি ক্রমশ অস্থির করে তুলে।

সময় করে তাঁকে খুঁজতে বের হই একদিন। রিকশা করে যেখানে থাকেন সেখানে খোঁজ নিতে যাই। বাসার গেটের বাইরে দারোয়ানকে পেয়েও যাই, গেটের দুইপাশে টবে রাখা ফুলের গাছে পানি ঢালছে। তেমন খুঁজতে হয় না। আমাকে দেখেই বলে,

কিছু বলবেন?

হ্যাঁ, জরিনা খালার খুঁজে এসেছি। তিনি কি বাসায় আছেন?

'কোন জরিনা?' বলে নিজেই ভাবতে লাগল। আমি আরেকটু সহজ করার জন্য বলি, এই যে যিনি ভিক্ষা করেন এবং বাসার কাজেও সাহায্য করেন, সেই জরিনা খালা, চিনতে পারছেন?

ও, সেই কথা। উনিতো দু সপ্তাহ পূর্বে এখান থেকে চলে গেছেন। বললেন নিজের বাড়িতে চলে যাবেন।

উনার বাড়ির ঠিকানা জানেন?

না।

এখানে কি ফিরে আসবেন আবার? কিছু কি বলে গেছেন?

না। তিনি সবকিছু নিয়ে একেবারেই চলে গেছেন।

আর কথা বাড়াই না। বুঝতে পারি তাঁর পরিচয় উন্মোচনের পর হয়তো নিরাপত্তার কথা ভেবে এ শহর ছেড়ে চলে গেছেন। কষ্টটা বেড়ে গেল, স্ত্রীর সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমাদের বাসায় নিয়ে যাব। তা আর সম্ভব হলো না।

বিষণ্ন মনে ফিরে আসি বাসায়। একা দেখে স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন,

কী ব্যাপার, জরিনা খালা কই?

উত্তর দিতে ইচ্ছে করে না। তবুও সব কথা খুলে বলি তাকে। সেও মন খারাপ করে। কী করে বুঝাই তাকে, জীবন যাকে ফেরারি করেছে, তাঁকে ধরে রাখার সাধ্য কার!

ভুল বালুচরে

কামাল কাদের

আজিম এবং প্রকাশ দুই বন্ধু। গলায় গলায় ভাব। বন্ধুত্বটা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে, ছোটোবেলা থেকে নয়। সাধারণত ছোটোবেলায় যে বন্ধুত্বটা হয়, সেটা সত্যিকার অর্থে নিঃস্বার্থ এবং বিশ্বস্ত হয়, অনেক কাল পর্যন্ত তা অটুট থাকে। সেখানে স্বার্থের চাহিদা কম থাকে তাই একে অপরের সুখ দুঃখ ভাগ করে জীবন কাটিয়ে দেয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে অর্থাৎ পরিণত বয়সে মানুষ তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং স্বার্থকে বিবেচনা করে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বন্ধুর জন্য যদি কোনো কিছু করার প্রয়োজন মনে হয় তাহলে নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তা করা হয় না। উপরন্তু অনেকে আবার সময়-ক্ষণ বুঝে বিপদ আপদে সাহায্যের বদলে সরে পড়তে লজ্জিত বা কুণ্ঠিতবোধ করে না। তার মানে বয়স কালে যে বন্ধুত্ব হয় সেটা ছোটোবেলার বন্ধুত্বের মতো অত গভীরতা পায় না। অবশ্য এর ব্যতিক্রম রয়েছে, আজিম এবং প্রকাশের বন্ধুত্ব এর প্রমাণ। তাদের মাঝে যে বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়েছে তা রীতিমতো ঈর্ষা করার মতো।

বন্ধুত্বের শুরুটা নাটকীয়ভাবে হয়েছিল। যে মুহূর্তে ঢাকা থেকে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটি লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে পৌঁছালো, ঠিক সেই সময়ে এয়ারপোর্টের 'ইনফরমেশন টেকনোলজির' (IT) যন্ত্রপাতি অকেজো হবার কারণে ভ্রমণক্লান্ত যাত্রীদের মধ্যে বিমানের ভিতর বিশৃঙ্খলা শুরু হলো। বিমানের ভিতর কয়েক ঘণ্টা অসহায় অবস্থায় থাকাকালীন তাদের দুজনার মধ্যে পরিচয়ের সূত্রপাত। পরিচয় সূত্রে তারা জানতে পারল উভয়ে লন্ডন ইউনিভার্সিটির 'কুইন মেরি' কলেজে ছাত্র হিসেবে যোগদান করার জন্য লন্ডনে এসেছে। আজিমের সাবজেক্ট 'একাউন্টেন্সি' আর প্রকাশের সাবজেক্ট 'ল'। এভাবেই প্রাথমিক পরিচয়পর্ব সাঙ্গ হলো। প্রকাশ তার দিদির বাসায় এবং আজিম কলেজে থেকে পাঠানো এক প্রতিনিধির সাথে কলেজে হোস্টেলে চলে গেল। আজিম ঢাকা থেকেই কলেজের হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

প্রকাশের দিদি পূর্ব লন্ডনের এক মিউনিসিপ্যাল অফিসে 'সোশ্যাল ওয়ার্কার' আর জামাইবাবু একজন ডাক্তার। সে বোনের বাসা থেকে ক্লাস করে। কলেজে দুজনের সখ্য ক্রমে বেড়ে চলল, ফলে প্রকাশের দিদি আজিমকেও নিজের ভাই হিসেবে সমাদর করে গ্রহণ করল এটা ভেবে নিজের দেশের ছেলে বিদেশে বিভুঁয়ে একা আছে। তাছাড়া আজিমের ব্যবহার এবং আদব-কায়দা অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত।

সময়ের সাথে ওদের দুজনের একের প্রতি অপরের সম্ভাষণ 'আপনি' থেকে 'তুমি' তে দাঁড়ালো। সময় গড়িয়ে এক বছর পার হলো। কলেজ হোস্টেলের চুক্তি অনুসারে নবাগত ছাত্রদের জন্য কলেজের রুম খালি করে দিতে হয়। আজিমের বেলায়ও তা হলো। তাই বলে তাকে 'হোমলেস' হতে হয়নি। আজিমকে কলেজের কর্তৃপক্ষ অন্যান্য ছাত্রের মতো কলেজের আশেপাশের পরিবারের সাথে 'পেয়িং গেস্ট' হিসেবে থাকার ব্যবস্থা করে দিলো। আজিম যে পরিবারের সাথে থাকা শুরু করল, তারা মূলত 'গ্রিক-সিপ্রিয়ট'। তাদের একটা গ্রোসারির দোকান আছে। ওই গ্রোসারি দোকানের আয়ে নিজেদের সংসার চালিয়ে নিচ্ছে। তাদের একটিমাত্র 'টিন-এইজ' সন্তান। নাম তার সিলভিয়া পাপাডোপোলাস। দেখতে খুবই সুন্দরী, যেমন চেহারা তেমনই সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী।

এমনই করে আরও বছর দুই পার হয়ে গেল। প্রকাশ 'ল' পাশ করে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ভর্তি হলো। আজিম 'একাউন্টেন্সি' পাশ করে মোটা বেতনে লন্ডনের একটা মার্কিন মার্চেন্ট ব্যাংকে চাকরি নিলো। এদিকে মন্থর গতিতে নিজেদের অজান্তে আজিম এবং সিলভিয়ার মধ্যে একে অপরের প্রতি ভালোলাগার আবেগ থেকে তা ভালোবাসায় রূপ নিলো। আজিম এ বিষয় নিয়ে প্রকাশের সাথে আলাপ করল এবং এও জানালো সে সিলভিয়াকে বিয়ে করতে চায়। ব্যাপারটি শুনে প্রকাশ বাকহারা। কী যে বলবে, কিছুই মাথার মধ্যে আসছিল না। শুধু বলল, 'বন্ধু, তুমি মুসলিম আর সিলভি হলো কট্টর রোমান ক্যাথলিক। তোমার মা বাবা কী ভাববে, এ ব্যাপারে কিছু বিবেচনা করেছ?'

আমরা একে অপরকে মনেপ্রাণে ভালোবাসি, এটাই কি যথেষ্ট নয়! আজিম তার অভিমত ব্যক্ত করল।

শোন আজিম, মানুষের জীবনে ধর্মটা একটা বিরাট সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার। জীবনের চলার পথে একটা বিশ্বাস নিয়ে আগাতে হয়। কোন ধর্ম খারাপ বা ভালো সেটা বিবেচনার বিষয় নয়। যার যার ধর্ম তার তার কাছে। সব ধর্মের একই বিধান, 'সদা সত্য কথা বলিবে, একে অপরের সাথে অযথা বা অকারণে বৈরীভাব রাখবে না, সবাইকে সম্মান করতে হবে, সে যে কোনো ধর্মের লোক হউক না কেন। আরও অনেক মৌলিক গুণ যা সব ধর্মেই সমানভাবে প্রচলিত রয়েছে। তাছাড়া ভালোবাসা ক্ষণিকের মোহ হতে পারে, যে কোনো সময়ে কর্পূরের মতো উধাও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বিয়েটা সারাজীবনের বন্ধন, সেটা হেলাফেলা করো না। দুজনের বিবাহ বন্ধন ততই অটুট থাকার সম্ভবনা থাকে যত বেশি নিজেদের মধ্যে কমনগ্রাউন্ড থাকে।

এখানে ধর্মকে টেনে আনা আমি সমীচীন মনে করি না। পৃথিবী অনেক বদলেছে, আধুনিক যুগে অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তাই ধর্মকে ভালোবাসার মাঝে টেনে হেচঁড়ানোটাকে আমি হীন মনের পরিচয় মনে করি।

ঠিক আছে, মানলাম। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা তো তোমাকে ভাবতে হবে। ওরা কোন ধর্ম নিয়ে বাঁচবে? কোন বিশ্বাস নিয়ে ওরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ধর্মাচরণের পদ্ধতি নিয়ে জীবন অতিবাহিত করবে?

ওদের কৃতকর্মের জন্য তোমরা দায়ী থাকবে। কারণ বন্ধুত্ব, ভালোবাসা এক প্রকার এবং সারাজীবন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থেকে ছেলেমেয়েদের মানুষ করা অন্য প্রকার।

ভবিষ্যতের কথা কি আর চিন্তা করব, যখন আসবে তখন দেখা যাবে।

প্রকাশের আর কিছুই বলার রইল না। দিদির এবং জামাইবাবুরও একই অভিমত, কোথায় যেন আজিম ভুল করছে। সচরাচর যা হয়ে থাকে, প্রেমে পড়লে মানুষ কে কার কথা শুনে!

আজিম যখন সিলভিকে বিয়ে করার প্রস্তাব সিলভির মা বাবার কাছে পেশ করল, তখন তাদের কাছে মনে হলো, তারা যেন হাতে চাঁদ পেল। যেখানে তাদের হবু জামাতা একজন শিক্ষিত পেশাজীবী একাউন্ট্যান্ট সেখানে তারা প্রায় অর্ধ শিক্ষিত গ্রোসারি দোকানের মালিক। এর চেয়ে আনন্দ আর সুখের বিষয় কী হতে পারে?

খুব ধুমধাম করে আজিম এবং সিলভিয়ার বিয়ে হলো, এক্কেবারে বাংলাদেশের রীতি অনুযায়ী। দেশ থেকে আজিমের মা-বাবা যোগ দিলেন, যদিও এই বিয়েতে তাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তবুও ছেলের খুশিতে উনারাও খুশি। হল ঘরটি এত সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল যেন সেখানে আনন্দ মেলা হচ্ছে। এই আয়োজনের সব কৃতিত্ব ছিল প্রকাশের নিঃস্বার্থ অবদান। বিয়ের অনুষ্ঠানে শাড়িতে কনেকে বেশ সুন্দর লাগছিল। মনে হচ্ছিল বিউটি কন্টেস্টে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছে। বিয়েটা নিশ্চয় দুজনের জীবনে এক স্মরণীয় দিন, যার মাঝে লুকিয়ে আছে অনাবিল আনন্দ এবং প্রশান্তি।

অতিথিদের মধ্যে সবাই তাদের সুখী জীবন কামনা করে সেদিনকার মতো বিদায় নিলেন।

আজিম এবং সিলভিয়ার বিবাহিত জীবন আর পাঁচটা সংসারের মতো চলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রকাশ ব্যারিস্টারি পাস করে বাংলাদেশে ফিরে গেছে, উদ্দেশ্য দেশে প্রাকটিস করবে আর এদিকে আজিমরা এক কন্যা সন্তানের বাবা-মা হয়েছে। মেয়ের নাম রেখেছে 'কেয়া'। কেয়াও মা'র মতো সুন্দরী হয়েছে।

কেয়ার যখন আড়াই বছর বয়স তখন কেয়াকে নিয়ে বাংলাদেশ থেকে ঘুরে এসেছে। সিলভির বাংলাদেশ ভালো লেগেছে, বিশেষ করে আজিমের আত্মীয়দের অতিথিপরায়ণতায়। বাঙালি খাবার-দাবারও তার কাছে সুস্বাদু লেগেছে। ইলিশ মাছের কাঁটা নিজের হাত দিয়ে বেছে তবে খেয়েছে, কারোর সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি। সময়ের সাথে সাথে তাদের সংসার সুখে শান্তিতে চলে যাচ্ছিল। কেয়ার বয়স যখন প্রায় এগারো বছর তখন তাদের সংসারে প্রথম 'ঝড়' শুরু হলো। হালকাভাবে চিন্তা করলে ঝড়টা নিতান্তই স্বাভাবিক গোছের। একদিন রোববার

সকালবেলায় আজিম জিম থেকে বাসায় ফিরে এসে দেখল কেয়া বাসায় নেই। সিলভিকে জিজ্ঞাসা করে সে জানতে পারল কেয়া 'সানডে স্কুলে' গেছে।

সানডে স্কুলটা আবার কি?

সানডে স্কুলটা হলো যেখানে ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া হয়।

ভালো কথা, সেখানে কি কি শেখানো হয়?

সেখানে বাইবেল পড়ানো হয় এবং যীশু খ্রিস্টের সমন্ধে নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মেয়ে বড়ো হচ্ছে, তাই আমাদের খৃস্টান ধর্ম সমন্ধে সবিস্তারে তার জানা দরকার।

তাহলে তাকে তো মসজিদে পাঠানো দরকার। সেখানে সে কুরআন শরিফ এবং নামাজটা শিখে ফেলতে পারে।

তা হয় না।

কারণ?

আমি কেয়াকে আমার ক্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষা দিতে চাই, অন্য কোনো ধর্ম, বিশেষ করে জঙ্গি ইসলাম ধর্মে লিপ্ত হতে দিতে চাই না।

সেটা তো তোমাকে আমাদের বিয়ে করার আগে থেকেই চিন্তা করা উচিত ছিল। এখন ওসব বিষয় বাদ দাও। ধর্ম-টর্ম নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের এখন সাজে না। বর্তমান জীবন যেমন চলছে তেমন করে চালিয়ে নাও।

তোমার এসব কথা আমি মানি না। আমি ক্যাথলিক, তাই আমার মেয়েকে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা দিয়ে গড়ে তুলব।

সিলভির কথাগুলি শুনে প্রকাশের সেই ভবিষ্যৎ বাণীর কথা মনে পরে গেল, 'নিজেদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করো আজিম।'

এই সাধারণ (?) ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সংসারজীবনে চিড় ধরতে শুরু করল। ক্রমে বড়ো আকারে তাদের দাম্পত্য জীবন সংকট কাল হয়ে দাঁড়ালো। প্রকাশের দিদির পরামর্শে তারা এক বিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী কাউন্সিলার-এর কাছে গেল। কাউন্সিলার মনোযোগের সাথে দুজনের কথা শুনলেন। কিন্তু তিনি কারো কোনো দোষ খুঁজে পেলেন না। দুজনে দুজনের যে যুক্তি কাউন্সিলরের কাছে দাঁড় করালো তাতে যে যার জায়গায় রীতিনীতির আদর্শ অনুযায়ী সঠিক। এরই মধ্যে একে অপরের প্রতি যে ভালোবাসা ছিল, সেই ভালোবাসার বাঁধ ভেঙে পড়েছে। পরিণামে তারা ডিভোর্স নিতে বাধ্য হলো। সিলভিয়া, কেয়াকে সাথে নিয়ে আজিমের জগৎ থেকে চিরতরে বিদায় নিলো।

আজিম এ ব্যথা সহ্য করতে পারল না। তাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। মানসিক হাসপাতালে তার সাথে এক মাদ্রাজি রোগীর পরিচয় হলো। সে আজিমের জীবনকাহিনি শুনে হিন্দিতে বলল, 'ইয়ার, তুমি জীবনের পথে চলতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছ, আমারও সেই একই অবস্থা। এটাই হলো জীবনের খেলা। কেন যে দেশ ছেড়ে বিদেশে রয়ে গেলাম, হয়তো ভাগ্যে ছিল বলে।'

শেষ বিকেলের আলোয়

ধনঞ্জয় পাল

বয়সে আমার চেয়ে ছোটো কিন্তু সম্পর্ক বন্ধুর মতো। মাঝেমাঝে দেখা হলে কাছের কোনো ক্যাফেটেরিয়াতে বসে চা বা কফি খেতে খেতে গল্প করি। রাসেলের ভাবনার সাথে আমার চিন্তার জগতের অনেক মিল, তাই অল্পতেই গল্প জমে যায়।

বেশ কিছুদিন ওর সাথে যোগাযোগ ছিল না, ফোনেও কথা হয়নি। আজ দেখা হয়ে গেল অনেকটা দৈবক্রমে। রাস্তায় ওর উপরে চোখ পড়লেও প্রথমে চিনতে পারিনি। ও কিন্তু আমাকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল, দ্বিতীয়বার চোখাচোখি হতেই আমি অবাক হয়ে থেমে গেলাম–একি হাল হয়েছে রাসেলের!

মাথা ভর্তি সুন্দর চুল ছিল, সব ছেঁটে একেবারে ন্যাড়া!

তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। রাশ আওয়ার পার হয়ে গেছে তাই রাস্তায় ভিড় তেমন নেই। লন্ডনে গ্রীষ্মের এ পড়ন্ত বেলাতেও সূর্যের আলো চকচক করছে। সেই উজ্জ্বল আলোতেও বন্ধুর চেহারাটা কেমন মলিন মনে হলো। বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা হয়েছে। বললাম, “তাড়া না থাকলে চলো কোথাও বসি।”

রাসেল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

কাছের এক রেস্টুরেন্টে ঢুকে দেখলাম বেশ ফাঁকা। কোণের এক টেবিলে বসে ওর জন্য কফি আর আমার জন্য চা অর্ডার করলাম। দেখা হওয়ার পর থেকে আমার বন্ধুটি তেমন কোনো কথাই বলেনি। এবার আমি পরিবেশ হালকা করার জন্য বললাম, “কী ব্যাপার, মাথা ন্যাড়া করা কি নিউ ট্রেন্ড নাকি?”

রাসেল মুচকি হাসল।

“নাকি প্রেমিকার বিচ্ছেদ যাতনা ভোলার নতুন কৌশল?”

ও বলল, “না ভাইয়া, ওসব কিছুই না”।

আরো কিছুক্ষণ রাসেল চুপ করে বসে রইল। তারপর একসময় আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “ভাইয়া, কিছুদিন আগে আমার মায়ের ক্যান্সার ধরা পড়েছে। অনেকটা লেইট স্টেজে। কোনো লক্ষণ চোখে পড়েনি, তাই আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। খুব দ্রুতই চিকিৎসা শুরু হয়েছে। ডাক্তার প্রথমে রেডিওথেরাপি দিয়েছিল, তাতে খুব একটা উন্নতি হয়নি। গত সপ্তাহ থেকে কেমোথেরাপি শুরু হয়েছে। আপনি তো জানেন কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মাথার চুল পড়ে যায়। এ

বয়সেও আমার মায়ের মাথায় অনেক চুল। তিনি চুলের যত্নও করেন খুব। আমি মায়ের পাশে বসে দেখছিলাম। ডাক্তারের কথা শুনে তার মনটা কেমন বিষণ্ন হয়ে গেল। তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিই মায়ের কেমোথেরাপি শুরু হওয়ার দিন থেকে আমিও মাথার সব চুল কেটে ফেলব। যত দিন মায়ের চুল আবার না গজাবে ততদিন এভাবে ন্যাড়া মাথায়ই থাকব।”

এটুকু বলেই ও চুপ হয়ে গেল, বুঝতে পারছিলাম ওর গলা ধরে এসেছে। ওয়েটার এর মাঝে চা কফি দিয়ে গেছে। রাসেল কেবল কফির পেয়ালার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আর আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। কোনো কথাই বলতে পারছিলাম না। আমাদের দুজনের গরম পেয়ালা থেকে ধোঁয়া উড়ছিল। সেই ধোঁয়ার মাঝেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম বন্ধুর মায়ের মুখটি। আর ভাবছিলাম সবার ছোটো ছেলে সে, সবচেয়ে বেশি আদরেরও। পাগল ছেলের এমন কাণ্ডে মা হয়তো বকেছেন খুব। যাকে পেটে ধরেছিলেন, বুকে আগলে বড়ো করেছেন সেই ছেলের জন্য নিশ্চয় অনেক গর্বও হয়েছে তাঁর। মায়ের চোখ যখন ভিজে এসেছিল হয়তো তিনি মুখ আড়াল করেছিলেন তা লুকোবার জন্য।

রাসেলকে সান্ত্বনা দেয়ার মতো কোনো ভাষা আমার ছিল না। রেস্টুরেন্টের কাচের জানালা গলে শেষ বিকেলের এক টুকরো রোদ ওর মুখের উপর এসে পড়েছিল। সে আলোয় রাসেলের মায়াময় মুখটি দেখে আমার রবি ঠাকুরের বীরপুরুষ কবিতার সেই ছোট্ট ছেলেটির কথা মনে পড়ল, যে তলোয়ার হাতে একাই ডাকাতদের সাথে যুদ্ধ করে মাকে বাঁচিয়েছিল।

চা আর কফির ধোঁয়া অনেক আগেই স্তিমিত হয়ে এসেছে। আমারা কেউই তা ঠোঁটে ছোঁয়াইনি। রাসেল হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, “ভাইয়া, আজ আসি, আরেকদিন কথা হবে।”

আমি মাথা নাড়ালাম। ওর চলে যাবার পথের দিকে চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। রাসেলের মায়ের মুখটি মনে পড়ল আবারো। মনে মনে শুধু এটুকুই প্রার্থনা করলাম, ছেলের এমন পাগলামি দেখার জন্য মা যেন আরও অনেকদিন বেঁচে থাকেন।

পঙ্গু হয়ে যাওয়া একটি শোকসভার হালহকিকত

সাগর রহমান

সে এক আশ্চর্য পরিযায়ী, আঁও বোঝে না, ভাঁও বোঝে না...

আমাদের গ্রামে একটি মৃত মুনিয়ার জন্য যে সমবেত শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল শতবর্ষী অশ্বত্থ গাছটির তলায়, সেটি অবশেষে পঙ্গু হতে চলেছে।

গ্রামবাসীদের দুপুরে খাওয়া পাইজাম চালের ভাত আর কেঁচকি মাছের তরকারি ঠিকঠাক মতো হজম হতে না হতেই হঠাৎ আকাশ জুড়ে উড়নচণ্ডী মেঘ–যাদের মহিষের মতো কালো কালো শরীর দেখে ঝুলন চৌকিদার বারংবার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, "খবর আছে কইলাম", তারপর হঠাৎ ঝমাঝম বৃষ্টি নেমে গেলে বলেছিলেন: "কী ভাতিজারা, কইছিলাম না!", বৃষ্টি পড়ে সড়কে উলঙ্গ বেহায়পনায় নেচে উঠা ঢলের পানি পড়ে তার বক্তব্য: "তোমাগো সমস্যা হইল মুরুব্বীর কথা শুন না, খালি তোমগো সমস্যা না, এটা এই যুগের জাতীয় সমস্যা", বলতে বলতে তিনি তার হাতে থাকা সেলফোনটা নাচাতে লাগালেন এমনভাবে যে, উপস্থিত কারোরই আর সন্দেহ থাকল না–'এই যুগ' বলতে তিনি আসলে কোন যুগটিকে বুঝিয়েছেন।

অশ্বত্থ তলাটি বাঁধানো, চারপাশের জমিন হতে দুইহাত উঁচু মাটির ঢেলা উপচে বেহায়া জল উঠতে পারেনি অতদূর, আমরা তাই জুত করে বসে বসে বিড়ি খাচ্ছিলাম একের পর এক, আর বসে বসে ঝুলন চৌকিদারের বকবক হজম করছিলাম। মৃত মুনিয়াটি টেবিলের উপর রাখা। ওটা এবং আমরা এবং আমাদের গ্রাম, গ্রামের সিঁথির বহু উপরে এক চক্ষু জ্বলা দাঁতাল রাক্ষসের মতো দাঁড়িয়ে থাকা মোবাইলের টাওয়ার, সমির মিয়ার ডিশ এন্টেনা টাঙানো (যাতে তিনি বলিউড নায়িকাদের সখি পরিবেষ্টিত কৃষ্টি ও পিস টিভির দ্বীনি কালচার দেখতে দেখতে বিরতিহীন তসবিহ টানেন) দোতলা বিল্ডিং–ভিজছিলাম। আমাদের মনে ক্ষীণ আশা ছিল, ঝুলন চৌকিদার তার অর্ধ সেঞ্চুরি পার করা শরীর ও বিজ্ঞতা নিয়ে যতই বৃষ্টি ও ঢলের পূর্বাভাস করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত শোকসভাটি হবে।

কিন্তু এত কাণ্ড হয়ে যাবার পর, এখন নিশ্চিত বুঝতে পারছি, হবে না। কেউ আসবে না আর এ মুখো। আড়চোখে আমরা পরস্পরকে দেখি। আমি অন্তুকে দেখি, অন্তু সোবহানকে দেখে, সোবহান মিশুকে দেখে, মিশু হারুনকে দেখে এবং হারুন আমাকে দেখে–এভাবে বৃত্তটি পূর্ণ হয়। বৃত্তের মাঝখানে টেবিল, টেবিলে একটি মৃত মুনিয়া, ওর দিকে ভ্রু কুঁচকে চেয়ে থাকেন বৃত্তের বাইরের দিকে বসে থাকা ঝুলন চৌকিদার। তিনি একটু পরপর হাতের লাঠিটা দিয়ে জলের গায়ে ঠোকর মারেন,

আর বিকট শব্দে কাশি দিতে দিতে বলেন, কী করা যায়, কও দেখি!

আমরা যেহেতু জানি না–কী করা যায়, তাই কিছু বলি না। শুধু সিগারেট হাত বদল করতে থাকি আর থেকে থেকে ভেসে আসা বাতাসে শরীর কেঁপে উঠলে মৃদু কেঁপে উঠি। হয়তো আমাদের মনে ক্ষীণ আশা ছিল, তিনি যেহেতু বিজ্ঞ এবং চেয়ারম্যান না আসলে তিনিই সভাপতি বনে যাওয়ার কথা, সুতরাং তিনিই একটা কোনো পথ বাতলাবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ঝুলন চৌকিদার এ মুহূর্তে কোনো পথ জানেন না এবং আমাদেরকেই জিজ্ঞেস করছেন–কী করা যায় এখন।

: দিমু নাকি চেয়ারম্যান সাহেবকে ফোন? কী কও? আরেকবার যদি–

তা যদি চেয়ারম্যান সাহেবকে তিনি ফোন দিতে চান, তবে দিতে পারেন, এতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকার কথা না, আমরা তাই চুপ করেই থাকি, শুধু আড়চোখে উনার ফোনের ব্র্যান্ডটি দেখার চেষ্টা করে বোঝার চেষ্টা করি, ওটার দাম কেমন। অপ্পো ফোন। সাইজে সাত ইঞ্চি। সেটাতে ওয়ালপেপার হিসেবে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ছবি। ঘোমটা টানা একটা কচি ফর্সা মুখ। ঠোঁটে লিপস্টিক। কপালে কালো রঙের ছোট্ট একটা টিপ উঁকিঝুঁকি মারছে। নাক ও কান ও গলায় সোনার গহনা ঝিকমিক করছে। ঝুলন চৌকিদারের একটু পরপর তার অপ্পো ফোনটিকে চোখের সামনে তুলে ধরার কারণ বোধহয় তার নবপরিণীতা স্ত্রীকে দেখা। যতবার উনি চোখের সামনে ফোনটি তুলে ধরেন, ততবার আমরাও চোখ তুলি, যতদূর সম্ভব গলা বাড়িয়ে স্ক্রিনের মুখটা দেখার চেষ্টা করি।

আমাদের নিশ্চুপতা দেখে নিজের প্রস্তাব নিজেই নাকচ করে দেন তিনি। বলেন, নাহ, যেই ঢল নামছে, মনে হয় না আর এই মুখা হবে, হাড়ে হাড়ে চিনি তো। পানি দেইখ্যাই দোতলায় গিয়া উঠছে। দেখ গিয়া, বউরে প্যাঁচায়া ধইরা দিছে ঘুম।

বলতে বলতে তিনি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসেন। আমরা তার সাথে হাসব কি না, বুঝতে পারি না। ঢল নামার দিনে ঘরের বউকে প্যাঁচিয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে হয়তো কোনো বিশেষ ব্যাপার আছে, হয়তো নেই, হয়তো পুরোটাই বিবাহিত মানুষদের নানাবিধ কারসাজি–যেমন, কিছু বছর আগে, যেদিন টুইন টাওয়ার ধ্বংস করার জন্য দুইখানা প্লেন গোত্তা মেরে বিল্ডিং দুটোর ভেতরে ঢুকে পড়েছিল, তার পরদিন কারা যেন মসজিদে বলাবলি করছিল, লাদেন আল্লার নবি গো, লাদেন আল্লার নবি এবং প্রতিউত্তরে কারা যেন যুক্তি দেখিয়েছিল, পুরাটাই ঐ হালা মান্দারের পো বুশের নাটক–শুনে আমরা দ্বিধান্বিত হয়ে গিয়েছিলাম। বাজারের পেছনের খাল দিয়ে মহা গর্জন করে ঢলের পানি ধাক্কাধাক্কি করে মেঘনার দিকে দৌড়ে যাবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত এখন, সেদিক থেকে হামহাম শব্দ উঠছে। সেই শব্দেই হয়তো, কিংবা বৃষ্টিতে সপসপে হয়ে যাওয়া আমাদের চামড়ায় ঠান্ডার আমেজে, অথবা এত আয়োজনের শোকসভার পণ্ড হওয়ার পণ্ডশ্রমে আশাহত হয়ে আমরা কেমন চুপসে গেছি।

ঝুলন চৌকিদার খ্যাঁক-খ্যাঁকে হাসিটা থামিয়ে হঠাৎ হাহাকারের স্বরে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা প্রসঙ্গ পেড়ে ফেলেন, হায় হায় রে! বেচারির এত সাধের একটা করল্লা

গাছও থাকব না। কি কও, থাকব? কী মনে হয়? গোড়ায় যদি এই পানিটা জইম্যা থাকে, তয় তো–

তিনি থামেন। মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। অসময়ের পানি যদি করল্লা গাছের গোড়ায় জমে থাকে, তবে গাছগুলো বাঁচবে কি-না, সে চিন্তা করতে শুরু করেন। আমরা পরস্পরকে আড়চোখে দেখার পালা শেষ করে এবার উপরের আকাশের দিকে তাকাই। কিন্তু উপরের দিকে তাকিয়ে আকাশ দেখা যায় না। গাছের বড়ো বড়ো পাতা ডিঙিয়ে আমাদের দৃষ্টির আলো মহাশূন্যের দিকে প্রসারিত হবার ফুরসত পায় না। অতএব তাকাতে হয় বেশ খানিকটা প্রান্তের আকাশের দিকে। আকাশের মেঘগুলোর দিকে। জল এখন আর ঝরছে না বটে, তবে মেঘগুলো কি থাকবে? জলের যেই খলবল শোনা যাচ্ছে খালের দিক থেকে, এমন হতেও তো পারে যে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জল-টল নেমে গিয়ে পথ-ঘাট সদ্য সদ্য স্নানপরের নাঙা গতর দেখাতে শুরু করল!

: বুঝলা, তোমগো কাকি এই বছর লাগাইছে আট জাতের করলা। গজ, বারি, বুলবুলি, গৌরব, হাইব্রিড, গ্রিন রকেট, বীর উত্তম–কয়টা হইল? আটটা হইল তো। নাকি?

আমরা গুনি নাই এতক্ষণ। জলের মতিগতি বোঝার চেষ্টায় ছিলাম বলে মনে হয় হঠাৎ এত জাতের করলার নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হওয়ায় কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই। গজ, বারি, বুলবুলি বুঝলাম, কিন্তু বীর উত্তম করল্লার ব্যাপারটা কী? ঝুলন চৌকিদার আমাদের উত্তরের তোয়াক্কা না করে তার মোটা আঙুলের কালো কালো শিরার দাগে দাগে গুনতে শুরু করেন এবার। গোনা শেষ হলে ভীষণ চিন্তিত মুখে বলেন, সাতটা! তাইলে আরেকটা কী? মুসিবত তো। করলার নাম ভুইল্যা গেলে আজকে তো আমারে ঘরে জায়গা দিব না। দিব?

তিনি ঘরে জায়গা পাওয়ার চিন্তায় স্ত্রীর লাগানো অষ্টম করলা জাতের নামটি মনে করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। আমরা ভাবতে থাকি, এক করলার ভেতরেই এত জাত-পাত! কামটা কী ঠিক? আর এক লগে ভিন্ন জাতের করলা লাগানোও কি ঠিক? এইটা কাকির বাড়াবাড়ি হইছে।

এসব কথা হয়তো আমরা পাঁচজন এক সঙ্গেই ভাবি, নয়তো অন্তু হঠাৎ বলে উঠত না, ওগো ভুবনে মনে হয় লালন ফকির নাই।

তারপর ওর সদ্য কফ বসা গলায় ঘসটিয়ে ঘসটিয়ে একটা গানের কলি গজিয়ে তোলার চেষ্টা করে, জাত গেল, জাত গেল বলে, এ কি আজব কারখানা–

ওকে এবং হয়তো ঝুলন চৌকিদারকেও, থামানোর জন্যই সোবহান কুটনৈতিক চালটা চালে। বলে, আচ্ছা, তোগো কি মনে হয়, এই গাছটার বয়স দেড়'শ হইছে?

তারপর এক মুহূর্ত ভেবে বলে, দেড়শ মানে হইল ধর এইটার বীজ থেইক্যা চারা বার হইছে আঠারো শ সত্তুর সালে। ক্যামনে কী? ঐ মিশু, দাড়িওয়ালা ঠাকুর জানি কবে জন্ম নিছিল?

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা কে কবে জন্ম নিয়েছেন, সেসব মিশুর জানার কথা। ও বিসিএসের জন্য লড়ছে। দিনরাত সাধারণ জ্ঞানের বই পড়ছে। হঠাৎ হঠাৎ আমাদেরকে চমকে দিয়ে জানান দেয়, জানিস, শ্রী চৈতন্যদেবের স্ত্রীর নাম ছিল লক্ষ্মীপ্রিয়া। লক্ষ্মীপ্রিয়া ছিলেন বল্লভ আচার্যের কন্যা। আমরা হয়তো বিরক্ত হতাম ওর এমন ব্যবহারে, কিন্তু ঐ লক্ষ্মীপ্রিয়া নামটি কেমন ভেতরে ঢুকে যায় আমাদের। কয়েকটা মাত্র অক্ষর, তবু কেমন কচি লাউডগার মতো কী যেন একটা ভীষণ স্পর্শকাতর অনুভূতি লকলকিয়ে ওঠে আমাদের মর্ম-মজ্জায়। তবে বেশিক্ষণ ঐ সুখানুভূতি বাতাসে দোল খেতে দেয় না মিশু। তার জ্ঞানের জিহ্বা আবার ছ্যাঁৎ করে বের হয়ে যায়, বেচারি বেশিদিন বাঁচে নাই। সর্পঘাতে মারা যায়। অর্থাৎ রবিঠাকুর কবে জন্ম নিয়েছিলেন–সেটা জানার জন্য যোগ্য ব্যক্তিকেই বেছে নিয়েছে অন্তু। মিশু এক মুহূর্তও না ভেবে উত্তর দেয়, আঠারো'শ একষট্টি সালের সাত মে, পঁচিশে বৈশাখ বারো'শ আটষট্টি।

অন্তু এবারে উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, তাইলেই বোঝ। তার মতো একটা জ্ঞানের বৃক্ষ মইরা গেল একাশি বছরের মাথায়, আর প্রায় এক লগে জন্ম নেওয়া এই বৃক্ষ এখনো বাঁইচা আছে? ক্যামনে কী! এর দরকার আছে এতদিন বাঁচনের? এই এইটা একটা অবিচার না?

হঠাৎ তৌহিদ সামনের টেবিলের ওপর ঘুসি মেরে বলে ওঠে, তোরা হালারা বালের কথা লইয়া যেই ভ্যাদর ভ্যাদর শুরু করলি সেই তখন থেইক্যা। চোখের সামনে এত বড়ো একটা কাজ, সেটা নিয়া কোনো চিন্তা নাই, বাল–

ওর চিৎকারে ঝুলন চৌকিদারেরও সংবিত ফিরে। তিনি অষ্টম জাতের করলার নামটা তখনো মনে করতে পারেননি বোধ হয়। তৌহিদের কথার উত্তরে তাড়াতাড়ি বললেন, হ, কাজের কথায় আসন দরকার। বেশি প্যাঁচাল ভালো না। দিনকাল তো ভালো পড়ে নাই। পড়ছে?

আমি বললাম, তাইলে এক কাজ করি। আমরাই যা করনের করি। শোকসভাটা সাইরা ফালাই। আর কেউ আসব বইল্যা মনে হয়–

প্রশ্নটা কারো উদ্দেশে না। তবু তার উত্তর খুঁজতেই সবার চোখ চারদিকে প্রসারিত হয়ে যায়। বড়ো রাস্তাকে এখন আর আলাদা করে চেনার উপায় নেই। মাঠ আর রাস্তার সীমানা এখন আমাদের স্মৃতিতে, জল থইথই করছে পুরোটা দিগন্ত জুড়ে। শুধু ঐ খুঁটিগুলো–ফলজ, বনজ ও ঔষধির কোনো গাছ সরকার দলের কোনো সংগঠনের কোনো সভাপতি, সেক্রেটারি, কোষাধ্যক্ষ, সদস্য, উপসদস্য লাগিয়েছেন, সেগুলো মাথা চাড়া দিয়ে আছে। খুঁটির নিচের গাছ বহুদিন ধরে নেই, খুঁটিগুলো আছে–যেহেতু ওগুলোই অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং খুঁটির স্মৃতি রক্ষায় এ রাস্তার অপোশাকি নাম হয়েছে 'খুঁটি সড়ক'। সেই খুঁটি সড়কের দিক হতে যে কোনো ধরনের আনাগোনা দেখতে পাওয়া ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু নেই। সড়কের কিছু পরপর রেইনট্রির গাছগুলোর ডালে ডালে অনেক পাখির জটলা, অথচ

একটি পাখিও ডাকছে না, সবাই ভীষণ চুপচাপ। বিষয়টা এই প্রথম আমাদের নজরে পড়লে মনে কেমন কু ডাক ডেকে উঠল, ঘটনা কী, এত পাখি এক লগে!

আমার যমুনার জল দেখতে কালো...

পাখিদের মাজেজা বহুদিন আমাদের মনে পড়ে না, মনে পড়ে না যে এই পাখির উড্ডয়নবিদ্যা পরখ করতে করতে বিবিধ পোকারা জীবনভর ঊর্ধ্বমুখ করে জীবন কাটায় এবং মাকড়সাদের নিত্য বিচারসভায় তাদের প্রতি স্রষ্টার একচক্ষু আচরণটির বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা করার কথা ভাবে। হয়তো আসলে কেবল ভাবেই না, কোনো কোনো দিন যে উত্তর পাড়ার সজল ভাইদের আম-জাম-কাঁঠাল-চালতা-গাব-হরিতকি-নিমগাছ ভরা জঙ্গলের পেছনের রাস্তা দিয়ে সারি সারি বিবিধ পিপীলিকার দীর্ঘ দীর্ঘ সারি বের হয়ে কোথা থেকে কোথায় উধাও হয়ে যায়, সেসব হয়তো ঐ বিদ্রোহী শোভাযাত্রাই। আমরা কলেজ পালিয়ে যে দোকানের পেছনে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে এসব গূঢ়কথা আলোচনা করতাম, সেটি প্রথমে ছিল চা-পান-বিড়ির দোকান, পরে হলো টি-কফি কর্নার এবং গত একবছর ধরে সেটা কমিউনিকেশন কর্নার, নাম : ই-শপ, মানে, মোবাইল সারাই, ফ্লেক্সিলোড ও বিকাশ করার দোকান। দোকানটার মালিক ঝুলন চৌকিদার−চৌকিদারটা বোধহয় ওনার পারিবারিক উপাধি নাকি হয়তো কোনো এক কালে তিনি চৌকিদারি করতেন, হয়তো সেটা ইংরেজ আমলে কিংবা তারও আগে, মোঘল আমলে−উনার প্রজ্ঞার পরিধি বোঝাতে উনি যেসব রেফারেন্স দেবার চেষ্টা করেন, তাতে আমাদের ওরকমই মনে হয়। তবে আমাদের স্মৃতি শুরু হয়েছে তার চায়ের দোকানদার হিসেবে এবং সেটা স্থির হয়েছে ই-শপের সিইও হিসেবে। এখন তিনি আর দোকানদারি করেন না, দুটো কর্মচারি আছে। ওরা ভাঙা মোবাইল ঠিক করে, মোবাইলে ফেক্সিলোড করে, বিকাশ করে, মাঝেমাঝে মোবাইলে পরস্পরকে কি-জানি-কীসব দেখাতে দেখাতে নিচু গলায় হাসাহাসি করে এবং আমরা সিগারেট ফুঁকতে গেলে 'চৌকিদার সাব তো ঘরে, আসনের ঠিক ঠিকানা নাই' বলে তাড়ানোর চেষ্টা করে। দুইজনকেই একদিন 'ছেঁচা' দিয়েছিলাম আমরা, ত্যাঁদড়ামির ফল বাবদ দোকানের পেছন দিয়ে যমুনার দিকে বয়ে চলা খালের কচুরিপানায় মেরে পুঁতে ফেলার হুমকি দিয়েছিলাম, আগামী চৈত্রের খরা শুরু হওয়ার আগে সরপুঁটি, কই, খইয়া, ভেদা, কাঁচকি মৎস্য ভিন্ন আর কোনো প্রাণী ওদের লাশ যে খুঁজে পাবে না−সেটা বিস্তৃত করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। কী আশ্চর্য! এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই, আমাদের উল্লেখ্য ঐ কচুরিপানার ভেতরেই পাওয়া গিয়েছিল মুনিয়াটিকে। শাদা। উলঙ্গ।

বাখরখানির দোকান থেকে এক চিমটি এক চিমটি সুবাস ছড়িয়ে পড়ছিল তখন আমাদের এরতোদিয়া বাজারের এ মাথা থেকে সে মাথা অবধি। সে সুবাসের জোরে কিংবা বাজারের দক্ষিণে বারোয়ারি পেশাবখানার দুর্গন্ধের দৌরাত্ম্যে মুনিয়াটির মৃতগন্ধ নাকে লাগতে পারেনি আমাদের কারো। বাবুল স্বর্ণকারের দোকানের 'তেরে

মেরে' এবং 'ও স্বামে, ও স্বামে' বেজে ওঠার আগে রুটিন মোতাবেক 'ফাবি আয়্যি আলা ই রব্বিকুমা তুকায্যবিন'-এর দুই মিনিট বাকি তখনো, তখনো বাজারের চা-পরোটালোভী জনগণের চোখের পিঁচুটি পরিষ্কার করতে করতে শেখ বদিউল আলমের চা দোকানের 'পশ্চিমাগোরে কী খেইল যে খেলাইতেছে বাবা পুতিন' বিষয়ক সকালের আলোচনা শুরু হয়নি, তখনো আমাদের রাতভর ঘুমিয়ে থাকার সুবাদে কোন কোন ভিডিওগুলো ভাইরাল হয়েছে–তার তত্ত্বতালাশ নেওয়া শুরু হয়নি আমাদের, কেবলই স্ট্যাটাসমূহের লাইক, লাভ, কেয়ার ইমোটিনসমূহের গোনাগুনতি–হিসাবনিকাশ চলছে, এমতাবস্থায় আমদাদিয়া হোটেল এণ্ড রেস্টুরেন্টের কর্মচারি তৌহিদুল আলমের তীক্ষ্ম চিৎকারে এরতোদিয়া বাজার কেঁপে উঠল, ঐ রে মাগো, এইটা কী! এইটা কী!

'হালার পো কি ভূত দেখছে নি এই বিহান বেলায়' বলতে বলতে আমরা সবাই ওইদিকে এগিয়ে যাই। গিয়ে দেখি, তৌহিদুল আলমের ভেজা গা, পরনের গামছাটা কোনোরকমে লটকে আছে কোমর হতে, তাতে তার যন্ত্রপাতি যে খানিকটা বের হয়ে আছে–তাতেও বেচারার কোনো খেয়াল নেই। রেস্টুরেন্টের পেছনে খাল লাগোয়া ঘাটে বসে ভূতে পাওয়া মানুষের মতো তৌহিদুল আলম কাঁপছে এবং খালের দিকে ডান হাতের শাহাদাত আঙুলটি বাড়িয়ে দিয়ে কিছু একটা দেখানোর চেষ্টা করছে, আর বিড়বিড় করছে, পেততুন্নি। পেততুন্নি। তৌহিদুল আলমের পাশে একটা লাল বালতি। বালতিতে খাল থেকে তোলা পানি। আমদাদিয়া হোটেল সম্পর্কে সন্দেহটা বহুদিন ধরেই বাজারে প্রচলিত যে ওদের বিখ্যাত ভেজামিষ্টি বানাতে ওরা টিউবওয়েলের পানির পরিবর্তে খালের পানি ব্যবহার করে, খালের পানির কারণেই ওদের মিষ্টি এত মিষ্টি হয়–কথাটা মনে হয় সত্যি। আমাদের মনে পড়ে যায়, এই লাল বালতি ব্যবহার করেই ভেজা মিষ্টির পাতিলে পানি ঢালতে দেখেছি আমরা বহুবার, সুতরাং প্রচলিত সন্দেহটা যে নিছক অমূলক নয়–এ সত্যটা হাতে-নাতে ধরে ফেলার একটি সুযোগ আমাদের হাতে ছিল, কিন্তু সেসব কথা এখন আমাদের মনে পড়ে না। আমরা তৌহিদুল আলমের অঙ্গুলি নির্দেশিত দিকে তাকাই। তাকিয়ে প্রথমে বিপুল কচুরিপানা দেখতে পাই, কচুরিপানার উপরে ভায়োলেট রঙের ফুল দেখতে পাই, বড়োদের একটা ছেঁড়া জাঙিয়া অথবা বাচ্চাদের একটা প্যান্টকে ভাসা অবস্থায় দেখতে পাই, কয়েকটা পটেটো চিপসের ঠোঙা ডুবছে আর ভাসছে–সেটা দেখতে পাই, পানিতে ভরে ফুলে ওঠা একটা ব্যবহৃত কনডমকে কচুরিপানার কাণ্ডে আটকে থাকতে দেখতে পাই এবং একটা সাদা রঙের গাছের ছোট্ট গাছের গুঁড়িকে আধা ডুবন্ত অবস্থায় দেখতে পাই। কিন্তু কোনো পেততুন্নি দেখতে পাই না। আমাদের এই দেখতে না পারার কাল অবশ্য খুব বেশি দীর্ঘ হয় না। দ্বিতীয়বার সর্তক চোখে তাকাতেই আমরা বুঝতে পারি, যে সাদা রঙের গাছের ছোট্ট গুঁড়ি দেখতে পাচ্ছি বলে চোখ আমাদের কাছে সংকেত পাঠাচ্ছে, ওটা আসলে গাছের গুঁড়ি নয়। একটি মৃত শরীর। নাঙা। জলে ভিজে ভিজেই হয়তো কাগজের মতো

শাদা। পিঠ উপরের দিকে রেখে যেন জলের তলায় কিছু একটা খুঁজছে–এমন ভঙ্গিতে আধাআধি ভাসছে।

আমরা ঘটনার আকস্মিকতায় তব্দা মেরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি, এমন সময় আমদাদিয়া হোটেলের ম্যানেজার আবুল কাকু হোটেল ঘর থেকে তীব্র চিৎকার করে ওঠেন, ঐ তোইদ্দা। তোইদ্দা, হউরের পো এতক্ষণ নি লাগে–

তোইদ্দা মানে তৌহিদুল ইসলাম। সে ঐ চিৎকারে ভীষণ মিইয়ে যায়। লাল বালতিটিকে ঢক্ ঢক্ করে গলা অবধি খালের পানি গিলিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়। আমরা আড়চোখে দেখি বালতির পানিতে কচুরিপানার চুল দেখা যাচ্ছে। এই চুলওয়ালা পানিতেই যে আজকে ভেজামিষ্টি তৈরি হবে–সেটা বুঝেও কাণ্ডটি না দেখার ভান করে আমরা পানিতে ভাসা শরীরটার দিকে চেয়ে থাকি।

পাখিদের শরীর এত শাদা হয়!

মাইয়া ও পতত্রী বিষয়ক জটিলতা...

আমাদের মনোজগতে দ্বিধাটির রোপন করেন এনায়েত উল্লাহ চেয়ারম্যান।

আমরা যখন উনাকে মৃত মুনিয়াটির জন্য শোকসভার দাওয়াত দিতে যাই, তিনি তার সামনে বসে থাকা দুজন মেম্বার ও জনা ছয়েক মুরুব্বীকে গ্রিন টি পানের উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছিলেন। আমাদের প্রস্তাব শুনে তিনি একটা বিকট হাই তুলে বললেন, শোকসভা করবা, ভালো তো। আছি। আমি আছি। তা মাইয়া কোন গেরামের?

ওটা যে কোন 'মাইয়া' না, পাখি, সেটা বুঝিয়ে বলার পর তিনি আরেকবার একই দৈর্ঘ্য-প্রস্থের হাই তুলে বললেন, ও একই কথা। মাইয়ারাই তো পাখি হয়, পাখিরাই কখন আবার মাইয়া বনে যায়। হা হা হা।

তার সামনের মোসাহেব কয়েকজনও হা হা করে ওঠেন। আমাদের হতভম্ব ভাব দেখে তিনি বলেন, আচ্ছা, বাদ দেও। বয়স কম তো। বুঝবা না। তা কী নাম জানি পাখির?

আমার উদ্দেশ্য ছিল, বিশেষ কোনো বিস্তারিত তথ্যে না গিয়ে স্রেফ 'মুনিয়া পাখি' বলে পরিচয় শেষ করি। কিন্তু হারুণ এ বিষয়ে তার এক এমবি'র মতো ডাটা নষ্ট করেছে, সে তার শোধ তোলা বাবদ বলতে শুরু করে, এটা হইল তিলা মুনিয়া। ইংরেজিতে বলে, ব্রেষ্টেট মুনিয়া।

চেয়ারম্যান সাহেব হাত তোলেন, বাংলা নামটাই ভাল। ব্রেষ্ট-ট্রেস্ট এগুলান খারাপ কথা। ইংরাজদের চক্রান্ত।

বলতে বলতে তিনি আবার হাসেন। তার মোসাহেবরা হাসে। পুরো জ্ঞান 'ডেলেভারি' না দিতে পারায় এমবি হারানোর শোকে হারুণের মুখ তিতকুটা হয়ে যায়। চেয়ারম্যান সাহেব আমাদের উদ্দেশে বলেন, ফোন দিয়া মনে করাইয়া দিয়ো ঐ দিন সকালে। পাখি না মাইয়া–এই কথাটাও মনে করাইয়া দিয়ো কিন্তু, বয়স হইছে–বুঝোই

তো! আইচ্ছা, এখন গ্রিন-টি খাইয়া যাও এক কাপ কইরা। ঐ কই রে–

বোধহয় তার পিওনের উদ্দেশে তিনি গলা তোলেন। গ্রিন-টি খেয়ে মুখ নষ্ট করার মতো বলদামি আমরা করি না। দ্রুত ইউনিয়ন অফিস থেকে বেরিয়ে যাই। অন্তু রাস্তায় নেমেই অস্ফুট স্বরে একটি বিদ্‌ঘুটে গালি দেয়, মাংগের পো রাজাকার। পাখিরে কয় মাইয়া, মাইয়ারে কয় পাখি–

পাখি এবং মেয়েদের বিভেদ বোঝার জন্য অবশ্য আমরা অত ব্যস্ত হয়ে উঠিনি তখনো। বারেক মিয়ার পাকা পুলের বাহুতে পা ঝুলিয়ে বসে হানিফ ধানকলের ছড়ানো উঠোনের দিকে মুখ করে ধোঁয়া ছাড়ার আমাদের এই বাপের হোটেলের মেহমান থাকার কাল আর কতকাল প্রলম্বিত করা যাবে–সে চিন্তাটিকে জোর করিয়ে সরিয়ে রেখে ভাইরাল ভিডিও দেখি, দেখাই, নিজেরাও একদিন ভাইরাল হয়ে যাবার স্বপ্ন দেখি। ঐ পুলে বসেই শোকসভার চিন্তাটি আমাদের মাথায় আসে। বিকেলে ঝিরিঝিরি হাওয়া বইছিল, কোথাও থেকে একদল কুকুরের খেয়োখেয়ি আওয়াজ বারংবার ভেসে আসছিল আমাদের দিকে এবং হয়তো সেকারণেই আমাদের মনে হয় মুনিয়াটির মৃত্যুর জন্য ঐ ‘হালার পো’রাই দায়ী এবং তাই যদি হয়, তবে নিদেন একটা শোকসভা তো থাকা উচিত–এমন ভাবনায় আমরা সম্মিলিত আত্মসমর্পণ করি।

আমরা এরতোদিয়া বাজারের মুহিব মাইক সার্ভিসটিও ভাড়া নিয়েছিলাম এক বিকেলের জন্য। বিকেলের আলো-লাগা গাঁয়ের পথ ঘুরে ঘুরে সেই মাইকে আমরা আজকের এই শোকসভার প্রচারণা চালাই। মিশুর কাঁপা কাঁপা গলার ঘোষণা শুনে ঘোমটা পরা বউ’রা মুখ বাড়ায় বাড়ির আল হতে, পুরুষরা খেতের কাজে ক্ষান্ত দিয়ে আমাদের কথা শুনতে শুনতে একটি বিড়ি খাওয়ার অবসর তৈরি করে, গ্রামের যাবতীয় বাচ্চারা ছুটতে শুরু করেছে আমাদের বহন করে চলা ব্যাটারিচালিত রিকশার পিছু পিছু।

কিন্তু, এর সবই পণ্ডশ্রম হলো বুঝতে পারছি। ধীরে ধীরে আমাদের মন হাল ছেড়ে দিতে শুরু করেছে এতক্ষণে। সোবহান একদলা থুথু পানিতে ছুড়ে ফেলে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, এর চাইতে একটা বেলি ড্যান্সের আয়োজন করলে আর দেখা লাগত না।

কথা শোনামাত্র ঝুলন চৌকিদারের চোখ ঝিকমিক করে উঠে, বিষয়টা আমাদের চোখ এড়ায় না এবং সেই ঝিকমিক করা চোখেই তিনি বিপুল উৎসাহে বলতে শুরু করেন, আমগো সময় ছিল অঞ্জু ঘোষ। বুঝলা না বিষয়টা! দশ মাইল পায়ে হাইট্টা সেই রূপসায় যাইতাম তার ড্যান্স দেখনের লাগি–ওরে বাপরে বাপ, যেই কোমর দুলানি–

অঞ্জু ঘোষকে আমরা চিনি না এবং তার কোমর দোলানো বিষয়ের অবতারণার পরও আমাদের চোখের কোথাও কৌতূহলের ছিঁটেফোঁটা না দেখে তিনি তার কথার রাশ টানেন। চারদিকে তাকিয়ে বলেন, পাখিগুলান য্যান এদিকে আগায়ে আসছে, খেয়াল করছ?

জমে ওঠা ইয়ার্কির শেষভাগে...

আচম্বিত একটা গন্ধ আমাদের কাবু করে ফেলে। সুগন্ধ? সুগন্ধই বোধহয়। গন্ধের আকস্মিকতায় আমরা এদিক-ওদিক তাকাই, হাসনাহেনা কি কাবেরির ঝোপ কিংবা খান কতক গন্ধরাজই ফুটেছে হয়তো, কিংবা একটা মৃগহরিণ, ভেঙে গেছে কারো আতরের শিশিই বুঝি বা–মোটকথা গন্ধের উৎস যাই হোক, আমরা সে গন্ধ নাকে যেতে কেমন অস্থিরতা অনুভব করে উঠি, সামনের টেবিলে শুয়ে থাকা এই অবয়বটি হঠাৎ কেমন যেন রূপ পালটে পাখি কিংবা মেয়ে কিংবা সেসব একেবারেই কিছু নয়–নিছকই 'কিছু নয়' হয়ে উঠতে থাকে। আমাদের মনে হয়, শোকসভার যাবতীয় কার্যক্রম এখনই শেষ করে ফেলা দরকার, রবীন্দ্র-নজরুলের যেসব লাইন মুখস্থ করে এসেছি আমরা, যেসব মোক্ষম দোয়া এবং জীবন-মৃত্যুর অমোঘ সম্পর্ক সম্পর্কিত গান আর শ্লোক বাছাই করে মকশো করে এসেছি আমরা–সহসা আমাদের মনে হয়, সব বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে ফেলা দরকার, এই এখনই : আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি মুসিবাতি..., আবৃত্তি করে ওঠা দরকার, এই এখনই : আসত মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়...!

মেঘ জমছে আরো গাঢ় করে। আকাশের রঙ কলিজায় ভয় ধরিয়ে দেয়া কালো। স্ত্রীর অষ্টম জাতের করল্লার নাম মনে না পড়ায় আতঙ্কিত ঝুলন চৌকিদারের ভারী মুখ, আমরা উসখুস করে উঠি, আমাদের মনে পড়ে বি,এ পাশ করে সেলুন আর চায়ের দোকানে কয়েক হাজার সকাল কয়েক হাজার বিকেল কয়েক হাজার সন্ধে কাটিয়ে ফেলেছি আমরা। হঠাৎ অনেকগুলো মুখ নিছক অকারণেই যেন ভিড় করে আসে আমাদের চারপাশে। ময়মুনা খাতুনের লালচে মুখটা কেন যেন মনে পড়ে এখন! কিংবা আছিয়া আক্তারের যে আমাদের ভিড় করে থাকা জটলাকে অবজ্ঞা করে পাশ দিয়ে যেতে যেতে চিকন স্বরে বলে উঠত, এক্সকিউজ মি, কিংবা দেখি মনে পড়ছে ফাতেমা বেগমকে যাকে দেখলেই মনে হতো ও সহজেই ভিড়ে যেতে পারত বোম্বাইয়ে, বিলকিস খানম মুক্তা বেগম আমেনা শরীফ ফুলবাহার চৌধুরি শর্মি পাল আলেয়া খাতুন–হঠাৎ এমন হুড়োহুড়ি লেগে গেল চারদিকে–আমাদের প্রাইমারির আমাদের সেকেন্ডারির সহপাঠিনীরা–যাদের মুখ গত চার'শ বছর ধরে আমরা দেখি না–যাদের মুখ সংসারের আবডালে হারিয়ে গেছে আমাদের সুখ-সুখ স্বপ্ন হতে–সহসা আমাদের মনে হয় এদের সাথে আমরা ভাগাভাগি করে এক কাপ চা খাইনি তো কোনোদিন, একটা অশ্লীল কৌতুক বলে খ্যা খ্যা করে হেসে উঠিনি তো, এক'শ মিলির বোতলে ঢোঁক ঢোঁক ভাগ করা পেনসিলে গলা মিলাইনি তো। এক ফুট দূরত্বের এক গজ চৌহদ্দির কাছে থেকেও ওদের ঘর ভরা সংসার–স্বামীর আদরের রাত, চড়-থাপ্পড় খাওয়ার ক্ষণ, কোলে-ঝোলে আঁকড়ে থাকা শিকনি-নাকের ন্যাদা-বাচ্চাদের জীবনে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে মুখ ও পেট ও নিতম্বে গোলতর হয়ে ওঠার সময়টাতেই বা আমরা কোথায়!

ময়মুনা বড়ো হয়ে ডাক্তার হতে চেয়েছিল, আছিয়া হতে চেয়েছিল ব্যাংকার, বিলকিস বিজ্ঞানী, মুক্তা ব্যবসায়ী, আমেনা ইঞ্জিনিয়ার, ফুলবাহার রাজনীতিবিদ, শর্মি গায়িকা, আলেয়া উকিল–আমাদের সেভেন ক্লাসের খাতায় লেখা অনেকগুলো 'এইম ইন লাইফ' রচনার পাতা সহসা পতপত করে বাতাসে উড়ে বেড়াতে শুরু করল। ঝুলন চৌকিদার আতঙ্কিত গলায় বলে উঠলেন, খাইছে রে, যেই বাতাস ছাড়ছে। কিন্তু আমরা তার কথায় কান না দিয়ে একটি একটি রচনা ধরে ফেলার বৃথা চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে উঠতে লাগলাম, আমরা কী হতে চেয়েছিলাম–সেই আকাঙ্ক্ষাগুলো কেন যেন একটিবারও মনে পড়ছে না দেখে ভীষণ আক্রোশে আমরা ধারাবাহিক লাফিয়ে যেতে লাগলাম, আর ভাবতে লাগলাম, এই গাঁয়ে একটি একাদশ আর দ্বাদশ আর বি,এ ক্লাস পড়ানো স্কুল থাকলে আমাদের সহপাঠিনীরা কি তাল-চটকানো সংসারযাত্রা বাদ দিয়ে হয়ে উঠত একেকজন কেউকেটা! সন্ধের মুখে একটি মৃত মুনিয়ার শরীরকে সামনে রেখে নিজেদের তিন'শ বছরের যাবতীয় শোক উগড়ে দেবো বলে আমরা যেসব বি,এ পাস বসে ছিলাম, হঠাৎ নিজেদের দিকে তাকাতে ভয় লাগতে শুরু করে আমাদের। পাঁচ ক্রোশ রাস্তা সাইকেলে, বাসে, ট্রাকের পেছনে উঠে অর্ধযুগ ধরে সেই কফিল উদ্দিন ডিগ্রি কলেজে গিয়ে কোনো কেউকেটা হয়ে উঠেছি আমরা এবং আমাদের বাল্যবান্ধবীরা নিজেদের জীবনের লক্ষ্য বাদ দিয়ে স্ব স্ব সংসারে স্ত্রী-মা-বউ সেজে গিয়ে হয়ে উঠেছে কেমন কেউকেটা–আচ্ছা, ওরা সব বেঁচে আছে তো নাকি দিব্যি চড়ে বসেছে চিতায়, শুয়ে পড়েছে সাড়ে তিন হাত গর্তে, ঝোলে-তেলে-আঁচে হয়ে গেছে ঘা উঠা কুকুরের মতো ন্যাড়া, মুত্রকাঁথা ধুতে ধুতে কড়া ফেলে দিয়েছে হাতে, অথবা হয়তো সোহাগে সোহাগে ফুলে-ফেঁপে উঠা পাছাটিকে মোড়ায় আটকে দিনের পর দিন রেঁধে যাচ্ছে পুঁটি মাছের ঝোল আর আমি অন্তু সোবান মিশু হারুণের মতো বাল্যবান্ধবদের জন্য একটি সম্মিলিত শোকসভা আয়োজনের কথা ভাবছে... এইসব ইত্যকার ইয়ার্কি, এইসব হিসেব-নিকেশ কেমন তাল পাকিয়ে যায় যেন সহসা, কেন জানি মনে হয়–মানুষের জীবন কেবলই ধোঁয়াশা, ধুর বাল... কিছু হইল এইটা...

তখনই বোধহয় বাকি দ্বিধা-দ্বন্দ্বটি পাকা হয়, টেবিলের ওপর ওটা একটি মৃত মুনিয়া, নাকি এনায়েত উল্লাহ চেয়ারম্যান কথিত 'একটি মাইয়া'–এই মীমাংসায় পৌঁছাতে না পেরে অক্ষমতার আতিশয্যে আমরা দিগ্‌বিদিক দিশাহীন হয়ে উঠতে থাকি। শোকসভা সম্পর্কিত আমাদের যাবতীয় প্রস্তুতির আগে এই মীমাংসাটা যে আগে করা দরকার ছিল, জানার দরকার ছিল পাখিরা মরে গেলে কোথায় যায়, কিংবা স্ত্রী-মা-বউ হয়ে গেলে বালিকাদের উন্নত বুকের কোন গহিনে লুকিয়ে যায় 'এইম ইন লাইফ'–সে কথাটি স্পষ্টত হয়ে ওঠে আমাদের কাছে! আমাদের বিহ্বল চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই, আমাদের আরো কাছে ঘিরে আসছে এক হাজার এক লক্ষ এক কোটি পাখি, ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে...

পাখিরা ডানা নাড়ছে, চঞ্চুতে শিষ উঠছে, নখরে গেঁথে আছে সারি সারি শুঁয়োপোকা, আর ওদের সম্মিলিত অগ্রযাত্রার মাঝখানে পড়ে পড়িমড়ি করে আমরা একে একে উঠে পড়েছি শোকসভার টেবিলে...

সেই শোরগোলের ভেতরে, আমরা শুনতে পেলাম, নিজের অপ্পো ফোনের স্ক্রিনে দ্বিতীয় স্ত্রীর গোলগাল মুখখানা দেখতে দেখতে আমাদের মধ্যে একমাত্র দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন ব্যক্তি ঝুলন চৌকিদার গেয়ে চলেছেন, কইন্যার চিরল বিরল চুল, তার কেশে জবাফুল, সেই ফুল পানিতে ফেইলা কইন্যা করল ভুল...

সহোদরা

সালেহা চৌধুরী

ঋতু আর মেঘ দুই বোন। দেখতে অনেকটা একরকম। তবে ঋতুর চুল কোঁকড়ানো এবং প্রচুর। মেঘের চুল লম্বা আর স্ট্রেট। দুজনের ভাব ও ঝগড়া দুটোই আছে। মা আনোয়ারা আলো মেঘের জন্মের সময় সারা আকাশে যে গভীর ঘন মেঘ জমেছিল সে কথা বলেন। বলেন–তুই যেদিন পৃথিবীতে এলি খুব মেঘ জমেছিল আকাশে। আমরা অবশ্য বৃষ্টির আশা করছিলাম। অগাস্টের গরম চলছিল খুব।

আর আমার জন্মের সময়? ঋতু প্রশ্ন করে। মা একটু ভেবে বলেন–ঋতুময় প্রকৃতি। বসন্ত ছিল সে সময়। বাগানে রডোড্রেনডনে লাল ফুল ফুটেছিল।

এরপর মা চুপ হয়ে যান। ঋতু খুশি হয়। বসন্তকালে আমার জন্ম! খুশি খুশি গলায় ঋতু বলে।

বাবাটা কথা নাই বার্তা নাই দুম করে মারা গেলেন। হার্ট এ্যাটাক হয়েছিল। এক এ্যাটাকেই শেষ হলেন মামুন হাবিব। আটোমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান। ব্রেন যার দারুণ শানিত। বিজ্ঞানী এবং নানা সব পরিকল্পনা। তার একটিকেও বাস্তাবায়িত করবার আগেই চলে গেলেন। তারপর থেকে একা মা। ওরা তখন য়ুনিভার্সিটির পড়া শেষ করে চাকরি করছে। এক বছরের বড়ো ঋতু একটা ব্যাংকে। বি বি করে চাকরি শুরু করেছে, বলে এম বি পড়ে সময় নষ্ট করতে চাই না। আর মেঘ ইংরাজিতে এম এ করে য়ুনিভার্সিটিতেই এক বছর হলো জয়েন করেছে। লেকচারার। ঋতু থাকে রাজশাহী আর মেঘ ঢাকাতে। বাবা চলে যাওয়ার পর মায়ের বোধকরি বাঁচার ইচ্ছা চলে গিয়েছিল। মেঘ বলে–বাবাটা ছিল মায়ের প্রাণভোমরা। ওই যে সেই গল্পটা প্রাণভোমরাটা লুকিয়ে ছিল না কোনো এক বাক্সে না কৌটোয়! তারপর একটু থেমে বলে–কেন এত তাড়াতাড়ি বাবাটা চলে গেলেন। ইস।

মেঘ ভালোবাসে ক্লাসিক। ঋতু রোমান্টিক। বা একটু হালকা বই। ওরা দুজনেই বাংলা ইংরাজি দুই ভাষারই বই পড়ে। ঋতু একটু গোলমতো। খেতে পছন্দ ওর। তাই উঠে পড়ে লেগেছে স্লিম হতে। মেঘ একেবারে স্লিম। ঋতু মেঘের মতো সোনার বোতাম নয় পড়াশুনায়। মেঘ একেবারে ব্রাইট আজ বাটন। মা বলেন–মেঘ বাবার মেধা পেয়েছে। ঋতু বলে–আর আমি?

আমার। মা জবাব দেন।

তুমি তো খুব ভালো ছিলে পড়াশুনায়। বলো না তোমার। তুমি একটুর জন্য ফার্স্টক্লাস মিস করেছিলে।

মা হাসেন। তাহলে কোনো পূর্বপুরুষের মতো। ওরা কেউ বিয়ে করেনি। মেঘ সহপাঠীকে ভালোবেসেছিল। সে এখন বাইরে গেছে পি এইচ ডি করতে। যদি মেঘ সুযোগ পায় যাবে। তবে পড়ানোর চাকরিটা ও বেশ উপভোগ করছে। বলে–আমার বাইরে যাবার ইচ্ছা নাই। ঋতু বলে–আমার ইচ্ছা আছে তবে সুযোগ নেই।

কেন ব্যাংকের কর্মকর্তাকে ধরে বাইরে পোস্টিং নে। নীরার ভাই চলে গেল ভিয়েতনামে। তুইও যেতে পারিস তেমন কোনো দেশে। ওরা দুজন দুজনকে নাম ধরে ডাকে। আর তুই তুই করে। সম্পর্কটা বোনের হলেও অনেকটা বন্ধুত্বের।

না রে মা'কে ছেড়ে যাব না ঋতু বলে।–তা ঠিক। মা এখনো যে প্রাণপ্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন সে তো আমাদের জন্যই। মেঘ থাকে মায়ের কাছে আর ঋতু রাজশাহীতে। প্রায় চলে আসে। তারপর দুইজনের নানা খুনসুটি নানা ঝগড়া। ভাব আর ভালোবাসা।

মেঘ বলে–ঋতু তুই কি করে ট্রাশগুলো পড়িস রে? ডানিয়েল স্টিল, জাকি কলিন্স যতসব! 'মিলস এ্যান্ড বুনস' সস্তা রোমান্স ভাবতে পারি না। বারবারা কার্টল্যান্ডও পড়তে দেখেছি। রুচি হয় তোর?

ঋতু বলে–আমাকে ছাত্রছাত্রী ভোলাতে বা বোঝাতে ক্লাসিক পড়তে হবে না। ডিকেন্স, ইবসেন, ব্রন্টি বোনেরা, জর্জ এলিয়ট, জেন অস্টেন এর ভারী ভারী বই। বই না থান ইট। অনেক আগে সবগুলো ক্লাসিকের ছোটোদের সংস্করণে কিছু পড়েছি। আর পড়বার দরকার নেই।

ছোটোদের সংস্করণ পড়েছিস এখন আসল বইটা পড়।

না আমার ওইসব ভারী বই পড়বার দরকার নেই। পঞ্চাশ পাতার 'মবি ডিকই গুড এনাফ'। ছয়'শ পাতা পড়বার ইচ্ছা নাই। টেলিভিশনে মেঘ যা দেখে ঋতু তা দেখে না। কাজেই ওদের দুজনার ঘরের টেলিভিশনে ভিন্ন প্রোগ্রাম। খেতে বসলেও দেখা যাবে মেঘ যেটা পছন্দ করে ঋতু তা নয়। ঋতু খানিকটা মাংশাসী। আর মেঘ মাছ আর সবজি। তারপরেও ওদের এইসব মিল অমিলের ভেতর আসলে গভীর বন্ধুত্ব। ঋতু অনেকসময় এক বছরের বড়ো বোনের দাবিতে এটা সেটা বলে। আর মেঘ কখনো তা শোনে। আবার কখনো শোনেও না। বলে–কানের কাছ দিয়ে বড়ো বোন।

কানের কাছ দিয়ে? পুরো এক বছরের বড়ো। তারপর হাসাহাসি। বারো মাস তিন'শ পয়ষট্টি দিন টাইমস। দুজনেই হাসতে থাকে।

তুই বিয়ে করবি না ঋতু? মেঘ প্রশ্ন করে মাঝেমাঝে।

কেন করব না। বিয়ের বয়স কি গেছে?

প্রেমট্রেমও তো করলি না। মেঘ বলে বন্ধুর মতো।

করে ফেলব একদিন ফট করে। কত লোকজন আমার ব্যাংকে আসে। বলে ঋতু। তারপর প্রশ্ন করে–তোর রুবায়েত কোথায় এখন?

ও চলে গেছে মিনিসোটাতে। আরও দুই বছর পর ফিরবে। আমি যাব না। চাই না বেচারি মা একা হয়ে যাক।

যেতে হলে যাবি। আমি চেষ্টা চরিত্র করে ঢাকায় বদলি হয়ে আসব। আদুরে গলায় মেঘ বলে–আমি মায়ের ছোটো। একেবারে বেড়ালের মতো কিনা। আমাকে ফেলে মা কি করে থাকে বল?

তারপর ওরা দুইজন নিজের ঘরে চলে যায়। বাড়িটা বাবার পরিকল্পনায় তৈরি। চারটে ঘর। মা বাবার একটা। ওদের দুই বোনের দুটো। আর একটা গেস্টরুম। বাবার পড়াশুনার জন্য একটা বক্স ঘর ছিল। এখন যা নানা হাবিজাবিতে ভর্তি। ওদের খুব ইচ্ছে আছে হাবিজাবি সারিয়ে ঘরটাকে মেঘের পড়ালেখার ঘর করবে। কোনো শ্রাবণ মেঘের দিনে মেঘ কবিতা বা গল্প লেখে। না হলে এমনই নানা মনের কথা। তবে সেটা এখনো হয়নি। মানে মেঘের সুমেরু পর্বতের ঘর। যেখান থেকে মেঘদূতের জন্ম। বাবা পুরো দুই হাজার স্কয়ার ফুটের এপার্টমেন্ট তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে কিনেছিলেন। এখন সেই দশতলার এপার্টমেন্টটাকে মেঘ ভীষণ ভালোবাসে। এখনো ওর বাইরে যাবার ইচ্ছা নাই। জানালা দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে রুবায়েতের সঙ্গে কথা বলে। সুন্দর সুন্দর বাণী পাঠায়। গান গেয়ে কখনো শোনায়। আর রুবায়েতের কবিতা আবৃত্তি শোনে। ভালোই চলছে ওদের দূরে থাকার সময়। মেঘ বলে–দূরে তুমি হৃদয়ে তুমি। নো প্রবলেম।

ছুটি শেষ হয়ে গেলে মেঘ আর মা'কে রেখে ঋতু চলে গেল। বলল–ঠিকমতো মা যেন ওষুধ খায় সেটা দেখিস মেঘ। মা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেললেন। একা একা রাজশাহীতে!

মা রাজশাহী! নর্থ পোল নয়। আর ঢাকা সাউথ মানে সাউথ পোল নয়। আমি এখন আর ছোটো নেই। আমার বয়স পঁচিশ। তবে তোমাকে মিস করি খুব। তারপরেও আমি আর হিমি একটা বাড়িতে ভালোই আছি। ও কলেজে পড়ায়। বিয়েটা ভেঙে গেছে ওর। আমার খুব খেয়াল করে। ঠিক একেবার আপামনির মতো। ও আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসবে মা। আনব?

কেন নয়। যে আমার মেয়ের দেখাশোনা করে সেও আমার মেয়ে।

মা আর কিছু বলেন না। মেয়ে মা'কে একটু বুকে জড়িয়ে তারপর চোখ মুছতে মুছতে চলে যায়। বলে–যদি পারি আবার ঢাকা চলে আসব মা।

তাই ভালো ঋতু। চলে আয়। তোরা দুইবোন একসঙ্গে থাক। ঝগড়া কর ভালোবাসাবাসি কর, একসঙ্গে।

সেটাই হবে। মেঘ রে চললাম। মেঘ ছলছল হয়। তারপর বলে–খুব তাড়াতাড়ি আবার আসিস।

চেষ্টা করব। ঋতু ওর কোঁকড়ানো চুলের পুরুষ্টু দু'দুটো বেণিতে একেবারে দারুণ দেখতে তখন। মেঘের চুল মায়ের মতো। বাবারও তাই। কেবল ঋতু কোঁকড়া চুল পেয়েছে। গোছা গোছা ঘন কালো এক পিঠ চুল। দেখার মতো।

এবার এলে আমি তোকে কুমড়োফুলের বড়া আর টুনা মাছের কাটলেট করে খাওয়াব। মেঘ বলে আদুরে গলায়। আর তারপর ছোটোবোনের আদর পেয়ে ছলছল চোখে হাসে।

ভালোই চলছিল সব। হঠাৎ করে ফোন এলো–ঋতু আমাদের মা আর নেই। মা'ও বাবার মতো হার্টের এক ম্যাসিভ স্ট্রোকে চলে গেছেন। ডাক্তার বললেন–এই স্ট্রোকের পর বেঁচে থাকলে একটা অঙ্গ বা ব্রেনটা আর কাজ করত না রে। ফোনের দুইপারে দুইজন কাঁদতে থাকে। তারপর কান্না থামিয়ে মেঘ বলে–বাবার পাশেই মায়ের কবরটা দিলাম। জানি আপাতত যে কাজে এখন মালয়েশিয়াতে তুই সেখান থেকে ফট করে আসতে পারবি না। তাই দেরি করলাম না। হিমঘরে মায়ের একটা মৃতদেহ পড়ে থাকবে ভাবতে পারি না। মনে মনে এও ভাবে প্রাণময়ী মায়ের মৃত মুখ দেখে খুবই ভেঙে পড়ার দরকার নেই ঋতু। তোর ভাবনায় জীবিত মা থাক, মৃত মা নয়। বলে ঋতু–আমি তাহলে কাজ শেষ করে দশদিন পর আসছি। তবে এই সময় আমি তোর কাছে নেই ভাবতে ভালো লাগছে না। একা কেমন লাগছে তোর?

আবুর'মা আছে। ছোটোখালা এসে চলে গেছেন। রোজদিন খোঁজ করেন। এই বিল্ডিংএর চারটে পরিবার সকাল সন্ধ্যা খোঁজ নেন। আমাকে নিয়ে ভাবিস না আপু। মাঝেমাঝে আদর করে বা ভালোবেসে ঋতুকে ও আপু ডাকে।

যখন মনটা একটু হালকা মনে হয় বাড়িতে মায়ের বাক্সপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে এক তাড়া চিঠি পায়। আলমারির মাথার উপরে যে বিশেষ বাক্সটা মা কাউকে খুলতে দিতেন না চিঠিগুলো সেখানে ছিল। ওদের বিয়ের তিন বছর পর লেখা। বাবা যে তিনমাসের জন্য আফ্রিকা গিয়েছিলেন চিঠিগুলো সেই সময়ে লিখেছিলেন মনে হয়। প্রায় সব চিঠিতেই একই সম্বোধন–আমার আনু কেমন আছো তুমি। মা নীল ফিতায় চিঠিগুলো বেঁধে রেখেছেন। একটা চিঠি খামের ভেতরেই রয়ে গেছে। কেন জানি সেই চিঠিটাকে আর চিঠিগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেননি মা। মেঘ কী ভেবে চিঠিটা খাম থেকে বের করে। পড়তেও শুরু করে ভূতগ্রস্তের মতো। পড়তে পড়তে জেগে ওঠে।

আমার আনু

তুমি বারবার একটা প্রশ্ন করতে। কেন আমি তোমাকে বিয়ে করেছি। তোমার ভাব হয়েছিল শ্রেয়াস আয়ারের সঙ্গে। যেমন হয় কলেজ য়ুনিভর্সিটিতে। ভারত থেকে বাবা মায়ের সঙ্গে রাগারাগি ছেলেটা এসেছিল বাংলাদেশে। পড়াশুনাও শুরু করেছিল। কিছুদিন পরে ড্রাগে ডুবে যায়। আর একদিন হুট করে মারা গেলে তুমি জানতে পারো পাঁচমাসের সন্তানসম্ভাবা তোমার। তুমি শুনেছ একটা ভালো পরিবারের ছেলে শ্রেয়াস। এর বেশি তেমন কিছু নয়। তবে সে নিয়ে তোমার মাথাব্যথা ছিল না। তুমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে। দারুণ এক সাহসী সিদ্ধান্ত। তুমি বাংলাদেশের প্রথম অবিবাহিত মা হয়ে সিঙ্গেল পেরেন্ট ফ্যামেলি হয়ে বেঁচে থাকবে। তোমার জীবন তুমি ও তোমার শিশু একা কাটাবে। 'কাউকে আমার দরকার নেই' এমনই কোনো

চিন্তা তোমার মাথায়। আমি এলাম তখন। আহা বুকটায় কী এক যন্ত্রণা অনুভব করলাম তোমার জন্য আনু। কী মিষ্টি দেখতে তুমি। কী ভালো একটি মেয়ে। কী সরল তোমার সবকিছু। কেবল এম এ পাশ করেছ। তোমার সিদ্ধান্তে মা-বাবা তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান না। আমি খুব ভালোবেসে ফেললাম তোমাকে। তোমাকে প্রথম কোথায় দেখেছিলাম মনে আছে? তারপর কোথায়? আমার কিন্তু সব মনে আছে। তুমি আমার ভালোবাসা বুঝতে পারলে। বললে–ঠিক আছে। কাঁদতে কাঁদতে বললে তুমি মানুষ না ঈশ্বর! আমি উত্তর দিয়েছিলাম–নেহায়েতই মানুষ। ঈশ্বর হলে তো ওই আকাশের রাজত্ব থেকে কেবল তোমাকে বরদান করতাম। বুকের ভেতর পেতে চাইতাম না। বিয়ে করে তোমাকে নিয়ে আমি চলে গেলাম সিঙ্গাপুর। কিছুদিন পর ফিরে এলে আর এক মেয়ের মা হলে তুমি। তুমি তো জানো আনু ঋতু আর মেঘ আমার কাছে সমান। আমি ওদের দুজনকে একইভাবে ভালোবেসেছি। ঋতু শ্রেয়াস আয়ারের নয়। ঋতুও আমার। মেঘও আমার। ওরা দুইজন আমার দুই চোখ।

পড়তে পড়তে রাত বাড়তে থাকে। ঝিম মেরে বসে থাকে মেঘ। ঋতুর বাবা তাহলে ওর বাবা নয়। বিজ্ঞানী মামুন হাবিব নামের বড়ো হৃদয়ের অনেক মজার বাবা! ঋতুর বাবা শ্রেয়াস আয়ার? সে কেমন করে হয়? হতেই পারে না। সে আবার মায়ের সেই কাঠের বাক্স ভালো করে খুঁজতে থাকে। বাক্সটা থাকত বড়ো আলমারির মাথার উপর। কোনোদিন সেটা কেউ খোলেনি। মা বলতেন–নানাসব দরকারি কাগজপত্র আছে। ওরা ভাবত জমি বাড়ির দলিলপত্র। খুঁজতে খুঁজতে ছোটো একটা লাল মখমলের ব্যাগে টুং করে একটু শব্দ হয়। লাল ব্যাগের ভেতর রুবি আর ডায়মন্ডের একটি এনগেজমেন্ট রিং। তখনো নতুনের মতো ঝকঝক করছে। আর একটি চিরকুটে শ্রেয়াস আয়ারের বোম্বের বাড়ির ঠিকানা। ওর বাবার নাম। সুশীল আয়ারের একমাত্র সন্তান শ্রেয়াস। যিনি একজন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। শ্রেয়াসের মৃত্যুর পর মা এই পরিচয় ও ঠিকানা পেয়েছিল তাঁর এক সহপাঠীর কাছ থেকে। সহপাঠীর এক টুকরো চিরকুটও আছে। আংটি? যেমন করে ডিসিশন নেয় কমবয়সি ছেলেমেয়েরা–চল আমরা এনগেজমেন্ট করি তেমন কি কোনো ঘটনা? এটা কি কোনো এনগেজমেন্ট রিং? হবে। কী এসে যায় তাতে? মা কেন এইসব জমিয়ে রেখেছেন? একদিন কি তিনি ঋতুকে বলতেন–কে তার বাবা? এবার মেঘ সোজা হয়ে বসে। না। শ্রেয়াস ওর বাবা নয়। ওর বাবা বিজ্ঞানী মামুন হাবিব। ওরা দুই বোন বাবার দুই হাঁটুতে বসে বাবা কাকে বেশি ভালোবাসে সে নিয়ে ঝগড়া করছে এই দৃশ্যটা এত বেশি উজ্জ্বল এর বেশি স্পষ্ট আর কিছু ও ভাববে না। যিনি সমুদ্র হৃদয়ে ভালোবাসার এমন একজন যাকে জানা হলে ভালোবাসার সঠিক অর্থ করতে পারে অনেকে। ঋতুর বাবা আর ওর বাবা একজন। অন্য কেউ নয়। হতেই পারে না।

সে কখন যেন সেই আংটি আর কাগজ দশতলা থেকে জানালা দিয়ে লেকের পানিতে ফেলে দেয় নিজেও বুঝতে পারে না। লেকের অথই পানিতে হারিয়ে যায় একটি আংটি আর একটি ঠিকানা।

তারপর? ঋতু এলে কেঁদে কেটে একটু স্বাভবিক হলে দেখায় বাবার চিঠি।

একা ঘরে। ঋতু প্রথম বারের মতো বুঝতে পারে তার গভীর ঘন কোঁকড়ানো চুলের উত্তরাধিকার। কোথা থেকে পেয়েছে সে। আর কিছু? না। মনে হয় না আর কিছু। তবে মা হয়তো বলবেন পিঠের লাল পদ্মটা জন্মসূত্রে ঋতু পেয়েছিল সেটাও উত্তরাধিকার। মা কী এই কারণে এক টুকরো ঠিকানা জমিয়ে রেখেছিলেন? কে বলবে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য মা নেই। জীবনের সেই বিশাল ভালোবাসার পাশে ঘুমিয়ে আছেন। এবং এই হলো মায়ের সব চাইতে পছন্দের জায়গা। সারাজীবন ধরে যা তিনি প্রতিদিন জেনেছেন।

আপু। দরজায় আঘাত করে মেঘ। ঋতু মেঝের কার্পেটে শুয়ে আছে একটা বালিশ টেনে। ওর বাবাকে মনে পড়ছে। শ্রেয়াসকে নয়। বাবাকে। কখনো বাবা চুপচাপ কাজের ফাঁকে মেঘের কান আর চোখ বাঁচিয়ে ঋতুর গালে টুক করে চুমু খেয়ে বলছেন–তোকে বেশি ভালোবাসি ঋতু। খবরদার মেঘ যেন জানতে না পারে! মেঘ এসে পাশে বসে। তারপর বালিশ টেনে সেও শুয়ে পড়ে। একটু আদর করে আপুকে। তারপর বলে–ঋতু কী এত ভাবছিস রে। তুই আর আমি মায়ের ওইটুকুন পেটের ভেতর নয়মাস করে ছিলাম। তুই যখন বেরিয়ে এলি আমি সেখানে ঢুকে গেলাম। বলেই হাসে। আহা। কেমন করে আমাদের জায়গা হয়েছিল অতটুকুন পেটে? আমদের দুইজনের পরিচয়ে এই কি অনেক নয়? আর কোনো কিছু জানার দরকার নেই। তুই আর আমি সহোদরা।

একটি ঠিকানা আর একটি আংটি আমি ফেলে দিয়েছি। রাগ করিস নি তো?

ঋতু কাঁদছে। বলে–না। বাবা, আমাদের বাবাকে আমার খুব মনে পড়ছে।

আমারও। মেঘ বলে। আমার সবসময় মনে হতো বাবা তোকে বেশি ভালোবাসে। খুব ঈর্ষা করতাম তোকে। মনে আছে একবার তোর চুল টেনে খুব...। বলেই সে হাসতে হাসতে কাঁদে। ঋতুও।

দুই সহোদরা হৃদয়ের শব্দের ভেতর পাশাপাশি শুয়ে কী ভাবছে কে জানে।

কবিতা

ভাষার অহংকার

আফিয়া বেগম শিরি

বাংলা আমার মাতৃভাষা আমার অহংকার
অগণিত প্রাণের রক্তের বিনিময়ে কেনা অধিকার
জন্ম থেকে যে ভাষায় কানে বাজে ধ্বনি
মা বাবা ডাক শিখেছি সুরে মধুর বাণী
বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে যে ভাষার জ্যোতি
পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম আন্তর্জাতিক খ্যাতি
যেখানে যাই সাথে আছে আঞ্চলিকতার সুর
মনে আসে আত্মতৃপ্তি হই যে বিভোর
যে ভাষার সুর ছন্দে প্রাণে জাগে শিহরণ
শিরা উপশিরায় মিশে আছে সে ভাষার বন্ধন
মা মাটি মাতৃভূমি স্বপ্ন আমার আশা
মেধা মননে লালন করি মায়ের মুখের ভাষা
চলনে বলনে আদান প্রদানে মাতৃভাষার তরে
কী যে এক প্রশান্তি জাগে ভেতরে বাহিরে
প্রবাস জীবন মোদের তবুও দেশের প্রতি
ভাষার জন্য মমত্ববোধ আছে স্বজনপ্রীতি
যত দুর থাকি না কেন স্বদেশের টানে
বারবার ছুটে যাব শেকড়ের সন্ধানে।

আমরা কেউ নয় আপন কারো শুধুই প্রয়োজন

ইমদাদুন খানম

আপন আপন করে পাগল তুমি কেন ওরে মন?
এমন কেউ আছে কি এই দুনিয়ায় বলতে পারো তোমার আপন!
আমি সত্যি কি তোমার মনে হয় ছিলাম আপন!
তুমি কি আমার কখনো ছিলে কিংবা হবে আপন?
আমরা কেউই নয় কিন্তু কারো আপন,
আমি তুমি একে অন্যের জীবনে চলার পথে জেনে রেখো শুধুই একে অন্যকে প্রয়োজন!
আপন যে জন সত্যি সে শুধুই করিবে তোমার প্রতি ভজন যতন।
সেদিন হারিয়ে যে গিয়েছে কখন সময়ের তরে বুঝিনি আগে আমি তখন।
রক্তের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে দিনে দিনে স্বার্থের জন্য যেমন,
আমরা অর্থের, স্বার্থের নাম যশ এগুলির বিনিময়ে করে নেই একে অন্যকে এখন আপন।
ঘুরি তাই স্বার্থের জন্য তাদের পিছন পিছন।
আমরা কালের পরিবর্তনে বদলে গেছি বুঝতে পারি না
আসল নকল কি চিনতে ও চাই না এখন।
আমরা তো কেউ কারো নয় আপন!
তোমার আমার একে অন্যের ছিল কি কখনো কোনো মায়ার বন্ধন!
শুধুই চলার পথে আমাকে তোমার তোমাকে আমার যখন লাগবে,
তখনই প্রয়োজন করে কিন্তু আমাদের আপন।
বাস্তবতা দুনিয়ার আজকাল হয়েছে বিষম আজব কঠিন,
শুনতে তেতো লাগলেও সত্যি বলতে জন্মদাতা পিতা-মাতা কি এখন,
বুড়ো বয়সে সন্তানের কাছে থাকেন আপন?
না হয় বৃদ্ধাশ্রমের দ্বারে কেন যেতে হয় বৃদ্ধ বয়সে আমাদের মা-বাবা,
করে কি সন্তান তাঁদের বারণ?
হৃদয়ের আবেগ নিয়ে একবার ভাবি এবং ভাবুন?
তিলে তিলে দুঃখ নিয়ে কেন কিছু মা-বাবার বৃদ্ধাশ্রমে এমনই হয় তাঁদের মরণ!
এ জগতে সকলই আমরা এখন হয়ে গেছি পর কেউ কারো নয়তো আপন।
তাই কাউকে ভেবো না কখনো আপন
করে তোমার নিজের জীবন বিসর্জন।

মা

এম মোসাইদ খান

তুমি যখন বলো, ভালো থাকিস,
সুতায় তীব্র টান পড়ে মা!
কী করে ভালো থাকি তোমাকে ছাড়া,
নিঃশব্দ জড়িয়ে ধরে আহত গলা ।

তোমাকে ঘিরে ভালো থাকে বাড়ির গাছপালা
ঘর-গেরস্তি
পিতার রেখে যাওয়া রোদের সংসার।
তোমার পা ছুঁয়ে ভালো থাকে বাড়ির উঠান, পুকুরঘাট,
তোমার স্পর্শ পায় ঘরের চৌকাঠ, বিছানা বালিশ
আমার ভাগ্যে কেবল, শিকে ছিঁড়ে না!

তুমি যতবারই বলো, ভালো থাকিস
বড়ই দহন লাগে মা!
কী করে ভালো থাকি তোমাকে ছাড়া,
শূন্য ব্ল্যাকবোর্ড আঁকড়ে ধরেছে প্রবাসজীবন।

কালো নারী

কাবেরী মুখার্জী

অন্ধকার গর্ভে জন্ম নেয়া, কৃষ্ণাঙ্গ নারী,
রাত্রির অনন্ত কুহেলিকার রচয়িতা যেন
তার দেহের প্রতিটি ভাঁজ শিল্পায়িত অপরূপ মুগ্ধতায়,
অনাহুত স্পর্শে সে জেগে ওঠে আলোকদীপ্তে,
প্রজ্বলিত অগ্নিস্রাবে।

নিঃশব্দ কবরস্থানের শীতার্ত পাতাহীন রাতে
তার পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়
শেয়ালের চোরা চোখে।
ধোঁয়াটে হয়ে যায় ভাসমান অন্ধকার
দৃষ্টি বিদ্ধ করে ত্বকের নিচের দুর্বলচিত্ত
হাড়গোড় ভেঙে যায় তার স্পর্শে।

তুষারের শুভ্রতা তার গভীর কালো প্রান্তর জুড়ে
শুধুই একঝলক ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।
সে কালো, জন্ম থেকে শিরার অন্তঃস্থল অবধি কালো,
পৃষ্ঠ হতে হৃদয়ের সর্বাগ্র কালো
নির্জীবতার কালো নয়, কৃষ্ণগহ্বরের মতো কালো নয়
তবুও সে কালো বরং শিকড়ের উর্বর মাটির মতো কালো।

কালো, কৃষ্ণাঙ্গ নারী, গোমেদের মতো চকচকে,
ধ্বংস করে যা কিছু অবাঞ্ছিত, নেতিবাচক।
সে কালো, কারণ সে শোষণ করেছে সকল রঙ,
রঙিন মুখ এবং রঙিন সুখ,
সকল নীলচে আবির নিয়েই সে কালো,
যে বুনে যায় ভবিষ্যতের বীজ,
তার কালো অন্ধকার ব্যাপ্ত স্বপ্নেরা খুঁজে পায়
সূক্ষ্ম আলোর গন্তব্য।
কালো নারীর কালোছায়ার ভেতরে রচিত হয়
আলোকিত নতুন গল্পের অধ্যায়।

নিঃশব্দ হ্রদ

গাজী ফজলে রাব্বী

প্রিয়, পৃথিবীতে একটা নিকৃষ্টতম অধ্যায় আছে তোমার জন্য–
যেটা ফণা তুলে বসে আছে তোমার সুখকে
বিষাক্ত ছোবল দিয়ে আড়ষ্ট ও নষ্ট করে ফেলার জন্য।
কিন্তু জীবন তোমার জন্যে এমন এক ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যবস্থা রেখেছে–
যা তোমার সুখ ও আনন্দের বন্ধনী হিসেবে কাজ করে, যাকে ভেদ করে জাগতিক হিংস্রতা ও
জিঘাংসা তোমাকে আঘাত করলেও তোমার মর্মমূল থাকবে অক্ষত–কারণ সেই বন্ধনী,
যা আগুন আর জল দিয়ে তৈরি তা তোমার আত্মার অন্তঃপুরে
তার কোমল ও একইসাথে কঠোরতম উপস্থিতি নিয়ে আসীন।
আর সেই ব্রহ্মাস্ত্র তুমি নিজে,
যে তোমাকে পর্যাপ্ত আগুনটুকুর প্রয়োজনীয় উষ্ণতা গ্রহণ করে
দাহ্য অবশেষকে প্রতিহত করতে সক্ষম।
এটা তুমিই–যে প্রতিটি উপস্থিতি থেকে নিজেকে জড়ো করে
একটা জীবনকাল অতিবাহিত করে।
তোমাকে কেউ সাহায্য করতে পারে না,
যতক্ষণ না তোমার আত্মব্রহ্মের আগুন নিজের থেকে জ্বলে উঠে।
পৃথিবী তোমাকে দেবে এক কণ্টকিত শয্যা
কিন্তু তোমাকে শুতে হবে এমনভাবে, যেন তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারো।
আর একটাও কাঁটা তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে।
তোমার উপস্থিতির সাথে মিলনে সক্ষম,
এমন উপাদান তুমি প্রকৃতিতে পেয়ে যাবে–
যা তোমাকে শারীরিকভাবে আরও সক্ষম ও পূর্ণ করে তুলবে।
ঠিক যেরকমভাবে একজন মানুষ ভালোবাসার মানুষকে খুঁজে পায়।
তুমি জীবনকে এমনভাবে আস্বাদ করো–
যেমন এক সুখী পাখি যুগলের জীবন কেটে যায়।
তুমি জলে সাঁতরাও মাছরাঙা ও বকের মতো
আকাশে উড়ো ঈগলের মতো, জঙ্গলে ছুটে বেড়াও ভীরু হরিণের মতো।
আমি তোমাকে সারা পৃথিবীর পক্ষ থেকে সুখ ও আনন্দের নিরাপত্তা দিতে পারি না
কিন্তু আমি নিশ্চিত করছি, আমি অবশ্যই তোমার জন্যে
আমার সর্বোত্তম জীবনকে উৎসর্গ করব।
এবং সমগ্র জগৎ তোমাকে বিদ্বেষের ছোরা দিয়ে ঢেকে
দিলেও–আমি তোমাকে আমার ডানার ভিতরে রাখব।

দূরে ঠেলে দাও

তাবেদার রসুল বকুল

তোমাকে বুকে জড়িয়ে রাখতে চাই
বুকে টেনে নেবো আদর করে
তুমি চাইলে তোমার শরীরের গন্ধ নেব।

তুমি চাইলে লংড্রাইভে যাব
হাওয়ায় মিশে যাব দুজন।

তুমি চাইলে না
অভিমান দেখালে
দূরে বহুদূরে চলে গেলে
তুমি এতটাই দূরে গেলে
হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যায় না।

কেন এত দূরে থাক
কেন বুকের মাঝে বাস কর না
কেন আমাকে দূরে ঠেলে দাও বারবার।

আদি ইরম অ্যান্ড সন্স
স্থাপিত ১৯৭১

মুজিব ইরম

এ দোকান প্রাচীন দোকান, নয়া ভেবে ভুল করিও না।

একদা আমিও লিখিয়াছি বটে–এইখানে রাজনৈতিক আলাপ নিষেধ, আজকাল
মুছিয়া দিয়াছি।
আলাপ করিও তোমার অধিকার, প্রতিবাদ, তোমার চেতনা, প্রেমের দোকান আমি
খুলিয়াছি।
বহুবার। করিয়াছি প্রেমের বেসাতি। এ দোকান কিছুটা আলাদা। লোকে বলে ব্যর্থ
লোক, ব্যর্থ
মহাজন। তবু আমি খুলে রাখি দোকান আমার। মূল্যহ্রাসে নিজেরে বিকাই। তুমিও
আসিও তবে
সখিসনে। আলাপ করিও প্রেম, রাজনীতি, অধিকার, বাসনা তোমার।

এমন দোকানি আমি, বারবার ফতুর হয়েছি। আমি তো তোমার
আশে নিয়ত রয়েছি।

আদিপূর্বের উচ্চারণ

শাহ সোহেল

আমার আদিপূর্বে উচ্চারিত আওয়াজের
ধ্বনিত নাম অ আ খ ধ।
যা দিয়ে সোনালি পেশির সুপুরুষেরা
বলতে শিখেছিল-ধান দূর্বা দুধ!
হাজার হাজার বছর আগে যার
সাথে দেখা শুনা হয়েছে আমার
ভালোবেসেছি তারে
বাসরের বউয়ের লাখান
সেও মিশেছিল এমন, মা
হারা তিতর শাবকের সমান
যেন তাতে আমি-আমাতে সে বহমান।

বুনেছি স্বপ্ন; মাটিতে এঁকেছি বলাকাঘর
হাওয়া আর জলে অতল ভেসেছি নিরন্তর
যতই বড়ো হই–ততই না বাড়ে গড়াগড়ি আমাদের
প্রেম দেখে ফোঁড় ধরে শকুনের ক্ষুধার্ত বুকে
চিলিকে জাপটে ধরে বিলাতে চিড়িয়ার আহার
যেন কেউ হাত দিয়ে টেনে নিল কলিজার থোড়
পেতে দেই আহত সিনার পাটা;
কইতে পারি না কিছু আর...ধূমায়িত
অন্ধকারে চোখ মেলে দেখি
রক্তাক্ত বাহু জঙ্গলে জড়ায়েছি তারে!

নিস্তব্ধ বাঁশির সুরে যতটা চন্না ঘোরে
আগুনের লাভা হয়ে লেপটে আছে সিঁদুরের লাল
নিরাই পড়ে আছে আমার-ছালাম বরকত রফিক ও জব্বারের লাশ।
যে ফাল্গুনে পাখি ডাকে–কোকিল শোনায় কণ্ঠের অমৃত সুধা;
জংলায় যৌবন আসে,
যৌবনে ফিরে সুখের ধারা।

আটে তার ভেঙে পড়ে আঠারো পর্বত
অভাগি মায়ের আহাজারি–আকাশ বাতাসে করে ফেরি
ভাই বোন বাবার কান্নারোদনে কাশবন নুয়ে পড়ে।

তারপরেও রুখে দাঁড়াই, উঠে দাঁড়াই
বাংলায় বলি কথা ,বাংলা আমার ভালোবাসা
প্রাণখোলা মমতা।

বাংলায় লিখি প্রেমের চিঠি
বাংলায় ডাকি মা
বাংলায় কহি খালা পিসি
বাংলা অন্নদা

বাংলায় হাসি বাংলায় কাঁদি
বাংলায় করি পণ
যতবার আসি ততবার যেন
বাংলাতে হয় মরণ।

রোমাঞ্চিত আক্ষেপ

শামীম আহমদ

রোমাঞ্চিত আক্ষেপ আর দ্রবীভূত ঘুম এক হয়ে ওঠে আসে
মৌন সম্মতি, যখন প্রেম আত্মহত্যা করে সহবাসে! ও মৃত্যু তুমি নপুংসক
এই শহরে গণিকার বেশে
খদ্দের সেজে ওঁৎ পেতে থাকো যখন শহর ঘুমিয়ে পড়ে
সময়ের কাঁধে, মাছের চোখের মতো জ্বলে
তারা সারারাত...

গ্রীস্মের ফোটা ফোটা তারা, নদীর গর্ভ থেকে ভেসে আসা থেঁতলে যাওয়া আলো
তার উপর পৃথিবীর দীর্ঘশ্বাস বৃংহণের মতো মনে হয়
আবার সন্ধ্যায় মিশ্রিত আকাশ দিনের শেষে
ডুবে যায় অনুভবের গহ্বরে ঐ মৃত্যুর মতো রোমাঞ্চিত আক্ষেপে ।

নোনতা জল

সাব্বির আহমেদ

আমি মরে গেলে তোমার কিই'বা আসে আর যায়,
তুমি আছ গো তোমার মতো ভীষণ স্বার্থপরতায়।
আমি কাঁদি নীরবে সংগোপনে তোমার অট্টহাসি,
দুঃখগুলো নিত্য সঙ্গী নয়ন জলে ভাসি।
তুমি থাকো স্বর্গসুখে আমি জাহান্নামে,
সুখগুলি সব কিনে নেব আমার সুখের দামে।
আমি আছি যেমন তেমন তুমি থাক মহাসুখে,
মরে গেলেও তোমার স্মৃতি থাকবে আমার বুকে।

পরাভূত সময়ের গুপ্তঘাতক

সৈয়দ রুম্মান

ধড় থেকে মাথা, হাত থেকে আঙুল, পা থেকে গোঁড়ালি–খুলে খুলে পড়ছে আগুন, ধ্বসে পড়ে আকাশের ইট-সুড়কি, বালি...নদী ও সাগরে পাখিদের ঘর-গেরস্থালি, ভিনগ্রহ থেকে উড়ে এলো এক ঝাঁক সারস–তাদের ঠোঁটে বসানো বাঘের দাঁত, বিড়ালের কিম্ভুতকিমাকার চোখ...

রাস্তার প্রতিটি ল্যাম্পপোস্ট তাক করে রেখেছে ধনুকের ছিলা...দলে দলে মানুষ ও মানুষের বাচ্চারা সদম্ভে মুখোমুখি হচ্ছে রকেট লঞ্চারের। পুরুষদের জরায়ুতে নিষিদ্ধ পরাগায়নের স্রোত, নারীরা অনির্বাণ শিশ্নে আছে ধর্ষকের ভূমিকায়।

রীতিহীন রীতির দৌড়ে নিওলিথিক অতিক্রান্ত রেনেসাঁস অর্জন করেছে শ্রেষ্ঠত্বের বীভৎস-মুকুট। সামনে এগিয়ে আসে একদল শামুক চিবিয়ে খাওয়া মানুষ। ভোজনের শেষে সবার বিষ্টা মাখা হাত।

জলবায়ু বন্দি নিজস্ব অ্যাকুরিয়ামে। ভোরগুলো উঁকি দেয় আনত সন্ধ্যায়। ঘর্মাক্ত রাতের শেষে লব্ধ নিদ্রায় দুপুরগুলোতে ডেকে ওঠে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝিঁ ঝিঁ পোকা। সময় হয়ে যায় ঝুলে থাকা বাদুড়।

রুদ্ধ হয়ে আসা নিঃশ্বাস বারবার বিষম খায়। কণ্ঠনালী চেপে ধরে এক বন কাশফুল। হাঁচির আওয়াজে পাড়ি দিই ভিন্ন গোলার্ধ্ব। স্পর্শেই যত্রতত্র প্রোথিত হয় নিজ নিজ নিবাস। জড় ও জীবের পার্থক্যে থাকে অনুশোচনা। তরুণাশ্রমে বৃদ্ধরা শাসন করেন সর্পের ফণায়।

এরই মাঝে দমকলবাহিনী বিশস্ত্র অশান্ত সাগরে। পেছন থেকে হেঁটে আসে ভার্জিন ট্রেইন; আকাশপথে সোজা ঢুকে পড়ে দাবানলের মলদ্বারে। পাখিদের পালকগুলোতে চিকচিক করে হীরার নোলক। কোরাস সংগীতের নামে শুরু হয় ভাদ্রের শীৎকার। আর থুথু ঢেলে লেখা হয় সঞ্চিতার সঞ্চয়িতা। স্বপ্ন-ব্যাখ্যা হয়ে ওঠে নপুংসক ধারাপাত।

ধীরে ধীরে লরেল সমর্পণ করে জিউস এসে কুর্নিশ করেন আর হেলেন প্রার্থনা করে রমণ-সজ্জা। আলোর আধারে অন্ধকার চলে যায় দীর্ঘ কারাভোগে। কোহিনুরে নিজের নবাবিকে খামচে ধরতে ধরতে দেখি সীতার সলাজ উপস্থিতি। আবাবিলের ভিড় ঠেলে শুরু হয় ত্রিকাল ঘূর্ণন।

হঠাৎ পুনরুত্থানে বন্দি হই সহজিয়া আপন দৈর্ঘ্যে। চোখের পাপড়ি ভেদ করে শুরু হয় রশ্মি বিকিরণ। হাত কচলানো দৃশ্যপটে অনুসন্ধিৎসু চেতনায় তড়িৎ সূঁচের উৎসমুখ...নগ্ন রেটিনায় বিস্মিত হয়ে ওঠে পলায়নপর একটি পুরুষ্টু ছারপোকা–পরাভূত সময়ের গুপ্তঘাতক!

আর উদ্‌গত ঘামে চুবিয়ে থাকে অতৃপ্ত রতি-সম্ভোগের দেহ...পেরিয়ে যাওয়া ব্রহ্মাণ্ড চেপে বসে টাইমমেশিনে। বিলোড়িত ইন্দ্রিয়ের হোঁচটে কাঁপে হাত; আবারও মানুষের যুদ্ধে তবু খুঁজে ফেরা ডিস্টোপিয়ার রাত–পরবর্তী ধ্যানগৃহে পড়ে থাকে উপক্রমণিকাহীন শূন্য তৃষিত গেলাস!

বঙ্গ

সৈয়দ মাসুম

বাংলায় কথা বলি বাংলায় দেখি স্বপ্ন
বাংলার বুকে জন্মেছি বলে
নিজেকে মনে করি ধন্য।

পদ্মা মেঘনা যমুনা সুরমা শীতলক্ষ্যার তীরে
অস্তিত্ব আমার নিরবধি আছে আবহমানকাল ধরে

বাংলার সুখে হাসি আমি বাংলার দুঃখে কাঁদি
বাংলার বুকে আসলে আঘাত শক্তহাতে রোধী।

গায়ে মাখা আমার ধূলি বালি বাংলার
ধান পাট আর সর্ষের উদ্ভট গন্ধ
বাঙালি যে আমি আমার দেশ সুজলা সুফলা বঙ্গ।

শেষ নিঃশ্বাসের আগে

সফিয়া জাহির

এক আঁজলা জলের মতো শেষ জীবনের আয়ুটুকু হাতে নিয়ে আয়ুর্বেদিক ঔষধ সেবন করে বলি জীবনকে উপভোগ করি। হিসেব-নিকেশের খাতাটি ছুড়ে ফেলে ভুলে যেতে চাই সব ব্যর্থতা, চাওয়া-পাওয়া। বাকিতে ফাঁকি, বিশ্বাস না হলেও এখন বুঝি কি ভুলই না করেছি। নিজের বুকের নিঃশ্বাস চেপে ধরে সমস্ত অক্সিজেন দিয়েছি বিলিয়ে। বেলা শেষে দেখি কার্বন মনোক্সাইডে ডুবে আছি। সংসারে জলোচ্ছ্বাস ও ঝড় ঠেকাতে নিরাপত্তা বেষ্টনী দিতে গিয়ে শুকিয়ে গেছে শরীরের হাঁড়। লাম্বার স্পাইনাল স্টেনোসিস ও সায়াটিক ব্যথায় জেগে উঠে মধ্যরাত। জীবনবীমার প্রয়োজনবোধ করিনি কখনো, ভেবেছি স্বপ্নপূরণ ও বাধ্যবাধকতার অনুভূতিই সত্য। শীতল কফিনের শরীর উপেক্ষা করে অহংকারে দিয়েছি ডুব, কে জানত তা এক পরাভব। মৌনতা দেখে সবাই ভাবে আসলেই সে বড়ো দুর্বল, হেরে গেছে, একেবারে হেরেই গেছে। বুকের ভেতর পাথরচাপা কষ্ট নিয়ে ত্যাগী মন বলে যায় সঙ্গ চাই, চাই ভালোবাসা। ব্যস এটুকুই, এর বেশি কিছু নয়।

প্রবন্ধ

দুঃখের আরেক নাম কবি হেলাল হাফিজ

নাজরাতুন নাঈম ইসলাম

জনপ্রিয়তা আনন্দের আবার কখনো জনপ্রিয়তাই শিল্পীর উপর চাপিয়ে দেয় বিশাল দায়বদ্ধতা। আধুনিক রোমান্টিক কবি হেলাল হাফিজের 'যে জলে আগুন জ্বলে' বইটি যখন প্রথম বইমেলায় আসে তখন কাব্যপ্রেমিকদের তুমুল উচ্ছ্বাসে নন্দিত হয় বইটি, পরবর্তীতে পরপর তেত্রিশটির বেশি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং প্রত্যেকবার পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে। কবি শেলী বলেছিলেন–

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. কবি হেলাল হাফিজ ও তার কাব্যের আড়ালে থাকা কষ্ট আর বেদনাকেই বারবার স্মরণ করেছেন। কবি প্রেম, বিরহ, বিচ্ছেদ নিয়ে বিস্ময়কর চমৎকার পঙ্‌ক্তিমালা রচনা করেছেন। "প্রেম মূলত মিলনে মলিন হয় বিরহে উজ্জ্বল" এটা কবি হেলাল হাফিজের কথা। প্রেমের চেয়ে বিরহবেদনা, অপ্রাপ্তি হলো শিল্প সৃষ্টির বিমূর্ত চেতনা। লেখক হেলাল হাফিজ তাঁর জনপ্রিয় মৌলিক কাব্যগ্রন্থ "যে জলে আগুন জ্বলে" প্রকাশের পর দীর্ঘ কয়েক বৎসর আর কোনো কবিতার বই প্রকাশ করেননি। কবিতা লিখেছেন কিন্তু বই আকারে প্রকাশ করেননি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন কোনো অভিমান নয় এক ধরনের সীমাবদ্ধতা তিনি বোধ করতেন। "যে জলে আগুন জ্বলে" বইটির প্রতিটি কবিতা যেন হৃদয়ের গভীরতম স্তরের অনুভূতির অণুরণিত আর্তনাদ। কবি হেলাল হাফিজ অবিরাম কবিতা লিখতেন কিন্তু তাঁর মনে হতো যে উৎকর্ষ ভাব, যে মধুরতম বাক্যবিন্যাস করা তাঁর প্রতিভার পক্ষে সম্ভব সেটা হয়ে গেছে "যে জলে আগুন জ্বলে" গ্রন্থের নির্বাচিত মৌলিক কবিতায়। সেই গ্রন্থের প্রতিটি কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা কষ্টিপাথরের মতো প্রগাঢ়। পরবর্তীতে যা কিছু তিনি লিখছেন তা সেই উজ্জ্বলতার কাছে ম্রিয়মাণ।

কবি হেলাল হাফিজ সাতই অক্টোবর বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া উপজেলার বড়তলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি সম্প্রতি ১৩ই ডিসেম্বর ২০২৪ সালে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কবি হেলাল হাফিজের মায়ের নাম ছিল কোকিলা বেগম আর বাবার নাম খোরশেদ আলী তালুকদার। তিন বৎসর বয়সে

কবি মাতৃহারা হন। যখন স্কুলে যাবার বয়স হয় তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়, ক্লাসের সময় তিনি পড়তেন আর বাকিটা সময় খেলাধুলা করে কাটাতেন। স্কুলে তিনি ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, লন টেনিস খেলতেন। ঐ সময়ে খুব কম ছাত্র টেনিস খেলত, হেলাল হাফিজ সেই ছোটো বয়সে লন টেনিস খেলা শিখেছিলেন।

হেলাল হাফিজ যে স্কুলের ছাত্র ছিলেন সেই একই স্কুলের জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন তার বাবা। কবি স্কুলের ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেতেন। উনার শিক্ষক বাবাকে সবাই পাগড়িওয়ালা স্যার বলতেন কারণ তিনি রঙ্গিন পাগড়ি পরতেন। হেলাল হাফিজ অনেক বই পুরস্কার পেতেন কারণ তখনকার দিনে স্কুলে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের বই উপহার দেয়া হতো। সেই বই তিনি লাইব্রেরিতে জমা দেয়ায় উনার বাবাকে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ আজীবন সদস্যের সম্মাননা দিয়েছিলেন। হেলাল হাফিজ বলেছেন এটি ছিল তার কাছে খুবই আনন্দের। স্কুলে পড়াকালীন সময়ে তিনি লেখালেখির ব্যাপারে তাঁর শিক্ষক বাবার প্রেরণা পেতেন। এ ছাড়াও স্কুল শিক্ষিকা সবিতা সেনের উৎসাহ উদ্দীপনা কবিকে সৃজনশীল মানুষ হিসেবে তৈরি করেছে। লেখক হেলাল হাফিজ কবিজীবনের উন্মেষপর্বে স্কুল শিক্ষিকার অবদানের কথা বিভিন্নভাবে বারবার স্মরণ করেছেন।

যখন স্কুল পেরিয়ে কলেজে উঠলেন তখন হেলাল হাফিজের মনে হলো তাঁর একাকীত্বের যন্ত্রণা খেলাধুলা ঘুচিয়ে দিতে পারছে না। তিনি আরও বেশি কবিতা লিখতে শুরু করলেন, দেখলেন এই সৃজনশীলতা তাঁর বেদনাকে অনেক প্রশমিত করছে। তাঁর কবিতায় আমরা কষ্ট নিয়ে পাই অনেক উক্তি। তিনি লিখেছেন–

> "কষ্ট নেবে কষ্ট।
> প্রেমের কষ্ট
> ঘৃণার কষ্ট, নদী এবং নারীর কষ্ট
> অনাদর ও অবহেলার তুমুল কষ্ট,"
> আরও বলেছেন–
> "দুঃখ তো আমার
> সেই জন্ম থেকে জীবনের
> একমাত্র মৌলিক কাহিনী।
> আমার শৈশব বলে কিছু নেই
> আমার কৈশোর বলে কিছু নেই,
> আছে শুধু বিষাদের গহিন বিস্তার।"

হেলাল হাফিজ মেডিসিনে পড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু এইচ এস সি পাস করে যখন তিনি ঢাকায় আসলেন ভাবলেন তিনি তো ভালোবাসেন কবিতা। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলে তিনি নিমগ্ন চিত্তে কবিতা লিখতে পারবেন না, সাহিত্য চর্চা করতে পারবেন না, তাই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন।

তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে ছিলেন সেরা মেধাবী শিক্ষকরা। অধ্যাপক শহিদ মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক আহমদ শরীফ, অধ্যাপক আব্দুল হাই, অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদ, অধ্যাপক রফিকুল ইসলামসহ আরও অনেক অধ্যাপকবৃন্দের সাহচর্যের কথা খুব গৌরবের সাথে কবি স্মরণ করেছেন।

হেলাল হাফিজ বলেছেন তিনি কখনোই সরাসরি রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু উনিশ'শ ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে তিনি অজান্তেই আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে যান। তিনি অনুভব করেন পূর্ব বাংলার ভূখণ্ডের স্বাধীনতা জরুরি। তিনি কবিতা লিখেন নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়। "এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তাঁর শ্রেষ্ঠ সময়, এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তাঁর শ্রেষ্ঠ সময়।" তিনি বলেছেন এই কবিতা প্রথম সরাসরি সশস্ত্র যুদ্ধের আহ্বান জানায়। কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি হলো–

"কোন কোন প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয়, যদি কেউ ভালবেসে খুনী হতে চান, উৎকৃষ্ট সময় কিন্তু আজ বয়ে যায়"। এই কবিতা নিয়ে যখন তিনি ডেইলি পাকিস্তানের সম্পাদকের কাছে যান ডেইলি পাকিস্তানের সম্পাদক বিনীতভাবে বলেন এটা প্রকাশ করলে পরের দিন কাগজ বন্ধ করে দিবে তবে বলেন তুমি একজন সফল কবি, যদি আর কোনো কবিতা না-ও লিখো এই কবিতা তোমাকে কবি হিসেবে অমর করে রাখবে"।

এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে শোভিত হতে থাকে কবি হেলাল হাফিজের কাব্যময় দ্রোহী স্লোগান।

উনিশ'শ একাত্তর সালে কবি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একজন তরুণ কবি এবং সাহিত্যিক হিসেবে তখন ক্যাম্পাসে তার তুমুল জনপ্রিয়তা। তিনি থ াকতেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে। তখনকার সময়ে ইকবাল হলে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা বেশি হতো। এক সন্ধ্যায় কবি তাঁর জেলার এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে ফজলুল হক হলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ শুনেন তাঁর হলে হামলা হয়েছে, গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, অনেক ছাত্র নিহত হয়েছে এবং কারফিউ জারি হয়েছে, দিনটি ছিল একাত্তরের পঁচিশে মার্চ, কালো রাত।

হেলাল হাফিজ তখন আর হলে ফিরতে পারলেন না, কারফিউ শিথিল হবার পর তিনি ইকবাল হলে আসেন, দেখেন নিহত ছাত্রদের লাশ পড়ে আছে। তাঁর কক্ষের দরজা লাগানো ছিল, চারিদিকে ভীতিকর পরিস্থিতি দেখে তিনি তালা খুলে তাঁর কক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে হল থেকে বের হয়েছিলেন, এই সময় কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁকে দেখে গলায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন তারা ভেবেছিলেন হেলাল হাফিজও মারা গেছেন। হেলাল হাফিজ তাঁর এই বেঁচে থাকাকে ভাগ্যের আশীর্বাদ হিসেবে মনে করেন।

কবি হেলাল হাফিজ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন তাঁর জীবন ছিল উত্তাল সময়ের স্রোতের মতো কল্লোলময়। প্রেম ছিল, দ্রোহ ছিল আর বিভিন্ন আন্দোলনে

কবির কবিতা ছিল শব্দ সৈনিক। কবি লিখেছেন–

"মানব জন্মের নামে হবে কলঙ্ক হবে এরকম দুঃসময়ে আমি যদি মিছিলে না যাই, উত্তর পুরুষে ভীরু কাপুরুষের উপমা হবো আমার যৌবন দিয়ে এমন দুর্দিনে আজ শুধু যদি নারীকে সাজাই"। শুধু নারী নয় দেশ, সমাজ, নিজের জন্মমাটি, নেত্রকোনার সেই ছোটো গ্রাম, নদী, বৃক্ষ ছিল কবির কবিতার অনুষঙ্গ। কবি হেলাল হাফিজ চিরদিনই গৃহবিমুখ ছিলেন। শিশুকালে মাকে হারিয়েছেন। যদিও নতুন মা তাঁকে ভালোবাসতেন, বাবার সাথে তিনিও পাত্রী দেখতে গিয়েছিলেন এবং তিনি মা হিসেবে সেই নারীকে পছন্দ করেছিলেন। তারপরও গর্ভধারিণী আপন মা হারানোর বেদনা তাঁর শৈশব কৈশোরে তীব্র হয়ে উঠে, তিনি মাতৃস্নেহের অভাববোধ করতে থাকেন, একাকীত্ব বোধ করেন। এই রকম সময়ে স্কুল জীবনে সবিতা মিসের মধ্যে তিনি খুঁজে পান আশ্রয়, প্রশ্রয়। মায়ের ছায়া, বোনের ছায়া, শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রশ্রয়, এক ধরনের মোহ, সব যেন মিলেমিশে সবিতা সেন এক বিশাল স্মৃতি কবির মনে জমা করেছিলেন। যৌবনে কবি প্রেমে পড়লেন হেলেন নামের এক তরুণীর প্রতি। সেই প্রেম আর পরিণতি পেল না, প্রেমিকার বিয়ে হয়ে গেল। কবি তীব্র বেদনায় স্তব্ধ হয়ে পড়লেন, কয়েকদিন পর অজান্তেই লিখলেন চরণের পর চরণ যা হয়ে উঠল কালজয়ী প্রেমের কাব্য। গভীর বেদনায় কবি লিখলেন "তুমি জান, আমি জানি, পাড়া প্রতিবেশীরা জানে পাইনি তোমাকে, কিন্তু তুমি আছ এই কবি সন্ন্যাসীর ভোগে আর ত্যাগে। আরও লিখেছেন–

"ভেবেছি রাজা হব,
তোমাকে সম্রাজ্ঞী করে সাম্রাজ্য সাজাবো
আজ দেখি রাজা আছে, রাজ্য আছে শুধু
তুমি অন্য ঘরে।"

কখনো করুণ সুরে বলেছেন–
পত্র দিও, পত্র দিও।

ফেরীঅলা কবিতায় লিখেছেন–

কষ্ট নেবে কষ্ট
হরেক রকম কষ্ট আছে
কষ্ট নেবে কষ্ট!
লাল কষ্ট নীল কষ্ট কাঁচা হলুদ রঙের কষ্ট
পাথর চাপা সবুজ ঘাসের সাদা কষ্ট,
আলোর মাঝে কালোর কষ্ট
মালটি-কালার কষ্ট আছে
কষ্ট নেবে, কষ্ট।

কবি বলেছেন বিপ্লবী হতে হলে আগে প্রেমিক হতে হবে। দেশকে ভালোবাসতে হবে, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব যাতে কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। সকল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, কবি যখন সশস্ত্র যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন দেখেছিলেন পূর্ববাংলার মানুষ দেখতে চায় স্বাধীনতা, দেশেপ্রেমে বাংলার স্বাধীনতাকামী কৃষক, মজুর, ছাত্ররা দুর্নিবার। তাঁর বিপ্লবী কবিতা উদ্‌বেলিত করেছিল বাংলার ছাত্রসহ আপামর জনগণকে। তবে একটি সময় কবি বলেছিলেন যদিও তিনি বিপ্লবী কবিতা রচনা করেছেন কিন্তু তিনি শান্তির পূজারী, তিনি যুদ্ধ হানাহানি নৈরাজ্যমুক্ত শান্তিময় বিশ্ব দেখতে চান। কবি হেলাল হাফিজ আসলে নিভৃতচারী শান্তিপ্রিয় প্রেমের কবি। কবি একটি সময় বলেছেন "নিউট্রন বোমা বোঝ, মানুষ বোঝ না" প্রেম, প্রার্থিত বৈবাহিক প্রণয়সঙ্গী একজন কবিকে দেয় পূর্ণতা, কবি উন্মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন–

"আমাকে স্পর্শ করো, নিবিড় স্পর্শ করো নারী। অলৌকিক কিছু নয়, নিতান্তই মানবিক যাদুর মালিক তুমি তোমার স্পর্শেই আমার উদ্ধার।"

কিন্তু কবি ইপ্সিত নারীকে নিয়ে সংসার সাজাতে পারেননি, কিন্তু প্রেমিকাকে ভুলতে চাইলেও ভুলে যেতে পারেননি, শেষ জীবনে এসেও কবি প্রিয়তমাকে স্মরণ করে অশ্রুজলে সিক্ত হয়েছেন, যে জলে আগুনের মতো তীব্র দহন ছিল। কবি লিখেছেন–

"আমি না হয় ভালবেসেই ভুল করেছি ভুল করেছি, নষ্ট ফুলের পরাগ মেখে পাঁচ দুপুরে নির্জনতা খুন করেছি, কি

আসে যায়? এক জীবনে কতোটা আর নষ্ট হবে, এক মানবী কতোটা বা কষ্ট দেবে!

শিশুকালে মাতৃবিয়োগ, স্কুল শিক্ষিকা সবিতা সেন-এর স্মৃতি, প্রিয়তমা হেলেনের অন্যত্র বিবাহ, বাবার মৃত্যু এবং আরও অনেক বিয়োগব্যথা, অপ্রাপ্তি কবির বাইরের জগতকে সীমিত করলেও অন্তরের অনুভবকে করেছে ঋদ্ধ, শিল্পময়। কবি বলেছেন তিনি বিত্ত বৈভবের চেয়ে মানুষ জমাতে চেয়েছেন, তাঁর কবিতার প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ সেটা তিনি উপভোগ করতে চেয়েছেন। কবির যাপিত জীবন নির্জনে কাটলেও তিনি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন, আর এটাকেই তিনি সৌভাগ্য হিসেবে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

জীবনের অনেকটা সময় কবি ছিলেন গৃহবিবাগি, উদাস পথিক, সারাজীবন কবিতা লিখেছেন, সাংবাদিকতা করেছেন, সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। প্রেসক্লাব ছিল তার কাছে সংসারের মতো, তিনি বলেছেন যখন প্রেসক্লাব থেকে বের হয়ে নিজের থাকার জায়গায় যেতেন তাঁর কাছে মনে হতো তিনি সংসারহীন নির্জন এক কক্ষে যাচ্ছেন। কবিতা সৃষ্টি ছিল কবির আরাধনা, তিনি কবিতার মধ্য দিয়ে মানুষ জমাতে ভালোবাসতেন। সংসারহীনতা মাঝেমাঝে তাঁকে কষ্ট দিত, কিন্তু তিনি জানতেন মূলত প্রতিটি মানুষ নিজের বৃত্তে একা একটি কেন্দ্রবিন্দু।

কবি লিখেছেন–

"জলের আগুনে পুড়ে হয়েছি কমল, কী দিয়ে মুছবে বলো আগুনের জল।"
""আমার যতো শুভ্রতা সব দেবো,
আমি নিপুণ ব্লটিং পেপার
সব কালিমা, সব ব্যথা ক্ষত শুঁষেই নেবো।"

ঘুড়ি কবিতায় কবি বলেছেন–

"সুতো ছিঁড়ে তুমি গুটালে নাটাই,
আমি তো কাঙ্গাল ঘুড়ি,
বৈরী বাতাসে কি আশ্চর্য একা
একা আজও উড়ি"

সুখস্মৃতি নয়, বেদনা, বিরহ, কষ্ট কবির কবিতা লিখার প্রেরণা ছিল। কবিকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনাকে যদি বলা হয় 'কি ভুলে যেতে চান?' তখন বলেছিলেন তিনি জীবনে যে সব সুখের স্মৃতি আছে সেগুলো ভুলতে চান, কারণ হিসেবে বলেন সুখস্মৃতি নয় অপ্রাপ্তি, বেদনার হাহাকার তাঁকে কবিতা লিখতে সাহায্য করে। প্রেমের প্রত্যাখান, বেদনা, বিরহ, মানুষের উপেক্ষার জন্য তিনি কবি হতে পেরেছেন। কবি মনে করেন দুঃখ, বিরহ হলো শিল্পের প্রেরণা। সুখ নয় অপ্রাপ্তি, অসফলতা, বিরহ মানুষকে প্রতিমুহূর্তে কাঁদায়, আর এই কান্নার তরঙ্গ বেহালার করুণ সুরের মূর্ছনার মতো বাজে কবিতায়। মানুষের অবহেলা তাকে কষ্ট দিয়েছে। কবি লিখেছেন–

"আজন্ম মানুষ আমাকে পোড়াতে পোড়াতে কবি করে তুলেছে।
মানুষের কাছে এও তো আমার এক ধরনের ঋণ!
এমনই কপাল আমার...!
অপরিশোধ্য এই ঋণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

কবি একনিষ্ঠ প্রেমিক হয়েও প্রার্থিত সঙ্গীকে পাননি, এই বেদনাবিধুর কষ্ট শৈল্পিক কষ্ট হিসেবে কবিতায় এনেছে রোমান্টিক আবহ। এই বিরহ হয়েছে তার কবিতার উপাদান। কবি আর্তনাদ করে লিখেছেন–

কোন কথাটা অষ্টপ্রহর কেবল বাজে মনের কানে
কোন স্মৃতিটা উস্কানি দেয় ভাসতে বলে প্রেমের বানে
পত্র দিও, পত্র দিও।
আর না হলে যত্ন করে ভুলেই যেও, আপত্তি নেই।
গিয়ে থাকলে আমার গেছে, কার
কী তাতে? আমি না হয় ভালবেসেই ভুল করেছি,
ভুল করেছি, নষ্ট ফুলের পরাগ মেখে"

প্রেমের বেদনা কবিকে দিয়েছে কবিতার উপাদান। কবির স্মৃতিতে যখনই আরাধ্য মানবীর কথা এসেছে কবি দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছেন, হাহাকার করেছেন, আর তাতেই তৈরি হয়েছে শিল্পময় কবিতা।

অসমাপ্ত প্রেম মনে হয় সবচেয়ে সুন্দর। কবি হেলাল হাফিজ প্রেমে পড়েছেন কিন্তু পরিণয় পর্যন্ত যায়নি। এই অসমাপ্ত প্রেমের স্মৃতি তাঁকে কষ্ট দিয়েছে, তিনি সেই বেদনার নীল কষ্ট নিয়ে যা লিখেছেন তাই হয়েছে শ্রেষ্ঠ কবিতা। শিল্পের জন্য শৈল্পিক কষ্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কবি বলেছেন আজকের সময়ে শৈল্পিক কষ্ট দেবার মতো লোকের খুব অভাব।

'tragedy is an imitation of life'–কবি হেলাল হাফিজের অন্তর্গত জীবন ছিল শূন্যতায় ভরা। বেশিরভাগ সময় পরিবারহীন একা জীবন কাটিয়েছেন। আর একাকীত্ব মানে নয় জনবান্ধবহীনতা। অনেক সময় অনেক মানুষের ভিড়ে থেকেও, বিশেষ সম্পর্কের মাঝে থেকেও ভেতরে ভেতরে যে কেউ একাকিত্বে ভুগতে পারে। কবি হেলাল হাফিজের চারপাশে ছিলেন ভক্ত অনুরাগীরা কিন্তু তারপরও ভেতরে ভেতরে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। পরিবারের সাথে যোগাযোগ ছিল কিন্তু তিনি নিজেই একাকী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন, প্রেমের স্পর্শ তিনি চেয়েছিলেন, সংসারও চেয়েছিলেন কিন্তু সংসারী হওয়ার সুযোগ হয়নি। প্রেম অনেকবার আসক্ত করলেও, চলার পথে বিশেষ মোহ, ভালোবাসা, মুগ্ধতা তৈরি হলেও কোনো সম্পর্ক শেষ অবধি পরিণতি পায়নি, বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত যায়নি। জীবনের এই নিঃসঙ্গতাকে কবি তাঁর কবিতায় বারবার ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি বলেছেন–

> "জন্মাবধি ভেতরে
> এক রঙিন পাখি কেঁদেই গেলো
> শুনলো না কেউ ধ্রুপদী ডাক,
> চৈত্রাগুনে জ্বলে গেলো আমার বুকের গৃহস্থালি
> বললো না কেউ তরুণ তাপস এই নে চারু শীতল কলস!"

শিল্প সৃষ্টির পেছনে সুখের চেয়ে বেদনা বেশি ভূমিকা রাখে। শেষ দিকের এক আলাপনে কবি বলেছেন "কিছু কথা অকথিত থেকে যায় বেদনার কথা সবাইকে বলা যায় না–

> "ভালবাসা যেন দু মুখো সাপ
> বাসলে কাটে, না বাসলে বিষকাঁটা হয়ে মন মগজে, দু পায়ে ফুটে"

কবি তাঁর কবিতার জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদকসহ আরও অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। কবির নির্বাচিত মৌলিক কবিতার বই পরপর কয়েকটি বইমেলায় ছিল সর্বোচ্চ পাঠককৃত জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ। শৈশব থেকে আমৃত্যু কবি হেলাল হাফিজ সাহিত্যচর্চায় নিবেদিত ছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'যে

জলে আগুন জ্বলে’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে এরপর ২০১২ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘কবিতা একাত্তর’ এবং ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয় তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘বেদনাকে বলেছি কেঁদো না’। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন খুবই সরল, বন্ধুপ্রিয়, আড্ডাপ্রিয়, নম্রভাষী একজন মানুষ। জীবনের গোধূলিবেলায় কবি চেয়েছিলেন আত্মজীবনী লিখতে এবং আরও কিছু কবিতা লিখতে। আধুনিক কবি, জননন্দিত কবি লিখতে লিখতেই চলে গেলেন ওপারে। অন্যভুবনে পরলোক গমন করলেন।

শেষ সময়ে কবি ছিলেন নিঃসঙ্গ। বেদনার কবি, ভালোবাসার কবির কথা এখনো প্রতিধ্বনিত হয়, কবির লেখা সেই চরণে “দুঃখের আরেক নাম হেলাল হাফিজ।” আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিভাবান কবি হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে আধুনিক কবি হেলাল হাফিজের নাম, কবিতার নীল আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে ঔজ্জ্বল্য ছড়াবেন জননন্দিত কবি হেলাল হাফিজ।

আত্মদক্ষতা হিসেবে কৌশল

মাজেদ বিশ্বাস

গ্যারি কাসপারভের "কীভাবে জীবন দাবার অনুকরণ করে" ('How Life Imitates Chess' 2007) আত্মজীবনী, কৌশল-গাইড এবং দার্শনিক চিন্তার সংমিশ্রণে রচিত একটি গ্রন্থ। বিশ্বের অন্যতম প্রখ্যাত দাবা গ্র্যান্ডমাস্টারের লেখা এই বই দাবাকে কেবল একটি উপমা হিসেবে নয় বরং নেতৃত্ব, ঝুঁকি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত বিকাশ বোঝার একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করে। বইটির উপশিরোনাম–"সঠিক চাল দেওয়া–দাবার বোর্ড থেকে বোর্ডরুম পর্যন্ত।" ('Making the Right Moves—from the Board to the Boardroom')—পাঠককে দাবার যুক্তি ও শৃঙ্খলাকে জীবনের ও ব্যবসায়ের অনিশ্চিত পরিসরে প্রয়োগ করতে আমন্ত্রণ জানায়।

কিন্তু এটি শুধুমাত্র একটি কর্পোরেট গাইড নয়, এটি একটি সাহিত্যমূলক রচনা–প্রতীক, অলঙ্কার, চরিত্রের বিকাশ (বিশেষ করে লেখক নিজেই) এবং শক্তি ও ব্যর্থতা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান চিন্তার এক কাঠামোবদ্ধ বয়ান। এটি একটি পরিচয়, স্বায়ত্তশাসন এবং পরিবর্তন আগাম অনুধাবনের শিল্প নিয়ে লেখা বই–যা সাহিত্য এবং জীবনের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণ ব্যবসায়িক বইগুলো যেখানে বিমূর্ততা ও গাল-গল্প দিয়ে ভরপুর, সেখানে "কীভাবে জীবন দাবার অনুকরণ করে" ('How Life Imitates Chess') ব্যক্তিগত কাহিনিতে প্রোথিত। কাসপারভ তাঁর স্মরণীয় ম্যাচগুলোর (মানব প্রতিপক্ষ ও আইবিএমের Deep Blue-এর মতো যন্ত্রের বিরুদ্ধে) প্রতি ফিরে তাকান এবং সেখান থেকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কৌশলগত পরিবেশ–বোর্ডরুম, যুদ্ধক্ষেত্র, ও রাজনৈতিক প্রচারাভিযান–থেকে নেওয়া পাঠ তুলে ধরেন।

তাঁর গদ্য সংক্ষিপ্ত, সরাসরি এবং লক্ষ্যনির্ভর–ঠিক যেন দাবার হিসেবি চাল। তিনি প্রায়শই সমান্তরালতা, বাণীবদ্ধতা এবং বৈপরীত্য ব্যবহার করেন–আলঙ্করিক কৌশল যেগুলো দাবার দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েনকে প্রতিফলিত করে : "আমাদের শিখতে হবে আগাম অনুধাবন করতে, হিসেব কষতে এবং খাপ খাইয়ে নিতে। কারণ জীবন, দাবার মতোই, সবসময় পরিবর্তনশীল।" লেখার দ্রুত গতি ও দৃঢ় ভঙ্গিমা বইটিকে চলমান একটি ম্যাচের মতো অনুভব করায়, যা পাঠককে ঝুঁকি ও চিন্তার সংলাপে টেনে আনে।

বইটির একটি মূল ভাবনা হলো : ভালো সিদ্ধান্ত স্বতঃস্ফূর্ত নয়–এটি গড়ে তুলতে হয় : "আপনার প্রবৃত্তি তখনই কার্যকর হবে যখন তা বছরের পর বছর

বুদ্ধিদীপ্ত অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণের ফসল।" কাসপারভ 'স্বাভাবিক প্রতিভা'-র মিথকে প্রত্যাখ্যান করেন। বরং তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণকে একটি দক্ষতা হিসেবে দেখেন, যার জন্য আত্মসমীক্ষা, শৃঙ্খলা এবং প্যাটার্ন চিনতে পারার ক্ষমতা প্রয়োজন।

এটি ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েলের "ব্যতিক্রমীরা : সাফল্যের গল্প" ('utliers: The story of success') এবং ড্যানিয়েল কানেমানের "চিন্তা : দ্রুত ও ধীরগতির" ('Thinking: Fast and Slow'-)এর বিষয়গুলোর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ–কিন্তু কাসপারভের অভিজ্ঞতায় তৈরি হওয়া প্রবৃত্তির উপর জোর এই বইকে জনপ্রিয় কৌশল গ্রন্থগুলোর মাঝে স্বতন্ত্র করে তোলে।

দাবার মতো, জীবনেও প্রস্তুতি ও খাপ খাইয়ে নেওয়ার মধ্যে ভারসাম্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাসপারভ সেই মুহূর্তগুলোর কথা বলেন যখন তাঁর সযত্ন প্রস্তুতি ব্যর্থ হয়–ভুল হওয়ায় নয় বরং পরিস্থিতি তাঁর কল্পনার চেয়ে দ্রুত পরিবর্তিত হওয়ায়। এটি তাঁকে একটি গভীর বাণী উচ্চারণে নিয়ে যায় : "কৌশল এমন কিছু, যেটি আপনাকে সর্বদা সংজ্ঞায়িত ও পুনঃসংজ্ঞায়িত করতে হয়।" এই ভাবনা হেরাক্লিটাসের প্রবাহতত্ত্বের সাথে মিলে (একজন মানুষ কখনোই একই নদীতে দু'বার পা দেয় না) এবং ডারউইনীয় অভিযোজন নীতির প্রতিধ্বনি ঘটায়। কাসপারভ এই ধারণাটি উদ্যোক্তা, রাজনীতিবিদ এবং ক্রীড়াবিদদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করেন–জোর দিয়ে বলেন যে যারা কঠোরভাবে নিজেদের পরিকল্পনার সাথে লেগে থাকে, তারা ব্যর্থ হওয়ার জন্যই তৈরি।

কাসপারভ তাঁর প্রসিদ্ধ হারগুলো–বিশেষ করে ১৯৯৭ সালে ওইগ-এর Deep Blue-এর বিরুদ্ধে–বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেন। অনেক আত্মজীবনীমূলক লেখকের মতো তিনি পরাজয়কে ত্রুটি বা অবিচার হিসেবে ব্যাখ্যা করেন না। বরং তিনি এটি বিবেচনা করেন একটি গুরুত্বপূর্ণ শেখার উৎস হিসেবে : "পরাজয় আপনাকে নিজের ধারণাগুলো পুনঃপরীক্ষা করতে, চিন্তা পুনঃসামঞ্জস্য করতে এবং বিনয় নিয়ে আবার সামনে এগোতে বাধ্য করে।" এটি রোমান্টিক কবি স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের "প্রতিভা হচ্ছে বিকাশের ক্ষমতা" ধারণার প্রতিধ্বনি এবং নিটশের "যা আমাকে হত্যা করে না, তা আমাকে শক্তিশালী করে" উক্তির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণভাবে, কাসপারভ বলেন যে পরাজয় কোনো বিপথগামী মোড় নয়–এটি আত্মদক্ষতার অন্তিম খেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ চাল।

কাসপারভ দাবার উদ্যোগ ধারণাকে–নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং প্রতিপক্ষকে প্রতিক্রিয়ায় বাধ্য করা–নেতৃত্বের একটি রূপক হিসেবে ব্যবহার করেন : "উদ্যোগ গ্রহণ মানে অকারণে আগ্রাসন নয়, বরং এটি আপনার বাস্তবতাকে নিজের মতো গড়ে তোলার একটি দাবি।" এখানে কাসপারভ ম্যাকিয়াভেলির "রাজকুমার" ('The Prince')-এর সঙ্গেও সাযুজ্য রাখেন, যেখানে ভাগ্যকে এমন এক নদী

হিসেবে চিত্রিত করা হয় যা সাহসীদের পক্ষে থাকে। তবে কাসপারভ এই নীতিকে ২১শতকের বাস্তবতায় রূপ দেন : এখন উদ্যোগ মানে নিছক বলপ্রয়োগ নয়–এটি হিসেবি, অভিযোজিত এবং মানসিকভাবে সজাগ।

রাশিয়ান-ইহুদি-আর্মেনীয় এক শিশু প্রতিভা হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নে বেড়ে ওঠা কাসপারভের জীবনে নিজেই ছিল বিরোধপূর্ণ চালের একটি ধারাবাহিকতা–ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনের মধ্যে। পরে রাজনীতিতে প্রবেশ করে (ভ্লাদিমির পুতিনের সমালোচক হিসেবে) তিনি তাঁর কৌশলে একটি নৈতিক গুরুত্ব যোগ করেন। তিনি লেখেন : "আপনার কৌশল আপনার মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। আপনি যেভাবে খেলেন, সেটিই আপনি কে–তার প্রতিফলন।" এটি এই দর্শনীয় ধারণাকে জোরদার করে যে কৌশল নিরপেক্ষ নয়–এটি নৈতিকভাবে রঙিন এবং ব্যক্তির মূল বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত। কাসপারভের এই কাঠামো তাঁর বইটিকে বোর্ডরুমের সীমা ছাড়িয়ে একটি চরিত্র গঠনের পাঠে রূপান্তর করে।

অধ্যায় ৩: "হিসেবি ঝুঁকি"

ঝুঁকি বিশ্লেষণের একটি চমৎকার অনুবীক্ষণ যা দেখায় কীভাবে সফল খেলোয়াড়রা সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত নেয়, নিখুঁত নয়। এই অংশটি আচরণগত অর্থনীতির পাঠের সাথে মেলানো যেতে পারে।

অধ্যায় ৬: "সিদ্ধান্তের বৃক্ষ"

ক্রমবর্ধমান পরিণতির একটি চিত্তাকর্ষক রূপক দেয়–কীভাবে ছোটো প্রাথমিক সিদ্ধান্তগুলো সময়ের সাথে বহুগুণে বিস্তার লাভ করে। এই অংশটি কারণ ও ফলাফলের বয়ান গঠনে শিক্ষণীয়।

অধ্যায় ১০: "মানব বনাম যন্ত্র"

Deep Blue-এর সঙ্গে তাঁর ম্যাচের বিশদ বর্ণনা দেয় এবং মানব প্রবৃত্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং যুক্তির সীমা নিয়ে গভীর প্রশ্ন তোলে। প্রযুক্তি ও সৃজনশীলতা বিষয়ে আলোচনার জন্য এটি উর্বর ক্ষেত্র।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে,"কীভাবে জীবন দাবার অনুকরণ করে" হলো একটি সংহতচিন্তামূলক ধ্যান–নিরাপত্তা, দূরদর্শিতা এবং সহনশীলতা সম্পর্কে। বইটি শেখায়, যদিও আমরা সব ভেরিয়েবল নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, কিন্তু কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেব–সেটা আমাদের হাতে : কীভাবে ভাবব, খাপ খাওয়াব, ও প্রস্তুতি নেব। একটি মহান উপন্যাসের মতো, কাসপারভের এই রচনা কোনো একক বিজয়

নিয়ে নয় বরং একজন মানুষের ক্রমাগত অভ্যন্তরীণ অভিযাত্রা নিয়ে–যিনি ধীরে ধীরে আরও ভালো খেলোয়াড়, গভীর চিন্তক ও সচেতন জীবনযাপনকারী হয়ে ওঠেন।

তিনি লেখেন : "দাবা ও জীবনে, আমাদের সেই খেলাই খেলতে হয় যা আমাদের দেওয়া হয়েছে–কিন্তু আমাদের কল্পনা, সাহস ও কৌশলের মাধ্যমে নিয়ম বদলের ক্ষমতাও রয়েছে।" এই অর্থে, এই বই কেবল সফলতা নিয়ে নয়, এটি একটি জটিল বিশ্বে বুদ্ধিমানের মতো বেঁচে থাকার শিল্প।

পাঠ্য ও রেফারেন্সসমূহ :

১। কাসপারভ, গ্যারি। "কীভাবে জীবন দাবার অনুকরণ করে"। সঠিক চাল দেওয়া দাবার বোর্ড থেকে বোর্ডরুম পর্যন্ত। ব্লুমসবেরি ইউএসএ, ২০০৭।

২। গ্ল্যাডওয়েল, ম্যালকম। "ব্যতিক্রমীরা : সাফল্যের গল্প"। লিটল, ব্রাউন, ২০০৮।

৩। কানেমান, ড্যানিয়েল। "চিন্তা : দ্রুত ও ধীরগতির"। ফারার, স্ট্রস অ্যান্ড জিরু, ২০১১।

৪। সান টজু। "যুদ্ধের শিল্প"। অনুবাদ : লায়নেল জাইলস। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

৫। মাকিয়াভেলি, নিকোলো। "রাজকুমার / শাসক"। অনুবাদ : হার্ভি সি. ম্যান্সফিল্ড। ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস।

৬। কোলরিজ, স্যামুয়েল টেলর। "সাহিত্যিক আত্মজীবনী"। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

৭। নিটশে, ফ্রিডরিখ। "মূর্তিভঙ্গের গোধূলি"। অনুবাদ : আর. জে. হোলিংডেল। পেঙ্গুইন, ১৯৬৮।

পূর্ব লন্ডন যেন বাঙালি সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার এক অপূর্ব মিলনস্থল

মো. রহমত আলী

বিলেতে বসবাসরত বাঙালিরা তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি বেশ ভালোভাবে ধরে রেখেছেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা উদ্‌যাপন করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে বাংলা নববর্ষ, বিভিন্ন জাতীয় দিবস, সাহিত্য সম্মেলন, ঈদ পুনর্মিলনী, দুর্গাপূজা এবং অন্যান্য বাঙালি উৎসব বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালন করা হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে নিজেদের সংস্কৃতি মিশিয়ে এমন একটি মিশ্র সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে যা বিলেতের মাটিতে বেশ প্রাণবন্ত।

শুধু তাই নয়, এখানে বসবাসরত বাঙালিরা তাদের সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার বিভিন্ন পদক্ষেপ হিসাবে তারা স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টারগুলোতে বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে শিশুরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা করতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচ, গান, নাটক, এবং সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে তারা তাদের ঐতিহ্যকে প্রজন্মের পর প্রজন্মে নিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন কাজ করছে। আর এ কাজ পূর্ব লন্ডনেই বেশি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যে কারণে এ এলাকা যেন বাঙালি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার এক মিলন কেন্দ্র পরিণত হয়েছে। তাই এটাকে অনেকে তৃতীয় বাংলা হিসাবেও উল্লেখ করে থাকেন।

এখানে ইস্ট লন্ডনের যে সমস্ত স্থানে বাঙালিদের নানা অনুষ্ঠান আগে হতো এবং এখনো হচ্ছে এর কিছু বিবরণ তুলে ধরা হলো। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি স্থান হচ্ছে লন্ডনের ঐতিহাসিক–বাংলাদেশ সেন্টার। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ১৯৭১ সালে যুক্তরাজ্য প্রবাসীরাই স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বৈশ্বিক সমন্বয়কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন এই সেন্টার। এখানেই ভারতের পর বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রথম কোনো দূতাবাস চালু হয়। দ্য রয়্যাল লন্ডন বারা অব কেনজিংটন অ্যান্ড চেলসি এলাকার নটিংহিল গেইট টিউব স্টেশনের কাছেই ২৪ পেমব্রিজ গার্ডেন্সে অবস্থিত এ ঐতিহাসিক সেন্টার।

ব্রাডি সেন্টার হলো পূর্ব লন্ডনের একটি প্রসিদ্ধ কমিউনিটি এবং আর্টস সেন্টার। এটি ব্রিকলেনের কাছে অবস্থিত এবং বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যক্রমের জন্য সুপরিচিত। বিশেষ করে এটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যেখানে নাটক, সংগীত, বইমেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ

বিভিন্ন কমিউনিটি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। কোনো কোনো সময় সপ্তাহব্যাপী এমনকি মাসব্যাপী অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়ে থাকে।

টয়েনবি হল ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর নামকরণ করা হয় সমাজ সংস্কারক আর্নল্ড টয়েনবির নামে। এটি পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল স্ট্রিটে অবস্থিত। এখানে সামাজিক পরিষেবা, নাগরিক পরামর্শ সংস্থা, বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ কেন্দ্র এবং বয়স্কদের জন্য কল্যাণমূলক পরিষেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। সাথে সাথে বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশের ভূমিকা পালন করে।

নজরুল সেন্টার মূলত কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামে উৎসর্গীকৃত একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এটি টাওয়ার হ্যামলেটসের একটি প্রধান বাঙালি সংস্কৃতি কেন্দ্র, যা ব্রিক লেন এবং স্পিটালফিল্ডসের কাছাকাছি অবস্থিত। এই কেন্দ্রটি লাইব্রেরি সুবিধা, মিটিং প্লেস এবং বিভিন্ন বাংলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন–নাটক, গান, নৃত্য, আবৃত্তি, চারু ও কারুশিল্প ইত্যাদি ছাড়াও সংগীতের ক্লাসও করানো হয়। এটি ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ২০০০ সালে পুনরায় চালু করা হয়।

ওসমানী সেন্টার (Osmani Centre) লন্ডন এর হোয়াইটচ্যাপেল এবং বেথ নাল গ্রিন এলাকার মাঝে অবস্থিত, যা পূর্ব লন্ডনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিটি সেন্টার। এ সেন্টারটি বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের জন্য পরিচিত। এ সেন্টারটি মূলত ওসমানী ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সেন্টারটি বিভিন্ন কমিউনিটি ইভেন্ট, প্রশিক্ষণ এবং মিটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে একটি প্রধান হল, প্রশিক্ষণ কক্ষ, মাল্টিজিম, মিটিং রুম, প্রশিক্ষণ কিচেন এবং গেমস ও আর্টস রুম রয়েছে।

বার্নার সেন্টারটি ইস্ট লন্ডনের একটি ঐতিহাসিক স্থান, যা একসময় কমিউনিটি কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিল। এখানে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হতো। বর্তমানে, এ সেন্টারটি আর সেভাবে সক্রিয় নেই।

পূর্ব লন্ডনের গ্রেটোরেক্স স্ট্রিটস্থ মাইক্রো বিজনেস পার্ক হলো ছোটো ব্যবসার জন্য একটি কেন্দ্রবিন্দু, যা তাদের উন্নয়নে সহায়তা করে এবং একটি সহযোগিতা ও উদ্ভাবনী পরিবেশ তৈরি করে। তবে এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সমাবেশের জন্য হলরুমও আছে যেখানে নানা সভা-সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ইস্ট লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডস্থ এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে ইদানীং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সভা অনুষ্ঠিত হয়, যা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে কমিউনিটি সেন্টার হিসাবেও কাজ করে।

একসময় ব্রিকলেনের সাড়ে বায়ান্ন হ্যানবারি স্ট্রিটেও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। এমনকি

আলতাব আলী পার্কে স্থাপিত শহিদ মিনার স্থাপনের আগে এখানে অস্থায়ীভাবে শহিদ মিনার নির্মাণ করে দিবসটি পালন করা হতো।

এদিকে বাংলা টাউনে অবস্থিত লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব, দর্পণ বুক ক্লাবসহ আরও কয়েকটি অফিসেও কমিউনিটির নানা অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়ে থাকে।

তাছাড়া ইস্ট লন্ডনের ইম্প্রেশন ইভেন্ট হল, রয়েল রিজেন্সি, এট্রিম ইভেন্ট হল, মাইলেন্ড পার্ক, ভিক্টোরিয়া পার্ক, উইভার্স ফিল্ড, আলতাব আলী পার্ক প্রভৃতিতে বড়ো ধরনের মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বিলাতে নতুন প্রজন্মকে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষাদানে অন্তরায়

সালমা বেগম

বিলাতের হিমেল দ্বীপে বাংলাদেশিদের অভিবাসযাপন প্রায় অর্ধশতাব্দীরও অধিক সময় ধরে। বাংলাদেশের বাঙালি সম্প্রদায় অনেক প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করে প্রথমে কমিউনিটিতে এবং পরবর্তীতে দেশের মূল ধারায় তাদের সরব ভূমিকা রাখতে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, এমনকি স্থানীয় সরকারের তাদের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। যে সকল মনিষীরা আমাদের এই কমিউনিটিকে প্রবাসে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে অবদান রেখে গেছেন এবং অদ্যাবধি রেখে যাচ্ছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা।

প্রবাসে জন্ম নেয়া এবং বেড়ে উঠা বাঙালির নতুন প্রজন্মকে তাদের জাতীয় পরিচয়, জাতিসত্তা, ভাষা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব মা, বাবা, অভিভাবক এবং কমিউনিটির। মিশ্রজাতি এবং মিশ্রসংস্কৃতির দেশ যুক্তরাজ্য। এখানে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠি এবং সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতিকে ধারণ করে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির সঙ্গে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যতার সেতুবন্ধন তৈরি করার সুযোগ রয়েছে। বহুজাতিক সম্প্রদায়গুলো সম্প্রীতির সৌন্দর্যকে ছড়িয়ে দিয়ে ঘৃণ্য বর্ণবাদী প্রতিহিংসাকে জয় করতে সমর্থ হচ্ছে। এমনই এক বহুজাতিক দেশে আমাদের নতুন প্রজন্মকে তার জাতিগত শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া অত্যন্ত জরুরি। ইতমধ্যে বিলাতের বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ব্যক্তি ও সামাজিকভাবে উদ্যোগ নিয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। এমতাবস্থায় আমাদের প্রথমে বাংলাভাষা শিক্ষা এবং সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অন্তরায়গুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। সমস্যাবলি :

১। মূলধারার স্কুলগুলোতে দ্বিতীয় ভাষা তথা কমিউনিটির ভাষা হিসাবে বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্তি নেই।

২। স্থানীয় সরকারগুলোর পক্ষ থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার তেমন উদ্যোগ নেই।

৩। কমিউনিটি লিডার যারা কমিউনিটিকে বিভিন্নভাবে নেতৃত্ব দেন এবং স্থানীয় সরকারে কমিউনিটি কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁদের পক্ষ থেকেও তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয় না।

৪। মা-বাবা এবং অভিভাবকেরাও বাংলাভাষা শিক্ষা, বাংলা সংস্কৃতি শিক্ষার গুরুত্বকে পারিবারিক পরিবেশে কিংবা সামাজিক পরিবেশে তেমনভাবে অনুধাবন করেন না বলেই নতুন প্রজন্মকে খুব একটা উৎসাহিত করেন না।

উপরোক্ত অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করার পর যে সকল সমাধানের কথা আমরা ভাবতে পারি :

১। মূল ধারার স্কুলগুলোতে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাংলাভাষাকে অন্তর্ভুক্তি করার জন্য কমিউনিটির জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটি লিডার, মা-বাবা ও অভিভাবক একত্রে কাজ করতে হবে।
২। সামাজিক সংগঠনগুলোতে বাংলাভাষা শিক্ষা এবং সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।
৩। আধুনিক প্রযুক্তিতে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার করতে নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করা।
৪। সামাজিক পরিবেশে বাংলা সংস্কৃতির বিষয়াদি যেমন, কবিতা, গান, নাটক, নৃত্য, মুভি এবং ডিবেট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যায়।

পরিশেষে, অভিবাসী জীবনে আমরা যদি আমাদের নতুন প্রজন্মকে তাদের আত্মপরিচয় ও জাতিগত সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যর্থ হই তাহলে আমরা একদিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে বাধ্য।

গল্প

হারিয়ে পাবার গল্প

আজিজুল আম্বিয়া

মিছিলটা আগাচ্ছে। ছেলে-বুড়ো-শিক্ষক-শ্রমিকেরা রুদ্ধশ্বাসে রাজু ভাস্কর্যের দিকে ছুটছে।

আমাদের এক ডাক
স্বৈরাচার নিপাত যাক ।

হাজারটা স্লোগানে মুহুর্মুহু রাজপথটি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ পাশ দিয়ে 'পানি লাগবে পানি?'

বলে মাথায় প্লাস্টিকের একটি ঝুড়ির মধ্যে পানির বোতল নিয়ে ছুটে গেল একটি ছেলে মিছিলটির ভেতর দিয়ে।

এই ভাই পানি, বলে ডাক দিলো একটি মেয়ে।

কিন্তু স্লোগানের ভেতর পানিওয়ালা শুনতে পেল না। পাশ থেকে একটি ছাত্র একটু দৌড়ে গিয়ে ছেলেটির কাছ থেকে পানির একটি বোতল এনে মেয়েটিকে দিলো। মেয়েটি এক হ্যাঁচকায় বোতলটির মুখ খুলে থেকে কিছুটা পানি গলায় ঢেলে একটু জিরিয়ে নিয়ে পাশের ছাত্রটিকে বলল,

ভাই কত দিতে হবে?

কোনো টাকা লাগবে না।

কেন ভাই?

সে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছেলে। শুভ। মিছিলে সবাইকে পানি দিয়ে বেড়াচ্ছে। ছেলেটি পিছিয়ে পড়েছিল। কথা না বাড়িয়ে সেও স্লোগানের সাথে সাথে গলা মিলিয়ে হঠাৎ করেই মিছিলের ভিড়ে হারিয়ে গেল।

মিছিলটি রাজু ভাস্কর্যের সামনে গেলে রিকশার ওপর লাগানো মাইক থেকে একজন বলে উঠল,

ভাই আমরা এখানে না থেমে প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে দাঁড়াব।

সাথে সাথে ছাত্র-জনতার মিছিলটি দোয়েল চত্ত্বর পার হয়ে বামদিকে ঘুরে প্রেসক্লাব অভিমুখে যাত্রা শুরু করল।

তারা প্রেসক্লাবের কাছাকাছি আসতেই মাইকে ঘোষণা এলো, আমরা বাকশালী প্রধান বিচারপতিকে ইস্তফা দিতে ঘোষণা দিয়েছিলাম। তাকে আজই ইস্তফা দিতে হবে। বলেই বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী হাইকোর্টের গেটের দিকে ছুটে গেল। পুলিশরা ছাত্রদের পথরোধ করল। একজন পুলিশ মাথায় লাল-সবুজের ব্যান্ড বাঁধা একটি ছাত্রকে ধরে ভ্যানে ওঠাতে যাচ্ছিল। হঠাৎ তিনজন বয়েসি মানুষ ভিড় ঠেলে ছুটে এসে চিৎকার করে উঠলেন,

ওকে ধরছেন কেন? ও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ও তো কোনো রাষ্ট্রবিরোধী বা ধ্বংসাত্মক কাজ করেনি।

দু'জন চেঁচিয়ে উঠলেন,

সে কি সন্ত্রাসী যে তাকে ধরছেন?

ছাত্রটির একহাত ধরে পুলিশ টানছে ভ্যানটির পেছনের দিকে। অন্য হাতে দুইজন শিক্ষকের হাত, তিনজন ছাত্রীর হাত। টানা-হ্যাঁচড়া চলছে কয়েক মিনিট। হঠাৎ তিনজন ছাত্রী পুলিশের ভ্যানের সামনে শুয়ে পড়ে বলতে লাগল,

যেতে হলে আমাদের লাশ ডিঙিয়ে যেতে হবে।

শেষে একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা এসে বলল, স্যার, আমরাও তো আপনাদের দেশেরই মানুষ। আমাদের দায়িত্ব কি পালন

করতে দেবেন না? আপনারা আপনাদের ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসে নিয়ে যান স্যার।

মাইক থেকে ঘোষণা এলো, আমরা আগামীকাল দুপুর একটার ভেতর ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রধান বিচারপতিকে পদত্যাগ করতে শেষবারের সময় দিয়ে গেলাম। অন্যথা হলে আমরাই তাকে তার চেয়ার থেকে নামাব।

দুই

পরদিন সারা দেশ থেকে আন্দোলনের খবর আসছে। দেশের পুলিশ বাহিনী, আনসার, আধা-পুলিশ বাহিনী, বিডিআর, সেনাবাহিনী কিছুতেই আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের থামিয়ে রাখতে পারছে না। তবু আধিপত্যবাদী সরকার মাথা নোয়াচ্ছে না। ঢাকা কলেজ থেকে একটি মিছিল এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে। সকাল নয়টাতে শাহবাগ মোড়ে আসতেই মিছিলটি রুদ্ররূপী আকার ধারণ করেছে। এত এত ছেলে মেয়ে অংশগ্রহণ করেছে অথচ কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা বা অসৌহার্দবোধ নেই।

এই যে ভাই, শোনেন।

বাঁদিকে তাকাতেই আবীর দেখে সেদিনের মেয়েটি।

আপনিও তো ঢাকা ভার্সিটিতে পড়েন, তাই না?

জি, এবার ইংরেজিতে মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দিলাম। এখন রেজাল্টের অপেক্ষা। আমি আবীর আমান।

আমি লাবীবা তাহরীন। নার্সিং এন্ড নিউট্রিশানে অনার্স করছি নীলক্ষেত হোম ইকনমিক্স কলেজে। এ সময় হঠাৎ করে একদল পুলিশ তাদের বেধরক মারপিট শুরু করল। এসব হবে জেনেও শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা কিছুটা হকচকিয়ে যায় এবং পিছু হটা শুরু করে। আবীর লাবিবার কোমরে হাত দিয়ে অনেকটা ঝুলিয়ে টেনে নিয়ে সেও পিছু হটে টিএসসির সামনে এসে তাকে বসিয়ে দেয়। আবীরও ঘাসগুলোর ওপর শুয়ে বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে। মাঝবয়েসি এক লোক এসে বলে,

আপা, ভাইয়ের কিছু হইছে? আমার রিকশা আছে, লইয়া আইমু? ভাইয়ারে বাসায় লইয়া

যাই?

আবীর বলে, না ভাই কিছু হয়নি। তোমারে কিসু করন লাগব না। সে উঠে বসে।

তিন

টিএসসির রেস্টুরেন্ট। লাবীবা বলল,

আজ আমি তোমাকে খাওয়াব। তোমার যা ইচ্ছে খেতে চাও, বলো।

না। সুখবরটা আমার। আমি আজ বিল দেবো।

না। এই সুখবরটি আনতে তোমাকে অনেক শ্রম দিতে হয়েছে আবীর। সুতরাং পাওনাটা তোমার।

বিলটা আমিই দেবো।

আবীরও একগুঁয়ে, না সে-ই বিলটা দেবে।

ঠিক আছে, আমার মাস্টার্সের রেজাল্ট বের হলে সেদিন তুমি সেলিব্রেট করো।

না। আজ আমি পে করব।

আমার কথার কি এতটুকু মূল্য নেই তোমার কাছে? শুনে হঠাৎ করে আবীর আমান উঠে চলে যায়।

এর পর বেশ কিছুদিন ওদের আর দেখা হয়নি।

নতুন স্বাধীনতা আন্দোলন চলতে থাকে।

পুলিশের গুলিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিনই দু'জন, চারজন মরছেই।

তবু সমস্বরে সবাই স্লোগান দিচ্ছে–

ছাত্র জনতার এক ডাক

ফ্যাসীবাদ নিপাত যাক।

বেলা বাড়তে থাকে। সমাবেশে বৈপ্লবিক ছাত্র জনতার যেন আজ ভেঙে গেছে সব বাঁধা। তারা যেন সমস্বরে গাইছে, "আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, মোর বুক হাসে, মোর চোখ হাসে, মোর টগবগিয়ে খুন হাসে।"

এতদিন যেন দেশের মানুষ হাসতে পারেনি, তারা হাসতে ভুলে গেছে!

হঠাৎ মাইকের সামনের বক্তা বলে উঠল, আর দেরি নয়। আজই। এখনই আমরা বঙ্গভবন দখল করব। বন্ধুরা আপনারা রাজি আছেন?

গোটা শাহবাগ মোহনা থেকে গমগম করে হুংকার বেরিয়ে এলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, আজই।

গোটা জনসমুদ্র বীর বিক্রমে এগিয়ে চলল বঙ্গভবনমুখে। বেলা দেড়টা। ছাত্র-গণজনতা সড়কের ওপরের এক একটি কাঁটাতারের দেয়াল সরাচ্ছে আর এগুচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর।

ছাত্র-জনতার হুংকার–

আর নয় পরাধীনতা

জোগছে দেশের ছাত্রজনতা।

ছুটে চলেছে মিছিলটি শহরের পশ্চিম দিকে। তারা সবাই চায় সম-অধিকারের স্বাধীনতা। ন্যায্যতার স্বাধীনতা।

চার

দুপুর দু'টো। প্রহরীরা কোথায় গেছে, কে জানে। ছাত্র-জনতা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ঢুকে পড়ে। কেউবা প্রধানমন্ত্রীর পোষা শখের মোরগ-মুরগি নিয়ে চলে যাচ্ছে, কেউবা সদ্য রান্না করা মুরগির রানটি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর শোবার বিছানায় শুয়ে খাচ্ছে রাজার হালে। কেউবা বঙ্গভবনের পুকুরের মাছ ধরে দু'হাতে দুটি নিয়ে বাড়িমুখো হাঁটছে। হাজার-লক্ষ ছাত্র-জনতা বঙ্গভবনের চারদিকের দেয়ালে উঠে স্লোগান দিচ্ছে। একজন বলে উঠল, না, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যও রাখা যাবে না।

কে যেন কোথা থেকে বিশাল লম্বা মোটা দুটি দড়ি নিয়ে এলো। একজন হাতুড়ি দিয়ে ভাস্কর্যের মাথায় ঘন ঘন আঘাত করতে থাকল। একজন অনেক উঁচুতে উঠে ভাস্কর্যের গলায় একটি দড়ি পরিয়ে দুই অংশ নিচে নামিয়ে দিলো। একজন স্লোগান দেয়, "দড়ি ধরে দে রে টান", অন্যরা বলে, "রাজা হবে খান খান।"

দড়ি টানাটানি শুরু হলো। কে একজন কুড়ালের উলটো পিঠ দিয়ে ভাস্কর্যটির পায়ে সজোরে ঘাঁ মারতে লাগল। হঠাৎ ভাস্কর্যটি পায়ের কিছু অংশ জুড়ে দড়াম করে ভেঙে পড়ল। বিশাল একখণ্ড ভগ্নাংশ এসে পড়ল আবীর আমানের ডান হাঁটুতে। সে চোখে অন্ধকার দেখল।

পাঁচ

লাবীবা তাহরীন মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছে। ইতিমধ্যে ইম্পেরিয়াল কলেজ অফ লন্ডনে তার স্কলারশিপ অনুমোদন হয়ে এসেছে। বাবা-মা তাগাদা দিচ্ছে সময় মতো গিয়ে ভর্তি হবার। তার মন সায় দিচ্ছে না। কথা ছিল সে আবীর আমানকে খাওয়াবে। দু'জনে সেলিব্রেট করবে। কিন্তু কোথায় সে।

টিএসসি, ভার্সিটি ক্যাম্পাস কোথাও তার দেখা নেই। নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসেছে। আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে, নিহত-আহতদের পরিবারে অর্থ সাহায্য দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কোথাও আবীর আমানের কোনো খোঁজ পাচ্ছে না লাবীবা তাহরীন।

এক ধরনের অতৃপ্ত মন নিয়ে বিমানে উঠে বসে সে। লন্ডনে এসে নিজের রেসিডেন্ট গুছিয়ে নেয়। হসপিটালিটি এন্ড পেশেন্ট কেয়ারে স্পেশালাইজড করার জন্য স্কলারশিপ নিয়ে এসেছে ইম্পেরিয়াল কলেজ অফ লন্ডনে। পেশেন্টদের ডায়েট কেয়ার এন্ড ফুড মেন্যুতে স্ট্যাটিস্টিক নেবার জন্য দায়িত্ব পড়ল হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে।

আজ গাইড স্যার আসেননি। তাকে একাই চার্ট দেখে স্ট্যাটিস্টিক রিপোর্ট করতে হবে। এই ওয়ার্ডের সব রোগীর চিকিৎসা শেষের পথে। রিলিজ দেবার প্রস্তুতি চলছে। তিন নম্বর বেডের কাছে গিয়েই থমকে যায় লাবীবা। পেশেন্টও অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে। পেশেন্টের মুখ থেকে একটি শব্দ বেরিয়ে এলো, হাই লাবীবা, আবীরের মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল।

আবীর? আবীর আমান না? তুমি এখানে?

অবশেষে দু'জনই জানতে পারে দু'জনের খবর। ভাস্কর্য ভেঙে একটি বড়ো পাথর পড়ে আবীরের পায়ের হাঁটুতে। ফ্র্যাকচার হয়। বাবা-মা একমাত্র ছেলের পরিপূর্ণ চিকিৎসার জন্য লন্ডনে পাঠিয়েছেন নিজেদের খরচে। চিকিৎসকরা আবীরের হাঁটুর মালাইটি জোড়া লাগিয়ে ঠিকমতো সেট করে সেরে তুলতে পেরেছেন। সে এখন পুরো সুস্থ। কেবল ঠিকমতো হাঁটা অবজারভেশানের জন্য রাখা হয়েছে।

চিকিৎসকরা স্যাটিসফায়েড হলেই তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। আবীর বলে সে এখন পুরো সুস্থ।

টপ টপ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে লাবীবার।

আবীর সান্ত্বনা দেয়, কী আছে কাঁদার! আমি তো আগের মতোই হাঁটতে পারছি। ডাক্তাররা ছেড়ে দিলেই আমি দেশে চলে যেতে পারব।

না না। আমি তোমাকে যেতে দেব না। একদিন জেদ করেছিলাম বলে তুমি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে। তোমাকে আমি কত্তো খুঁজেছি, কোথায় না কোথায় খুঁজেছি। পাইনি। আজ আর জেদ করতে চাই না, তোমাকে আর আমি হারাতে পারব না আবীর। আর হারাতে পারব না।

আবীরের শিয়রে মুখ গুঁজে লাবীবা কাঁদতে থাকে। আবীর লাবীবার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিতে থাকে।

একজন বিমান পাইলটের পথ হারানোর গল্প

আহমদ হোসেন হেলাল

স্মার্ট সুদর্শন বৃটিশ নাগরিক রফিক হায়দার একজন পাইলট। তার স্ত্রী অতি রূপবতী ইটালি মডেল মারিয়া। রফিক আন্তর্জাতিক রুটে বিমান ৭৪৭ বোয়িং পরিচালনায় দক্ষ একজন পাইলট। পৃথিবী বিখ্যাত বিমান সংস্থা তাকে তাদের কোম্পানিতে কাজ করতে আগ্রহ জানিয়েছে।

কিন্তু এখন মেধাবী পাইলট রফিক বছর কয়েক ধরে সিলেটে গ্রামের বাড়ি বসবাস করছেন। বাবা মায়ের কবরের পাশে বিড়বিড় করেন আর ঘুরাঘুরি করেন। মা-বাবা কেউই বেঁচে নেই। একমাত্র সন্তান রফিক বাংলাদেশে অনেক দিন আসে নাই। স্ত্রী মারিয়াকে নিয়ে বিবাহিত এক ঘোর লাগা জীবনে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আজ জীবনের চরম দুঃসময়ে মা-বাবাকে তার বারবার মনে পড়ছে।

পাইলট রফিককে নিয়ে এলাকায় অনেক আলোচনা হচ্ছে। পাগল নাকি রহস্যময় এক মানুষ। ঢাকা থেকে ইংরেজি পত্রিকার সাংবাদিক ও গবেষক নাসরিন খান এসেছেন। পাইলট রফিক হায়দারের সাথে দেখা করে একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট বা প্রতিবেদন লিখবেন।

নাসরিন খান মুখোমুখি হতেই পাইলট রফিক নিশ্চুপ তাকিয়ে আছেন। ইনফিউরিটি কমপ্লেক্সে বা কনফিউশন ডিপ্রেশনে আক্রান্ত চাহনিতে স্পষ্ট। নাসরিন খান কিছুটা ভয় অপ্রস্তুত অবস্থায় সালাম দিয়ে নিজে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে দৃঢ়ভাবে বলছেন, কেমন আছেন পাইলট সাহেব? আপনি বড়ো বড়ো বোয়িং ৭৪৭ আর ৩৮০ বিমান ইউরোপ ও আমেরিকার আকাশে চালাবেন।

আর ভয়ে ভয়ে বলছেন,আপনি অভিজাত চাকুরি ছেড়ে মা-বাবার কবরের পাশে বন জঙ্গলে ভবঘুরের মতো বেড়াচ্ছেন। এই এসব বোকামি আর পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। মা-বাবার কবর জিয়ারত দোয়া তাসবিহ তাহলীল পড়বেন। তা খুব ভালো আল্লাহ খুশি হবেন। মা-বাবার কবরের ও পরকালের শান্তি আসবে। এমনকি আপনি লন্ডনে বসে মা-বাবার জন্য দোয়া করতে পারবেন। আর আপনি গ্রামে পড়ে রয়েছেন তা কোনো লাভ হচ্ছে মনে হয় না।

ইউরোপে বসবাসকারী স্মার্ট মানুষের এই অবস্থা মানায়? ছেঁড়া জামাকাপড় পরে আছেন। আপনাকে খুঁজতে আমার দুই দিন চলে গেছে। আমার বেশ ক্ষুধা লাগছে। আপনার ঘরে বা রেস্টুরেন্টে কিছু খেতে হবে। কৌশলী সাংবাদিক নাসরিন

খান পকেট থেকে বিস্কুট বের করে রফিক হায়দারকে কিছু বিস্কুট দিলেন আর তিনি সবুজ ঘাসের মধ্যে বসেই নাবিস্কো বিস্কুট খাচ্ছেন।

সাবেক বিমানের ক্যাপ্টেন বিশাল আকাশের দিকে দৃঢ়ভাবে তাকিয়ে থাকা বীর যেন সাংবাদিক নাসরিন খানের প্রশ্নবানে ইতস্তত বোধ করছেন। চুপচাপ অন্যদিকে তাকিয়ে লজ্জা বোধ করছে। কিন্তু কঠিন সাংবাদিক নাসরিন খানের বারবার প্রশ্নের অনেকক্ষণ পর উত্তরে ক্যাপ্টেন রফিক ইংরেজিতে বললেন, I trust my Italian wife. She cheated me. I lost everything. Now I am hopeless, leave me alone, জবাবে নাসরিন খান বেশ রাগ করে বললেন, we're all sometimes hopeless, suffering pain but brave people face all the pain, finally God gives rewards for everything.

নাসরিন আবেগ নিয়ে বলেন, দেখুন আমি ঢাকা থেকে এসেছি। কিন্তু এই এলাকার মেয়ে, আমি এক বিত্তশালীর ছেলেকে ভালোবাসতাম। সে আমার সাথে ভালোবাসার চেয়ে দৈহিক সম্পর্ক ভালোবাসতো। একদিন সে আমাকে ধর্ষণ করেছিল। সে আমাকে বিয়ে করবে না। আমার প্রেমিক আমাকে প্রায় ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিল। তার পিতামাতার আমাকে পছন্দ নয়। কয়েক বছর আমি মনে অনেক কষ্ট নিয়ে সাংবাদিকতা করছি।

ক্যাপ্টেন রফিক মুচকি হাসি দিয়ে বলেন, আমি বেশ হতাশাগ্রস্ত মানুষ। Thank you very much top class journalist Nasrin Khan. আমাকে কথাগুলো আগে কেউ বলেনি। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আমার চেয়ে কষ্টের মধ্যে আছে তা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

নাসরিন খানের সরাসরি কথা, তাহলে চলুন আমরা শহরে যাই। আপনার চুলগুলো অনেক লম্বা হয়েছে। আপনি অত্যন্ত সুদর্শন একজন মানুষ। কী অবস্থা করেছেন শরীরকে! আপনার জামা কাপড় পুরাতন ও ছেঁড়া দেখা যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে আপনার জীবনের কষ্টের কথাগুলো শুনব। আমার সাথে সহকর্মী একটা মেয়ে আছে। আরেকজন ড্রাইভার আছেন। রিপোর্ট লেখা শেষ হলে আমাকে ঢাকায় শীঘ্রই ফিরতে হবে ।

ক্যাপ্টেন রফিক বললেন, শুনেন সাংবাদিক নাসরিন খান।

আপনি ৩/৪ দিনের মধ্যে আমাকে এক গভীর অন্ধকার জীবন থেকে ফিরিয়েছেন। অশেষ কৃতজ্ঞতা আপনাকে কিন্তু আপনার সম্বন্ধে কিছু বললেন না, আপনার বাড়ি কোথায় আর বিবাহ করেছেন কি? নাসরিন খান বললেন, আপনি আমাকে তুমি বলবেন। আপনি একজন বড়ো অফিসার মানুষ। বাদ দিন আমার কথা। কিন্তু ক্যাপ্টেন রফিক বললেন,

আপনাকে বলতেই হবে। নাসরিন খান বললেন, তাহলে শুনুন। আমার গ্রামের বাড়ি আপনাদের এলাকায়। ঢাকায় ইংরেজি পত্রিকায় কাজ করি। আপনার বিষয় বেশ জটিল তাই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ আমাকে পাঠিয়েছেন।

যার সাথে আমার বিবাহের কথা ছিল তার পরিবার আমাকে পছন্দ নয়। এমনকি যাকে ভালোবাসতাম সে আমার সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

রফিক বললেন আমার ভাগ্য আপনার সাথে বেশ মিলে যাচ্ছে। আমার সুন্দরী ইটালিয়ান স্ত্রী সে আমাকে ছেড়ে অন্যকে ভালোবেসে চলে গেছে।

আসলেই একজন নারী একজন পুরুষকে যন্ত্রণার মহাসাগরে ফেলে দিতে পারেন আবার এক নারী স্বামীকে শান্তির ভুবনে রাখতে পারেন।

পাইলট রফিক বললেন, আমার স্ত্রী মারিয়া বিশ্বাস ভেঙে দিয়ে আমার বাড়ি টাকা সবই নিয়ে গেছে। তাই নাসরিন খান আমার কষ্টের জীবনের কথা আপনার পত্রিকায় ছাপানোর প্রয়োজন নেই। কিছু কষ্ট নিজের সংগ্রহে থাকা উচিত।

শহরে গিয়ে শপিংসহ নানা কাজে দুইদিন কেটে গেলো। রাতের খাবার খেয়ে নাসরিন ক্যাপ্টেন রফিককে বলল, আমি আগামীকাল সকালে ঢাকা চলে যাচ্ছি।

ক্যাপ্টেন রফিক বললেন, নাসরিন খান আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই কয়েক ঘণ্টায় পরম করুণাময়ের কৃপায় আপনি নিরাশার অন্ধকার থেকে আমাকে আশার আলোতে নিয়ে এসেছেন। আমার শেষ কথা হলো, আমি আবারও বিমান চালানোর পেশায় যোগদান করব।

কিন্তু নাসরিন খান আপনি আমাকে কথা দিতে হবে । আমার সাথে সারাজীবন ককপিটে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য থাকতে হবে। প্রস্তুত আছেন তো, নাসরিন খান পাইলট রফিক হায়দারের কথায় কিছুটা অপ্রস্তুত, হতবাক, আনন্দিত কিছুটা লজ্জার হাসি লেগেই আছে, love is not what you say, love is what you do...

শূন্য থেকে সূচনা

নুরুল হক

ঘরভর্তি কোলাহল। তাদের যাবার খবর বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। বিলেত যাবে পরিবারটি, দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে। অথচ এই আনন্দময় মুহূর্তে চারপাশের মুখগুলো যেন বিষাদে কালো। কেউ মুখ ফুটে বলছে না কিছু, কিন্তু অন্তরের গভীরতম কোণ থেকে ঈর্ষার ঢেউ উঠছে।

বাবা পরিবারের প্রধান, যিনি তাদের এই যাত্রার দিশারি। বয়সের ভারে আর অসুস্থতায় ক্লান্ত। চোখের নিচে কালো ছাপ, শরীর ভেঙে পড়েছে। কিন্তু তিনি জানেন, তার ওপর নির্ভর করছে পুরো পরিবার। হয়তো তার সময় ফুরিয়ে এসেছে, তবু তিনি মনে মনে বলছেন, "আমার পরিবারকে নিয়ে গড়ে দেব এক নতুন পৃথিবী।"

বিদায়ের আগে আত্মীয়স্বজনদের আচরণ ক্রমেই বিষাক্ত হয়ে উঠল। এক অদ্ভুত নিস্তব্ধ শত্রুতা যেন ঘিরে ধরল তাদের। কিছু কথা সরাসরি বলা হলো, কিছু কথা চাপা হাসির আড়ালে। কেউ হয়তো একটু সহানুভূতির ভান করল, কিন্তু সেই ভানের পেছনে লুকিয়ে থাকা ঈর্ষার ছায়া স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

"তোমাদের আর এই দেশে মন বসল না! এত সুখ-শান্তি ছেড়ে কেন চলে যাচ্ছ? ওই বিলেতে গিয়ে সুখ পাবে, নাকি বুঝবে কোথায় ভুল করেছ?" এক আত্মীয় বিষাক্ত কণ্ঠে বলল।

"তোমাদের গিয়ে যদি ভালো হয়, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু এত গর্বে বুক ফুলিয়ে যেতে হবে? ভেবেছ বিলেতে গিয়ে তো রাজা-বাদশা হয়ে যাবে, তাই না? এখানে আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো বড়ো হও কীভাবে? যখন ফকিরের মতো ফিরে আসবে কেউ আর ভিক্ষেও দিবে না"

আরও একজন যোগ করল, গলায় এমন এক ব্যঙ্গ, যা আঘাত করার জন্য যথেষ্ট।

কেউ কেউ সরাসরি বাবাকে লক্ষ্য করল। "তোমার শরীর এমনিতেই ভালো না। বিলেতের ঠান্ডায় গিয়ে কী করবা? ওইখানে গিয়ে মরেও যেতে পারো। ভাবছ, আমরা বুঝি তোমার খোঁজ নেব? কীভাবে চলবে তখন তোমার পরিবার? মরার জন্য বিলেত যেতে হবে কেন এখানেই তো মরতে পারো"

কথাগুলো এমনভাবে বলা হলো যেন এতে সহানুভূতি আছে, কিন্তু আসলে এটি ছিল আরেকটি বিষাক্ত তির।

"এই জমি-জমা, যা রেখে যাচ্ছো, আমাদের ছাড়াও দেখার কেউ থাকবে না। ফিরে এলে যদি কিছু না পাও, তখন আবার আমাদের দোষ দিও না।" কথাটা বলার সময় একজন আত্মীয় এমনভাবে হাসল যেন এই ভবিষ্যদ্বাণী তাদের আনন্দ দেয়।

বাবা সব শুনলেন, কিছু বললেন না। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ স্পষ্ট। তার শরীর ক্লান্ত, তবু তার মাথা নিচু হলো না। বিদায়ের আগের রাতে, যখন সবকিছু গুছিয়ে নেওয়া শেষ, তখন তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "আমরা যাচ্ছি আমাদের সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য। যদি তাতে কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, আমাদের ক্ষমা করে দিয়ো। কিন্তু মনে রেখো, আমরা এখানে কারো থেকে কিছু ছিনিয়ে নিচ্ছি না। আমাদের নিজের মতো করে পথ খুঁজছি।"

বাবার কথা শুনে চারপাশে এক মুহূর্তের নীরবতা নেমে এলো। কেউ কিছু বলল না, কিন্তু তাদের

চোখেমুখে সেই নীরব বিদ্বেষ ঠিকরে পড়ছিল। কেউ মনে মনে হাসল, "যাও, দেখি কত দূর যেতে পারো। ফিরলে দেখব তখন কী হয়!"

এভাবেই চারপাশের বিষাক্ত পরিবেশ পেছনে ফেলে পরিবারটি যাত্রা শুরু করল। বাবা, যিনি পরিবারের শক্তি, তার অসুস্থ শরীর নিয়েও এমন একটি অভিশাপমাখা পরিবেশ থেকে বেরিয়ে তাদের নতুন জীবনের দিকে পা বাড়ালেন।

তারপর সেই পরিবারটি বেরিয়ে পড়ল। অসুস্থ বাবার কাঁধে একটি ছোটো ব্যাগ, আর তার চোখে

বিষাদমাখা দৃঢ়তা।

বিলেতে পৌঁছানোর এক সপ্তাহ পরই সেই চোখ দুটি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। নতুন দেশে নতুন

জীবনের প্রথম অধ্যায়েই বাবা সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন। যেন এই পথ চলার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে তার শরীর আর লড়াই করতে পারল না। পরিবারের ছোটো ছোটো সন্তানরা বাবার মৃতদেহের সামনে স্তব্ধ। তারা বুঝতে পারছে না, এই শোক তাদের জীবনে কতটা শূন্যতা নিয়ে এলো।

মায়ের পক্ষে সে শূন্যতা মেনে নেওয়া সহজ হয়নি। একটি অচেনা দেশে একা একা সব সামলাতে

হবে। কিন্তু মা ভেঙে পড়লেন না। বাবার চাওয়া যেন তার প্রতিটি শ্বাসের সঙ্গে মিশে গেল। সন্তানদের তিনি শক্ত হাতে আগলে রাখলেন। বাবার স্মৃতি আর কথা তাকে প্রতিদিন সাহস জোগালো।

প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে কাজ খুঁজতে বের হতেন মা। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে

বিভিন্ন বাড়ি, অফিসে গিয়ে নিজেকে সাহায্যের জন্য প্রস্তাব দিতেন। কেউ কেউ করুণা করে তাকে সামান্য কাজ দিত, কেউবা তাড়িয়ে দিত। তবু তিনি থামলেন না। সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করালেন। রাতের বেলা তাদের পড়াতে বসতেন। নিজের

কষ্ট লুকিয়ে, চোখের জল মুছে সন্তানদের সামনে হাসি ধরে রাখতেন।

বছর গড়ালো। সন্তানরা বড়ো হলো, মায়ের কষ্ট বুঝতে শিখল। বাবার কথা মনে পড়লে তারা শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। মনে হতো, বাবা যেন উপর থেকে তাদের দেখছেন। এই অনুভূতিই তাদের নতুন জীবন গড়ে তোলার শক্তি জোগালো।

যে আত্মীয়রা বিদায়ের দিন তাদের নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল, তারা এখন অনেক দূরে। আর যাদের কাছে সাহায্যের আশায় তারা গিয়েছিল, তারাও ছিল নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন। তবু এই পরিবারটি শিখে গিয়েছিল, নিজের শক্তিতেই কষ্ট জয় করতে হয়। তারা একসময় প্রতিষ্ঠিত হলো। সন্তানেরা বড়ো চাকরি পেল, নিজেদের ঘর বানালো। তবু বাবার সেই ছোট্ট স্বপ্নটি তারা কখনো ভোলেনি।

আজও, এই পরিবারের গল্প শুনলে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে। যে ঈর্ষা, যে অবহেলা, যে শূন্যতার মধ্য দিয়ে এই পরিবারটি তাদের যাত্রা শুরু করেছিল, তা কি সত্যিই মানুষের জীবনকে উন্নত করে? নাকি মানুষের মনুষ্যত্বকেই শেষ করে দেয়? এই গল্প আমাদের শিখিয়ে যায়, জীবনের প্রতিটি বাধা, প্রতিটি শূন্যতা আসলে এক একটি শক্তির পরীক্ষা।

বাবা বেঁচে নেই। কিন্তু তার স্বপ্নের আলো আজও প্রতিটি মুহূর্তে এই পরিবারকে পথ দেখায়। শূন্য থেকে শুরু করেও জীবনের শিখরে পৌঁছানো সম্ভব–যদি আমরা একে অপরকে অবহেলার পরিবর্তে ভালোবাসা দিতে শিখি।

শান্তির নীড়

নূরজাহান শিল্পী

দিনশেষে প্রতিটি জীব তার আশ্রয়স্থলে ফেরে। একটি পাখিও সন্ধ্যা নামার আগে ডানা মেলে নিজ নীড়ে ফিরে আসে। মানুষও ফেরে–যদিও তার নীড় কেবল আশ্রয় নয় বরং স্মৃতির সিন্দুক। সেই ঘরে জমে থাকে জীবনের সমস্ত হাসি-কান্না, পাওয়া-না-পাওয়ার হিশেব।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি,
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল
ভরে নিয়ে যায় ঘরে।"

মানুষের ঘর শুধু দালান নয়, সে এক অনুভবের জায়গা, নির্ভরতার ঠিকানা।

এমনই এক দিনে বৃদ্ধাশ্রমের অফিস কক্ষে এসে পৌঁছালেন জন ও তার স্ত্রী। আশির ধারে বয়স জনের। ক্যান্সার তার শরীরে বাসা বেঁধেছে এবং এখন শেষ স্টেজে। জনের স্ত্রী চাকরি করেন দেশে নয়, প্রবাসে। বাসায় কেউ নেই, আর তিনিও নিজে এত অসুস্থ যে সারাদিন জনকে দেখাশোনা করার ক্ষমতা আর অবশিষ্ট নেই।

দুজনেই চুপচাপ। কাগজপত্রের প্রসেসিং চলার সময়ও দুজনের হাত ছিল একে অপরের হাতের মাঝে। চোখে মুখে যেন একটা নীরব প্রতিজ্ঞা–একসাথে ছিলাম, একসাথেই থাকব।

কিন্তু বাস্তবতা বড়ো নির্মম!

চূড়ান্ত মুহূর্তে মিসেস জন জনকে বললেন, "John, I promise to go home and get everything ready and pick you up, darling."

জন ছোটো বাচ্চার মতো বললেন, "আমি তোমার সাথেই যাব।"

কিন্তু স্ত্রীর চোখে ছিল অব্যক্ত কষ্ট–যাওয়ার বেলায় কপালে একটি চুমু এঁকে দিয়ে বললেন, "তুমি থাক, আমি যাব আর আসব।"

জন কিছু না বলে তাকিয়ে রইলেন স্ত্রীর চলে যাওয়ার দিকে। চোখ দুটি তখন ভেজা, অসহায়তায় টইটুম্বুর। ঠিক সেই মুহূর্তে, জন আবেগে সামলে উঠতে না পেরে চুমু খেতে গিয়ে ভুল করে পাশে দাঁড়ানো নতুন তরুণী নার্সকে চুমু খেয়ে ফেললেন। মেয়েটির গাল লাল হয়ে উঠল টমেটোর মতো, কিন্তু সে নিজেকে সংবরণ করে

বলল, "Come on John, I'll show you to your room."

নার্সের হাত ধরে জন এগিয়ে গেলেন, তবে বারবার পেছনে ফিরে তাকালেন। চোখে ছিল এমন এক অসহায়ত্ব, যা ভাষায় বলা যায় না।

আমি সব দেখছিলাম। বুকের ভিতর যেন কিছু একটা ধক করে উঠল। মনে হলো, বয়সের সাথে মানুষ কেমন করে নিঃসহায় হয়ে পড়ে। বিশেষ করে প্রবাসে, যেখানে ঘর মানেই হয়তো চার দেয়ালের ভেতর কিছু আসবাব, কিন্তু ভালোবাসার স্পর্শ দূরের এক গল্প হয়ে দাঁড়ায়।

এমন জনদের মতো আরও অনেকে এখানে আসে।

কারও স্মৃতির পাতা ঝরে পড়ে গেছে–আজ কী দিন, নাম কী, কেউ ছিল কি না–সব কিছুই ভুলে গেছেন। বৃদ্ধাশ্রমের করিডোর ধরে হাঁটেন, একেকজন যেন নিজেদের ভেতরেই হারিয়ে গেছেন। কেউ কেউ সারাদিন এক জায়গায় বসে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকেন–হয়তো কিছু খুঁজছেন, হয়তো কিছু মনে করার চেষ্টা করছেন। কারও চোখে অনন্ত বিস্ময়, কারও চোখে কষ্টের ক্লান্তি , কেউ একই কথা বারবার বলে যাচ্ছেন, আবার কেউ কেউ এসেছেন জীবনের মাঝপথে সব হারিয়ে। সন্তান দূরে, সঙ্গী নেই, বন্ধু নেই। এমনই একজন, মিসেস এনজি, প্রতিদিন চুপচাপ চা হাতে বসেন লাউঞ্জে। কেউ আসুক, কথা বলুক, এই আশায়। তিনি ভুলে গেছেন নিজের ছেলের নাম, কিন্তু প্রতিদিন দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন–হয়তো মনে মনে ভাবেন, আজ বুঝি সে আসবে।

এই মানুষগুলো কী চায়?

তারা চায় একটু আশ্রয়, একটু শ্রদ্ধা, একটু কথা–হয়তো একটি গান, বা কারও হাতের স্পর্শ। সেই প্রাচীন অনুভূতির ছায়া, যাকে বলা যায় "ঘর"–যেটি কেবল একটি দালান নয় বরং শান্তির নীড়।

এ কারণেই তো কেয়ারহোমগুলোতে এখন এত চাহিদা। কারণ, জীবনের শেষপ্রান্তে মানুষ ফিরে যায় একেবারে শৈশবে–যেখানে নিজে কিছু করতে পারে না, সবকিছু করে দিতে হয়। যত্ন লাগে, স্নেহ লাগে, আর সবচেয়ে বেশি লাগে–একটু মমতা।

কিন্তু যারা প্রিয়জনকে রেখে যায়, তারাও কম অসহায় নয়। তারা ভালোবাসে, কিন্তু কাজ করে, জীবনের সঙ্গে লড়ে। তাদের হাতে সময় কম, সমর্থন আরও কম। তবুও চেষ্টা করে–যেন শেষ বেলার দিনগুলোয় প্রিয় মানুষটি কিছুটা হলেও যত্ন আর সম্মানের স্পর্শ পায়।

সত্যিই, একটা ঘর কেবল আশ্রয় নয়–সে এক শান্তির আলয়, হৃদয়ের সবচেয়ে কোমল অনুভবের স্থান।

কখনো সে হয় চোখভরা জল, কখনো তা হয় স্মৃতির আবরণ। কিন্তু প্রতিটি হৃদয়ই চায়, তার একটি ঘর থাকুক–শেষ দিনেও, শেষ নিঃশ্বাসে।

কবিতা

বন্ধুরা

আবুল কালাম আজাদ ছোটন

জীবনে তো অনেক কিছু লেখা হয়েছে
আজকে না হয় তোমাদের নিয়ে একটু লিখি
বন্ধুরা তোমরা তো আমার হৃদয়ের স্পন্দন।
সারা বেলা মৌমাছির মতো আমায় জড়িয়ে
কলরব দিয়ে পাশে পাশে থাকো
সময় অসময়ে ভালোমন্দ আমায় ডাকো
অন্তর দিয়ে প্রাণভরে আমায় কত ভালোবাসো
কত শান্তি, মোলায়েম স্পর্শ তোমাদের
হৃদয়ে আকুল করে জ্বলে উঠে বন্ধু ডাকে
মায়াবী অন্তর হতে জাগ্রত সুধা তোমাদের জন্য আসে কত মায়া মমতা।

বিলিয়ে দাও তোমাদের ভালোবাসা আমায়
চিরদিন আগলে রাখো বটবৃক্ষ হয়ে ছায়া বিলিয়ে।

তোমাদের সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত
ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি ভেজা সময়গুলো
কত যে আনন্দ উপভোগ করি
সেজন্য বলি একবার নয় হাজার জনমে
তোমাদের বন্ধু হতে চাই।

জীবন চলার রেলগাড়িতে মাঝপথে আসতে
দুমড়ে-মুচড়ে যখন ডানাভাঙা পাখির মতো কাতরাই
রবি মামার মতো রশ্মি বিলিয়ে তোমাদের
আমার চারিপার্শ্বে ছড়ায়

এভাবে তোমাদের দেখা পাই যেন মরণকালে
বন্ধুত্বর অটল বন্ধন যেন
না ভাঙে এ জীবন কালে।

জীবনে মরণে থাকি যেন
একই সুতার মালা বন্ধনে।

সুরমা জলের চোখ

আসমা মতিন

প্রেমের আগুন কতকাল জ্বলেছিল,
সময়ের হাতে ছিল না নিভানোর অবকাশ।
একটি দীর্ঘ, লীলাময় কাল
চুপিচুপি পুড়ে গেল নিঃশব্দে।

কফি টেবিল অভিজাত বিন্যাসে প্রতিদিন ধার করা
কিছু মুহূর্ত। কখনো কখনো সেগুলো চলে যায় কফিহাউজে;
যেখানে শব্দেরা রমা রায় কাহিনির মতো
ঘোরে, আড্ডার চুম্বকে সময় হয়ে দাঁড়ায়।

টেবিলের ওপারে হঠাৎ এক ধনুকী আলিঙ্গন জড়ায় বাতাসে,
আর এপারে বসে থাকে এক রমণী, মৌনতার মতো নিস্তব্ধ,
কপালে আঁকা নদীর রেখায় ঝরে পড়ে গোধূলি।

সেই সন্ধ্যাবেলায়, সে নিজের মধ্যে নিজের শপথে রয়ে গেল,
নিঃশব্দে, অপূর্ণ।

কথা দিয়েছিলে;
জন্মান্তরের কোনো এক আলোর গলিতে যদি দেখা হয়,
খোলবে সেই অবগুণ্ঠন, বলবে;
"কোথায় পেলে এমন চোখে সুরমা জলের নদী?"

মধুযামিনীর বুকে,
সে তখন এক ফালি হাসি লুকাবে
ধ্রুপদী পোড়া দাগে জেগে থাকা এক পুরোনো গান হয়ে।

ভিন্ন চিন্তন

ঊর্মিলা আফরোজ

শান্তির রং কী? সব রঙের মিশ্রণে যে মহাপ্রসন্ন শান্তি অনুভূত হয়, তারই বা স্বরূপ কী? শান্তিকে কি ধরা যায়, অথবা অনুভব করা যায়? ছোটোবেলায় পড়া একটি গদ্য প্রবাদ বাতাসে ভেসে এসে কানে ধাক্কা দিলো; বলল, শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্ব ভুবন মাঝে। দৈনন্দিন কাজ, জীবনযাপন, আশা-ভরসা সবই আমরা শান্তিতে করার প্রয়াস করি, তাই নয় কি? মন কী বলছে? আমি নিশ্চিত শান্তি হাসছি, হাস্যোজ্জ্বল শান্তিচারিণী আমার এই আমি ধরণীতে–আমার স্বর্গরাজ্যে বসবাস করছে নিরন্তর। কথার মাঝে যে অন্তরালে–সেইখানে সত্য নিহিত–জীবনের অশান্ত প্রবাহে আমি কোথায়? এই পরিবর্তন ধারায় আমি আমাকে দেখেছি, নিরন্তর সব লুটপাট হওয়া কর্মের ফল আবারও পুনর্জাগরণ, আদর্শ ভালোবাসায় সাজানো সত্য যুগে বসবাস এখন এর চিরতরে। পরিচ্ছন্ন চেতনায় বসবাস আমার সমগ্র সত্তা লৌকিক অলৌকিক সংসারকে পালন করতে চির প্রস্তুত। শুভ ভাবনা থেকে নব জগতে আমার বংশধরদের সুখী পদচারণা। চিরকৃতজ্ঞ সূক্ষ্ম বাতাবরণ আমাদের লালনে সচেতনে স্নেহের দৃষ্টি দিয়ে আগলে রাখছে নিরন্তর।

ভালোবাসার আগ্রাসন

ফয়জুল ইসলাম ফয়েজনূর

এই পৃথিবীময় শুধু ভালোবাসাই সংক্রমিত হোক, শুধু
ভালোবাসারই আগ্রাসন ঘটুক।
হৃদয়ের জমিনে নিরলসভাবে শুধু ভালোবাসারই
চাষ-পরিচর্যা করে যাই। আর সঞ্চিত সেই পরিপক্ক
ভালোবাসাটুকু বিলিয়ে দেই আকাশে বাতাসে বিশ্ব চরাচরে।

এই পৃথিবীময় শুধু ভালোবাসাই সংক্রমিত হোক,
শুধু ভালোবাসারই আগ্রাসন ঘটুক।
ভালোবাসার পদ্মপুকুর থেকে মুঠো মুঠো ভালোবাসা
বিলিয়ে দিই মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে।
কবিদের কলম থেকে শুধু ভালোবাসারই পঙ্‌ক্তিমালা নিসৃত হোক!

এই পৃথিবীময় শুধু ভালোবাসাই সংক্রমিত হোক,
শুধু ভালোবাসারই আগ্রাসন ঘটুক।
আমরা হারিয়ে যাবার আগেই যেন ভালোবাসার
শত তাজমহল গড়ি প্রিয় মানুষদের হৃদয়ে হৃদয়ে।

এই পৃথিবীময় শুধু ভালোবাসাই সংক্রমিত হোক,
শুধু ভালোবাসারই আগ্রাসন ঘটুক। আমাদের ভালোবাসা
নিষ্ক্রিয় করুক পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণঘাতী মারণাস্ত্র,
সকল ক্ষেপণাস্ত্র! ভালোবাসার সংগীতের মূর্ছনায়
আন্দোলিত হোক মানুষের হৃদয়-মন।
এই পৃথিবীময় শুধু ভালোবাসাই সংক্রমিত হোক,
শুধু ভালোবাসারই আগ্রাসন ঘটুক। পৃথিবীর তাবৎ
রাষ্ট্রনায়কদের হৃদয় শুধু ভালোবাসায় টইটুম্বুর থাকুক।
ভালোবাসা গুঁড়িয়ে দিক দেশে দেশে সকল চেকপোস্ট,
বিভেদের সকল কাঁটাতার, সুবিশাল প্রাচীর।

এই পৃথিবীময় শুধু ভালোবাসাই সংক্রমিত হোক,
শুধু ভালোবাসার আগ্রাসন ঘটুক। ভালোবাসার মধুর
আবেশে মানুষ শুধু হেসে-খেলে, সুখে-শান্তিতে বাঁচুক,

পাখিরা মুক্ত বিহঙ্গে ডানা মেলে উড়ে চলুক,
কলকাকলিতে মুখরিত থাকুক অরণ্য।

ভালোবাসার সংক্রমণে দূর হোক মানুষে-মানুষে
যাবতীয় হিংসা, বিভেদ, ঘৃণা ও বিদ্বেষ!
এই পৃথিবীময় শুধু ভালোবাসাই সংক্রমিত হোক!

মৃত্তিকার সাথে সখ্য

ফয়জুর রহমান ফয়েজ

নারী, তুমি নিষিদ্ধ ফল খাইয়েছ বলে,
স্বর্গ ছেড়ে এলাম।

অতঃপর একা এক মাঠের কিশোর,
মৃত্তিকার সাথে হলো গভীরে সখ্য,
পশু-পাখিদের সাথে হলো নিবিড় ভালোবাসা, মৈত্রী হলো
চাঁদের সাথে–তারার সাথে।

তারপরও তোমার সাথে–
হলো না কখনো হৃদয়ের লেনদেন।
এমন জটিল তুমি,
একেবারে অন্যরকম থেকে গেলে সারাটা জীবন।

কেন এইটা তেজারতি পেতে?
আমাকে করলে তুমি কেবলই নিঃশেষ।
অতল দিঘির জলে আমাকে ডুবালে শুধু,
তুমি তবু দিলে না একটু সাঁতার!

জীবনের আয়না

ফাহমিদা ইয়াসমিন

চোখ মেলে দেখি এক জীবনের ঝড়,
আলোর আড়ালে লুকায় কত জ্বর।
হাসি মুখে আড়ালে কাঁদে যে মন,
ব্যথার কথাগুলো কে রাখে গোপন?

রাস্তায় নেমে দেখি কত মুখ,
সবাই ব্যস্ত, কেউ দেয় না সুখ।
জীবনের ছকে আঁকা নিয়ম,
ভুলে ভুলে গড়া আত্মার মোম।

মুখোমুখি হাসাহাসি, পেছনে ছুরি,
ভালোবাসা যেন এখন শুধুই তুড়ি।
টাকা মানেই আজকে হৃদয়ের দাম,
মনের দুঃখ বুঝে না কেউ, করে বদনাম।

ভালো থাকার অভিনয় করে যাই খুব,
ভেতরে পুড়ে খাক, দহনে আজন্ম ডুব।
মায়ের মুখে চাঁদ, জমা থাকে অদৃশ্য আলো,
তবু তার ঘরে আঁকিবুঁকি অভাব কালো।

মৃত্যু আসে নিঃশব্দে, যেন চুপচাপ,
নিয়ে যায় সব, রাখে শুধু জমানো পাপ।
জীবন তো এক ভাঙা আয়না,
মেলে না পূর্ণ ব্যাখ্যা, আসে অযাচিত বেদনা।

তবু কেন যাই না থেমে? যদিও ছুটি ছলে-বলে
হয়তো আশা বাঁচিয়ে রাখে চোখের জলে।
ভাবি, আলো আসবে ঠিক চোখের পলকে
ভাঙা মনেও গাইব নতুন সুর-শ্লোকে।

নদী যেমন বয়ে চলে দূরে, বহুদূরে,
জীবনও তাই, ছোটে কোনো না কোনো সম্মুদ্দুরে।
তবু পথ চলা থামে না কখনো মৃত্যুই ভোগ্য,
হয়তো বাঁচাই জীবন, মৃত্যু নয় বরণযোগ্য।

অনুযোগ

মজিবুল হক মনি

আজ ভোরে পাখিদের সাথে আমার কথা হলো।
ক্লেইহলের আনন্দমুখর পাখিদের কুজনেই
আমার প্রাত্যহিক ঘুম ভাঙ্গে।
রিয়ার গার্ডেনে বসেই ওদের সাথে আমার কথা।

আজ আমাকে ঘিরে আছে–
ধূর্ত কাক থেকে শুরু করে কেচাল চন্দনা,
লেজ উঁচু রবিন থেকে সুকণ্ঠি সেরিন,
আন্তরিক কবুতর থেকে চঞ্চল চড়ুই
সুওয়ান, গ্রুজ, গানেটস, কুয়াইল সবাই এসেছে।

প্রতিদিন ইজিচেয়ারে বসে ওদের শাসন করতাম,
আজ ওরা অজস্র প্রশ্নবাণে আমায় শাসন করছে।

আজ আমি পাখিদের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে–
ওদের সুকঠিন জেরার কাছে
আমি নিতান্তই এক বিবাদি মাত্র।

ওরা বলে–
“তোমরা মানুষ, অনেক উচ্চাসনে তোমরা আসীন।
তোমাদের ধর্ম বিধান, রাষ্ট্র, সংবিধান, সবই আছে।
অট্টালিকা আলিশান, সংসদ মিজান সবই আছে।
প্রজ্ঞা প্রসারে মস্ত মস্ত বিদ্যাপীঠ সবই আছে।

ওরা বলে–
তোমরা মানুষ, অনেক উচ্চাসনে তোমরা আসীন।
তোমরা অনেক কিছুই পারো।
তোমরা অনেক নীচ হতে পারো,
চতুষ্পদীদের মতো ইতর হতে পারো,
নির্মম আর পিশাচ হতে পারো।
একে অন্যের সুখে আগুন জ্বালাতে পারো।

আমরা পাখিদের অনেক বিড়ম্বনা।
আমরা অনেক কিছুই পারি না।
আমাদের অনেক কিছুই নেই।
মাথার উপর কোনো বিধান নেই,
অনাগত বিপদের কোনো সংকেত নেই,
জীবন মানের কোনো প্রকৌশল নেই,
প্রকৃতিই আমাদের বিদ্যাপীঠ, আমাদের শিক্ষক।

আমরা প্রাণ খুলে গান গাই, উড়ে উড়ে সুর বিলাই।
কুজনে কুজনে মুখরিত করি মুক্ত আকাশ।
দল বেঁধে উড়ে চলি দিগন্ত থেকে দিগন্তে।

আর তোমরা?
তোমরা তো তোমাদের ভয়েই কাতর,
সুরের কণ্ঠ আর বীণার তারেও ভীতির ছাপ।
তোমরাই তো চেপে ধরো মুক্ত গানের কণ্ঠ,
প্রকাশ্য সড়কে কুপিয়ে কুপিয়ে–
মেরে ফেলো মেধা আর প্রজ্ঞাকে।
বোমা মেরে উড়িয়ে দাও জাগরণী গান।

তোমরা মানুষ, উচ্চাসনে তোমরা আসীন।
তোমরা সব চেনো,
আকাশ, সমুদ্র, অন্তরীক্ষ পাতাল।
তোমরা সব জানো–
ইনজিল, কোরান, ত্রিপিটক, পুরাণ,

তোমরা সব চেনো, সব জানো
কিন্তু মানুষ হয়েও, মানুষকেই জানো না।

আলোর আড়ালে লুকায় কত জ্বর।
হাসি মুখে আড়ালে কাঁদে যে মন,
ব্যথার কথাগুলো কে রাখে গোপন?

বারেবারে অনিবারে

লুৎফুন নাহার

থোকা থোকা ফুলের অভিসারে রাত দুপুরে চুপিসারে
প্রজাপতি কিংবা মৌমাছির বেশে, বাতাসে ভেসে
তোমার মনের ঘরে টোকা দিয়ে যাবই
শুনব না কোনো বারণ, থাকুক যত অকারণের কারণ
দিগ্‌বিদিক একাকার করে বিধুর হৃদয়ে বিন্দুসম আশ্রয় চেয়ে
জন্ম জন্মান্তরে ছুটে আসব তোমারই দিকে, মেঘ হতে
খসে পড়া বৃষ্টির ফোঁটার মতন; সূর্য হতে ছুটে আসা কিরণের মতো করে
ফুল হতে উড়ে আসা সুগন্ধির মতোই বারেবারে অনিবারে,
এক মেরু হতে অন্য মেরুর তরে; পথ ঘাট প্রান্তর পেরিয়ে কেবল তোমারই অন্তরে।

আরেকবার নির্বাসন চাই

শাহীন রশিদ

আরেকবার নির্বাসন দাও আমায়
যেখানে মানুষের সাথে বাস করে তার বিবেক
যেখানে রক্তপিপাসু হায়েনার দল
উৎফুল্ল হয় না জীবনের অবসানে
সেখানে আমায় নির্বাসন দাও আরেকবার।
বিবেক যেখানে বিচলিত হয় অবিচারে
বিচারক যেখানে মুখ মেহন করে না অধিকর্তার
সেখানে নির্বাসন দাও তোমার ন্যায় দণ্ডে।

যেখানে মৃত্যুদণ্ড নেই, আছে শোধরানোর সুযোগ
জীবন প্রদীপ যেখানে নির্বাপিত হয় না
পার্থিব প্রাপ্তির লোভ লালসায়
আমাকে নির্বাসিত কর আরেকবার।

প্রজার পরিচয়ে আমার এ বেঁচে থাকা বড়ো লজ্জার
একবিংশ শতাব্দীর এই ঊষালগ্নে।

প্রজাতন্ত্রের মুখে থুথু দিয়ে বলতে চাই
মুক্ত কর আমায়
জননী, নির্বাসন কর পুনর্বার আমায়।

ধ্রুপদী

সামছুল হক (শাহ্লম)

শোন, এ বাংলার মানুষ, শোন–এ আমার অপরাধ,
সারা বিশ্বে শোক প্রকাশে নিন্দার ভাষা কতই বাদ!
এ জাতি সভ্য হবে কবে–কেউ করে না প্রতিবাদ,
একাত্তর আর চব্বিশে নির্যাতন, হত্যা, দর্শন, বিবাদ।

অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, লজ্জা নাই কারো,
অশুত্বে, পশুতে পরিধান খোলে, পহর করেছে নর।
চিৎকারে যার আকাশ কাঁপে ধর্মের দিয়েছে বহর,
আমি জেগেছি এবার, থামাবার শক্তি নাই আর কারো।

আমার দেহে আগুন লেগে আমি হয়েছি আঙ্গার,
ছাড়ব না কাউকে, যে আমার অধিকার করেছে ছারখার।
আমি বিষাক্ত বেদনার বিষে ভরা বুকে করি তিরস্কার,
আমি মারব পরানে, বিষ দিয়ে যন্ত্রণায় তরে বারবার।

যেন সারা বিশ্বে শুনতে পায় তোমার অত্যাচারের ক্রন্দন,
আমার সম্ভ্রান্ত ফিরিয়ে দাও, না হয় আমি খাব রক্তনদী বন্ধন।
আকাশে, বাতাসে ধ্বনিবে আমার চিৎকার–এমন হবো,
শ্লীলতা হারানোর বেদনায় আমি হয়েছি আগুন, জানো তো?
সাগরের জলধি এনে পারবে না নিভাতে এ আগুন–হবে দ্বিগুণ,
এ অমানুষদের কাছে আমার প্রশ্ন আমার দোষ কোন গুণ?
দেশকে আমি ভালোবাসি, দলকে চাঙ্গা করি, রাখি হুঁশ,
তাই তো আমি মানুষ! হ্যাঁ, আমি মানুষ, আমি মহাপুরুষ।

আমি মহাবীর, মহানারী, মহাবিপর্যয়ে মহাপুরুষ,
মানুষরূপে তোমরা যে অপরাধ করেছ জানো কি রে
ধর্মের নামে জুলুম করে নির্যাতন করতে বলেছে কি
আমার অনলে তোমাদের পুড়িয়ে দেবে নন্দিত বিশ্বে।

সেদিন, যে আমার শালীনতায় করেছিলে হানি অদৃশ্যে,
আমার আওয়াজে আসমান ফাটে–লজ্জা নিলে না অন্ত দেশে।

তোমাদের অন্তরে বিদারক বিবেকের বাঁধন নেই, তাই চুপ,
আমি আজ আগুন, তার চেয়েও দ্বিগুণ শক্তিতে হয়েছি রূপ।

তোমাদের কাছে আসছি–দাঁড়াও একটুখানি,
দাঁড়াও! আগে বলো, কোন অপরাধে করেছিলে উলঙ্গ আমার বাণী?
ধর্মের হাতিয়ার কে তুলে দিয়েছিল তোমাদের নিষ্ঠুর হাতে?
আজ আমার হাতে শক্তি দিয়েছে বিধাতা, সবার মাথার ত্রাণকর্তা।

সে যিনি আমাকে ও তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সমান অভিজ্ঞতায়,
আমি এসেছি তার শক্তি নিয়ে–তোমাদের ধিক্কার জানাতে হৃদয় জুড়ায়ে।
তোমরা নির্লজ্জ জাতি–কেন আজ চিৎকার করো ব্যথায়?
আমাকে গণধর্ষণ করে করেছিলে অপমানিত–আছো কি লজ্জায়?

আমি এসেছি তার প্রতিকার নিতে–হয়ে মহা বিরুদ্ধ,
আমি আর একা নই–তোমাদের পশুত্বের বিপরীতে হয়েছি সম্রাট শুদ্ধ।
আমার জনতা তোমাদের ঘৃণা করে, থু থু ফেলে পথে পথে,
তোমাদের হৃদয় হয়েছে পাথর, বিবেক ডুবে আছে খালের পুকুরে।
যতদিন থাকবে "বাংলা" নাম–ততদিন থাকবে "মীরজাফর"-এর কলঙ্ক,
আমার বাঙালিরা তোমাদের ডাকবে বিশ্বাসঘাতক, ঘৃণার অঙ্ক।
তোমাদের বংশধর, তোমাদের দেখবে তাচ্ছিল্যে, ঘৃণায়,
আমার শালীনতা যখন বস্ত্র হয়ে ঢাকবে তাদের হৃদয়ছোঁয়ায়।

বুক ফেটে, মুখ ফুটে বলবে–"আমরা বাঙালি, বাংলাদেশি!"
জয় বাংলা, জয় বাংলা যুগে যুগে, জয় আমাদের হবে।

সায়র

সৈয়দ আফসার

বিভ্রমে যায় বেলা, যায় রাত্রি হতে ভোর
হে হৃদয়, মোরাকাবায় বসে একবার ভাবো–
আমি হতে তুমি কতদূর?
আমাকে গ্রহণ করো–আদর ও চুম্বন বুকে দাও এঁকে
জীবনের বাঁকে-বাঁকে অমৃতস্পর্শ মুগ্ধ করে আমাকে
স্পর্শ রেখেছি ঢেকে আড়ালে, শান্ত পোশাকের ফাঁকে
আমি এক নিঃসঙ্গ মানুষ, সব হারাই অপলক চোখে...

বিভ্রমে যায় বেলা, মনেও দাও দোলা, অগোচরে
তুমি জল হলে, ভেসে রবো আমি জলের উপরে
বহুপথ মাড়িয়ে রয়েছি দাঁড়িয়ে, তোমার সায়রে!

তোমাকে মনে পড়ে

সাইফউদ্দিন আহমেদ বাবর

তোমাকে মনে পড়ে, মাঝে মাঝে মনে পড়ে,
অলস সময় যখন-স্মৃতির ঝাঁপিটা খুলে বসে
কিংবা গোধূলি লগ্নে আত্নভোলা মনের বেখেয়ালে
তোমাকে মনে পড়ে।

তোমাকে মনে পড়ে, মনে পড়ার কথা ছিল কি?
কিংবা মনে পড়ার মতো-কিছু আদৌ তোমার
সাথে আমার ছিল কি?
যতোটুকু ছিল-
তারও চেয়ে বেশি ছিল,
অজান্তে অযত্নে তোমাকে মনে পড়ে,

তোমাকে মনে পড়ে, মাঝেমাঝে মনে পড়ে-
জীবন স্রোতের উলটো দিকে সাঁতার কাটতে কাটতে
পরিশ্রান্ত দেহের অবসাদে যখন আর সকল ভাবনা
স্পষ্টতার আড়ালে লুকায়
তখন তোমাকে মনে পড়ে, আলতো করে হলেও তখন
তোমাকে মনে পড়ে।

স্বাধীনতা দয়া নয়

হাফসা নূর

স্বাধীনতা দয়া নয়, সে তো রক্তের দাবি,
গর্জে উঠেছিল বাংলা, ত্যাগের সেই ছবি।
চাষার হাতে রাইফেল ছিল, ছাত্রের চোখে আগুন,
জয় বাংলা স্লোগানে কাঁপতো শত্রুর বাগান।

গরিব ঘরের সন্তানেরা হাতে নিলো অস্ত্র,
শত্রুর বুকে বাজল বোমা, ধ্বংস হলো পত্র।
বীর বাঙালি মাথা নোয়ায় না, ইতিহাস তা জানে,
মাটি যেন গেয়ে ওঠে সেই সাহসী গানে।

পঁচিশে মার্চ, অন্ধকারে আগুন
নামে ঘরে, কান্না আর রক্তের ধারা-বাংলা থাকে জ্বরে।
তবু তারা হার মানেনি, আগলে রেখেছে শপথ,
মুক্তির নামে জীবন দিলো, করল প্রাণপণ যুদ্ধ।

মায়ের কোল খালি হলো, বোন হারালো ভাই,
তবু মুখে একটাই কথা-এই দেশ আমাদের চাই!
একটি পতাকা, একখণ্ড মানচিত্র চেয়ে,
লাখো প্রাণ দিয়েছিল অন্ধকার পেরিয়ে।

তাই বলি, স্বাধীনতা উপহার নয় কখনো,
এটা ত্যাগ, সংগ্রাম, আর সাহসেরই ধন তো।
বাংলা আজ বাঁচে তাদেরই দুঃসাহসিক রক্তধারায়,
যারা প্রাণ দিয়েছিল এই লাল-সবুজের মায়ায়।

ভ্রমণ কাহিনি

লন্ডন থেকে তেলআবিব

দিলু নাসের

লন্ডন লুটন এয়ারপোর্ট থেকে ফ্লাইটের ঝামেলা শেষ করে আকাশে উঠতে উঠতে বেলা প্রায় ৩টা বেজে গেল। মার্চের বিকেল। রোদ ঝলমলে বাইরের আকাশ। উইজ এয়ারের এয়ারবাস রানওয়ে ছেড়ে আকাশে ডানা মেলতে কোনো ঝামেলা হয়নি। এই এয়ারলাইনসে জীবনের প্রথম ভ্রমণ করছি। টিকেট কাটার পর উইজ সম্পর্কে অনলাইনে এবং পরিচিত কিছু মানুষের কাছ থেকে এদের সার্ভিস সম্পর্কে নেতিবাচক অনেক কথা শুনেছি, তাই খুব উৎকণ্ঠায় ছিলাম, যাই হোক আকাশে উড়ে কিছুটা স্বস্তি পেলাম।

আমি নিয়মিত বিদেশ ভ্রমণ করলেও প্লেনের উড্ডয়নের মুহূর্তটা আমার কাছে সবসময় উৎকণ্ঠার সময়। ফ্লাইট ইতিহাসে যত দুর্ঘটনা তার অধিকাংশই ঘটে হয় উঠা অথবা ল্যান্ড করার সময়। তাই আশঙ্কা উৎকণ্ঠা ক্ষণিকের জন্য হলেও আমার মগজ চেপে ধরে। অতিরিক্ত ধাক্কাধাক্কি ভয় ধরিয়ে দেয়। এ সময় কেবিন ক্রুরাও নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সব সংশয় সব ভয় নিমিষে উবে যায় যখন বিমান তার প্রয়োজনীয় উচ্চতায় পৌঁছে সোজা হয়ে চলতে শুরু করে।

এ যাত্রায়ও কোনো ব্যতিক্রম হলো না। প্লেন স্বাভাবিক হতেই আবারও গত কয়েক সপ্তাহে বুকের ভেতরে জমে থাকা ভয়-ভীতি উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ এবং উত্তেজনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আর মাত্র তিন ঘণ্টা পরেই অবতরণ করব পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ ইসরাইলে। স্বাধীনতাকামী নির্যাতিত মানুষের ভূমি ফিলিস্তিন দেখতে শুরু হলো আমরা ছয়জনের এই অভিযাত্রা। আমার সাথে রয়েছেন বন্ধুবর এমদাদুল হক চৌধুরী (সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদক তৎকালীন লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব সভাপতি) সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল আহমেদ, তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এমদাদ সিদ্দিক। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হাসান হাফিজুর রহমান পলক আর আমার বন্ধু শামীম জামান। আমি যদিও এর আগে জেরুজালেম ভ্রমণ করেছি আম্মান থেকে স্থলপথে কিন্তু সঙ্গীরা এই প্রথম। তাই এই ভ্রমণে আমিই গাইডের ভূমিকা পালন করছি। মার্চ মাসের সুনীল আকাশ। ছোটোখাটো কিছু মেঘের কুণ্ডলী

অতিক্রম করে উইজ এয়ারের এয়ারবাস এতক্ষণে বৃটেনের সীমানা ছেড়ে ইংলিশ চ্যানেলের উপরে। হাঙ্গেরিয়ান সুন্দরী এয়ার হোস্টেজরা যাত্রীদের কাছে খাবার-দাবার বিক্রিতে ব্যতিব্যস্ত।

আশেপাশের যাত্রীদের কোলাহল আমার নজর কাড়ল। কেউ হিব্রু কেউ ইংরেজিতে নিচু স্বরে কথা বলছে। খুব কাছে বাচ্চাদের কেউ বিরামহীনভাবে কাঁদছে। মা চেষ্টা করছে সন্তানকে সান্ত্বনা দিতে। কথা বলছে আরবি ভাষায়। ভাষা বুঝা না গেলেও মা ও সন্তানের ভাষা বুঝতে অসুবিধা হলো না। কারণ এ ভাষা চিরন্তন। আমরা ছয়জন বিভিন্ন সিটে বসেছি কেউ আগে কেউ পিছনে। এমাদ ভাই আমার দুই সিট আগে বেলাল ভাই কিছুটা পিছনে শামীম পলক এবং এমদাদ আরও পিছনে ছিলেন। তাই কেউ কারো সাথে কথা বলার সুযোগ ছিল না। আমি দুই ইহুদি তরুণের মাঝখানে বসেছিলাম। একবার উঠে এমাদ ভাইয়ের কাছে গেলাম গিয়ে দেখি তিনি নিদ্রারত, কথা না বলে বেলাল ভাইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বললাম। খিদায় আমার পেট কিছুটা চোঁ চোঁ করছিল। বেলাল ভাই বাদাম দিলেন। মনে পড়ল ব্যাগে ঘর থেকে আনা কিছু খাবার অবশিষ্ট আছে। সিটে বসে এককাপ চা কিনলাম এয়ার হোস্টেজের কাছ থেকে। বাইরে তখন অন্ধকার নেমেছে।

প্লেন ভর্তি যাত্রী। কেউ নিজ দেশে যাচ্ছে। কেউ কেউ টুরিস্ট। তিন ধর্মের দেশ ইসরাইল। যাত্রীদের পরনের পোশাক দেখেই বুঝা যায় কে কোন ধর্মের। ইহুদিদের মাথার টুপি জাতীয় টেফিলিন নামে পরিচিত বস্তুটা বলে দেয় ওদের পরিচয়। মুসলমান বলতে আমরাসহ হাতে গোনা কয়েকজন। দু'চারজন ভারতীয় মনে হলো। বেশিরভাগই বৃটিশ এবং ইউরোপিয়ান। চেয়ে দেখি এমাদ ভাই নড়াচড়া করছেন, কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলাম ঘুম কেমন হলো? বল্লেন না, ঘুমাইনি তো জেগেই ছিলাম। তুমি এসেছিলে উপস্থিতি টের পেয়েছি। দেখলাম উইজের সার্ভিসে তিনি খুব খুশি। বললেন, ভাবছি উইজ এয়ারলাইনসকে প্রস্তাব করব বাংলাদেশে ফ্লাইট চালু করতে। ৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই ঘণ্টা চলে গেছে সিটে এসে বসে কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলাম। পাশের সিটের দুটি ছেলে এক মিনিটের জন্যও কথা বন্ধ করেনি হিব্রুতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। শরীর আলগা করে হেলান দিতে যাব ঠিক তখনই আমার ডান পাশের লোকটার বাথরুমের প্রয়োজন হলো। তাই সিট থেকে উঠে তাকে যেতে দিতে হলো। বসতেই আবারও ঝিমুনি এসে গেল। কখন চোখ বুজতে শুরু করেছি বুঝতে পারিনি। জানালার উপর পর্দা এঁটে দিলো ফ্লাইট হোস্টেসরা তাই বাইরে দিন কি রাত সেটা বুঝারও উপায় ছিল না। পাশের লোকটা ফিরে আসায় আবারও সিট থেকে উঠতে হলো।

যাত্রীদের চঞ্চলতা বলে দিচ্ছিল আমরা খুব একটা দূরে নেই। শেষবারের মতো খাবার এবং পণ্য বিক্রিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল হোস্টেসরা। দু'দিকের বাথরুমে লম্বা লাইন ধরে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করছে যাত্রীরা। জানালার ঢাকনা সরিয়ে বাইরে তাকাতে নিকষ কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। মাত্র চার ঘণ্টার

জার্নি তবু মনে যেন জনম জনম ধরে আকাশে উড়ছি। প্লেন জার্নি তিন ঘণ্টার উপরে হলেই আমার অসহ্য লাগে। মোবাইলের ঘড়িও লন্ডনের সময় দেখাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম না ক'টা বাজে। জানালার বাইরে রাতের আকাশ। নিকষ কালো অন্ধকার। এদিক সেদিক দুয়েকটা তারা মিটমিট করছে। নিচের দিকে তাকাতে নিশ্চিত হয়ে গেলাম ল্যান্ড করতে যাচ্ছি আমরা। রাত নেমে এসেছে পৃথিবীর এ প্রান্তে। আবারও দুঃচিন্তা ভয় আর উৎকণ্ঠা এসে মগজে চেপে বসল। যে দেশটার জন্য সারাজীবন বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই লালন করিনি সেই ইসরাইলে নামতে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যেই।

আমি ২০১৯ সালে একদিনের জন্য জেরুজালেম ভ্রমণ করেছিলাম। তখন জর্ডানের রাজধানী আম্মান থেকে মাত্র দুই ঘণ্টায় এসেছিলাম সড়ক পথে। স্থলবন্দরের ইমিগ্রেশন নিয়ে সেবার অনেক ভয় এবং উৎকণ্ঠা ছিল কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ কোনো অসুবিধা হয়নি খুব সহজেই ঢুকে পড়েছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ভূমিতে। তখন শুধু জেরুজালেমের পবিত্র আল আকসা দেখেছিলাম অন্য কিছু আর দেখার সুযোগ হয়নি।

সরাসরি ইসরাইলী বিমান বন্দরে অবতরণ করব এই প্রথম। তেলআবিব বেন গুরিয়ন এয়ারপোর্টের কঠিন নিরাপত্তা ব্যবস্থার গল্প শুনেছি অনেক। পরিচিত কয়েকজনকে বেশ কয়েক ঘণ্টা নিরাপত্তা তল্লাশির নামে নাজেহাল হতে হয়েছে কাউকে ফেরতও যেতে হয়েছে শুনেছি। এক সময় টের পেলাম প্লেন নিচে নামতে শুরু করছে। জানালা দিয়ে তাকাতেই চোখে এসে লাগল চোখ ধাঁধানো

আলোর ঝলকানি। আকাশ হতে বুঝার উপায় ছিল না কোনটা ইসরাইল আর কোনটা তাদের দখলে থাকা পশ্চিম তীরের প্যালেস্টাইন। আলোর ঝলকানি যাচাই-বাছাই করলে হয়তো আন্দাজ করা যেত প্যালেস্টাইনের সীমানা। ওখানে জীবন থাকলেও নেই জীবনের ছন্দ। তাই আলোর ঝলকানি ওখানে প্রত্যাশিত ছিল না।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুকের ঠিক মাঝখান হতে। এক সময় টের পেলাম উইজ এয়ার বেন গুরিয়ন এয়ারপোর্টের রানওয়ে স্পর্শ করেছে। অজানা আশঙ্কাটা আবারও ফিরে এলো। আদৌ কি ঢুকতে পারব দেশটায়! ধর্মীয় সমস্যায় জর্জরিত একটা দেশে ধর্মীয় পরিচয় অন্য যে কোনো পরিচয়ের ঊর্ধ্বে। কাগজে কলমে আমি একজন মুসলমান। শুনেছি মুসলিম মানেই ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলে একজন সন্দেহজনক ব্যক্তি। অবশ্য সন্দেহ করার মতো তেমন কিছু নেই আমাদের চেহারা-সুরতে অথবা সাথে আনা ব্যাকপ্যাকে।

আমি এবং আমার সঙ্গীরা পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছি এ পর্যন্ত। বৈধ ভিসা থাকাবস্থায় কোনো দেশ কাউকেই তার সীমান্ত হতে ফিরিয়ে দেয়নি। বরং একজন সুস্থ স্বাভাবিক পরিব্রাজক হিসেবে স্বাগত জানিয়েছে। এরপরও মনের ভয় আমরা দূর করতে পারছিলাম না। লন্ডনে থাকতেই আমরা যার যার ফেইসবুক ডিলিট করে দিয়েছি। হোয়াটসএ্যাপের বিভিন্ন মেসেজ পরিষ্কার করেছি। শুনেছি কাউকে সন্দেহ

হলে তারা হাতের ফোন নিয়ে চেক করে। এজন্য আমরা সবাই সাবধানতা অবলম্বন করেছি। আমি এমাদ ভাই এবং বেলাল ভাই সামনে ছিলাম তাই আগেই নেমে গেছি, দেখলাম টার্মিনাল থেকে বেশ দূরে আমরা অবতরণ করেছি তাই দুটি বাস দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীদেরকে টার্মিনালে পৌঁছে দিতে। লোকজন তাড়াহুড়া করে বাসে উঠছে কিন্তু আমরা বাসে না উঠে বাকি তিনজনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, দুজন সিকিউরিটি এসে আমাদেরকে বাসে উঠতে তাড়া দিলো আমরা লাইনে দাঁড়ানোর ভান করে সঙ্গীদের অপেক্ষা করছিলাম দু'চার মিনিটের মধ্যেই তারা চলে আসল। দেখলাম শামিম অপরিচিত একটা বাঙালি ছেলের সাথে কথা বলছে সে লন্ডন থেকে একা এসেছে, আমি ইশারায় শামিমকে বললাম ছেলেটির সাথে বেশি কথা না বলতে।

আমরা পরস্পর সিলেটি কথা বলে বলে বাসে উঠেছিলাম হঠাৎ পিছন থেকে একজন যুবতী বলে উঠল–আপনারা কি বাঙালি? কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনারা বাংলাদেশের লোক। আমি পারমিতা, কলকাতার মেয়ে। আপনারা কি বেড়াতে এসেছেন?

আমরা বললাম হ্যাঁ, আমরা বাঙালি। লন্ডন থেকে এসেছি।

পারমিতা তার সাথের ছেলেটিকে দেখিয়ে বলল এই হচ্ছে ডেভিট আমার স্বামী, ইসরাইলের লোক। আমরাও লন্ডনে থাকি। তবে প্রতি বছর এখানে আসি। খুব সুন্দর দেশ আপনাদেরও ভালো লাগবে। এতক্ষণে বাস চলে এসেছে টার্মিনালের দোরগোড়ায়। নেমে আমরা ছয়জন একসাথেই হাঁটা শুরু করলাম।

তেলআবিব বেন গুরিয়ন এয়ারপোর্ট। হিব্রু এক্রোনেম ন্যাটবাগ। পৃথিবীর আর দশটা উন্নত দেশের মতো গোছালো ও পরিচ্ছন্ন একটা এয়ারপোর্ট। প্রথমে দেখায় ভালো না লেগে উপায় নেই। দেয়ালে করিডরে সবখানেই নান্দনিকতার ছোঁয়া আছে। হিথ্রো অথবা গেটউইক এয়ারপোর্টের মতো ব্যস্ত না হলেও সামগ্রিক ব্যস্ততা চোখে পড়ার মতো। পৃথিবীর সব প্রান্ত হতে বিমান নামছে। দলবেঁধে টুরিস্টরা আসছে। ধার্মিকদের সংখ্যাও কম না। গায়ের পোশাক দিয়ে অনেককে আলাদা করা যাচ্ছে। ইমিগ্রেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে ভাবছিলাম যদি ঢুকতে দেয় তাহলে কী করব? উলটাপালটা প্রশ্ন করলে কী জবাব দেব? এরকম অনেক প্রশ্ন মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল।

কয়েকজন বৃটিশ নাগরিককে ইসরাইল তার সীমান্ত হতে বিনা-কারণে ফিরিয়ে দেবে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। ইসরায়েল নামের দেশটার অস্তিত্বের প্রতি অঙ্গে মিশে আছে আমার মতো অসংখ্য বৃটিশ মানুষের ট্যাক্সের পয়সা। এ নিয়ে টালবাহানা করার কোনো অধিকার নেই ইসরাইলীদের। ধারণাটা মগজে স্থায়ী করার চেষ্টা করলাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে নিজেকে এখন হতে বৃটিশ নাগরিক হিসেবে ভাবার চেষ্টা করব। কোথাও কেউ সমস্যা তৈরির চেষ্টা করলে সরাসরি যোগাযোগ করব এখনকার বৃটিশ দূতাবাসে। আমরা ছয়জনের

মধ্যে চারজন সরাসরি সাংবাদিকতার সাথে জড়িত তাই আমরা আগেই ঠিক করেছি এই পরিচয় গোপন রাখব।

প্রায় দশ মিনিট হাঁটার পরই পৌঁছে গেলাম ইমিগ্রেশন কাউন্টারের সামনে। ইসরাইলী এবং অন্য দেশের নাগরিকদের জন্য আলাদা লাইন। আমরা সবাই একসাথে লাইনে দাঁড়ালাম। আমাদের সামনে তেমন বেশি লোকজন ছিল না। আমি ছিলাম সবার সামনে আমার পিছনে এমাদ ভাই। সিরিয়াল আসতেই ছোটো একটা বুথে বসা ইমিগ্রেশন মহিলা অফিসার আমাকে ইশারা দিলো। হাতে পাসপোর্ট নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলাম। বিনয়ের সাথে গুড ইভিনিং বলে কুশল বিনিময় করার চেষ্টা করলাম। কাজ হলো না। ইমিগ্রেশন অফিসারদের জাতটাই এরকম। ওরা সহজে স্বাভাবিক হয় না। যখন তখন হাসে না। কিছুক্ষণ ঠায় হয়ে তাকিয়ে থাকে চেহারার দিকে। যা বুঝার তা বুঝে পেলে খটাস করে একটা সিল মারে। এই মহিলার মুখেও হাসির কোনো চিহ্ন নেই। চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল–

তুমি কি কোনো গ্রুপের সাথে ট্রাভেল করছ?

আমরা ছয় বন্ধু এক সাথে এসেছি

এর আগে কোনোদিন এসেছ ইসরাইলে?

হ্যাঁ

কতদিনের জন্য এসেছ?

চারদিন থাকব

বাবার নাম কি?

আমি আমার বাবার নাম বললাম।

কোথায় থাকবে?

ইস্ট জেরুজালেম।

তার প্রশ্নের ধরনে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। ভাবছিলাম যদি বলে একবার এসেছ আবার কেন আসলে? দুইতিন মিনিটের বেশি স্থায়ী হলো না আমাদের কথ াবার্তা। আমাকে অবাক করে দিয়ে আগের বারের মতো হাতে পাসপোর্টের সাথে ভিসার কাগজ ধরিয়ে স্মরণ করিয়ে দিলো কাগজটা যেন না হারাই। কারণ ওটাই দেশটায় ঢুকার ভিসা। যে হোটেলে থাকতে চাচ্ছি ওরাও দেখতে চাইবে কাগজটা। ফেরার পথে ইমিগ্রেশনও দেখতে চাইবে ইস্যু করা ভিসা। এটা একটা ভালো দিক যে ইসরাইলী ইমিগ্রেশন কখনোই টুরিস্টদের পাসপোর্টে ভিসার সিলমোহর দেয় না। কারণ তাদের ভিসা পাসপোর্টে থাকলে অনেক দেশে ভিসা পেতে সমস্যা হয় তাই তারা ভিসাটি একটুকরো আলাদা কাগজে দেয়।

আমি অফিসারকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাউন্টার পেরিয়ে এসে পিছনে তাকিয়ে দেখে বাকিরা দু'একজনও ইমিগ্রেশন কাউন্টারে। আমি একটু দূরে এসে তাদের জন্য অপেক্ষা করলাম। এর মধ্যে পাকিস্তানী একটা লোক আমার পাশে এসে বলল তার বন্ধুকে আটকে দিয়েছে তাই সে চিন্তিত। আমি তাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা

করছিলাম, এর মধ্যে হাসি মুখে এমাদ ও বেলাল ভাইও চলে এসেছেন। বাকিরা পাঁচ মিনিটের ভেতরেই চলে এলো। যেহেতু আমাদের কোনো লাগেজ নেই তাই আমরা আর দেরি না করে বাইরে আসার পথে পা বাড়ালাম। আমদের পকেটে ইসরাইল ঘুরে দেখার তিন মাসের ভিসা তাই বুক ফুলিয়ে কাস্টমসের গ্রিন চ্যানেল ধরে বেরিয়ে গেলাম কোনো প্রশ্ন ছাড়াই। কেউ ফিরেও তাকালো না আমাদের দিকে। ভিতরে জমে থাকা সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিমিষে উবে গেল।

বাইরে এসে আবারও দেখা পেলাম পারমিতার, সে হেসে হেভ এ নাইস হলিডে বলে ইসরাইলী স্বামীর হাত ধরে চলে গেল। সেও বুঝে নিয়েছে আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। এয়ারপোর্টের ভেতরের আলোর সাথে বাইরের আলোর পার্থক্য ছিল চোখে পড়ার মতো। খুবই অল্প ও অনুজ্জ্বল। ভেতরের আলোর ঝলকানিতে চোখ ঝলসে যায়, বাইরে এসে তা নিঝুম কোনো দ্বীপের মতো দেখালো। আমরা সেই মায়াময় আলোয় বেরিয়ে প্রথমেই ধূমপানের জায়গা খুঁজলাম। দু'একজন টার্মিনালের ভেতরে থেকে ইন্টারনেট কানেকশনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইসরাইলের স্থানীয় সময় তখন রাত দশটার মতো, আমি আলো অন্ধকারে আমার ঠিক করা ড্রাইভারকে খুঁজছিলাম। কিছুক্ষণের ভেতর তাকেও পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন, আমি ইচ্ছে করেই একটু দেরিতে এসেছি, কারণ এখানে সিকিউরিটির জন্য বেশিরভাগ যাত্রীদের বের হতে দেরি হয় তোমরা তো খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছ! আমাদের ড্রাইভার মনতাহির তার সাথে আমার শুধু ফোনে কথা হয়েছে, প্রথম সাক্ষাতেই তার ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। এই বিমান বন্দরে প্যালেস্টাইনী মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। শুধু মাত্র লাইসেন্সধারী ট্যুর কোম্পানির লোকজন আসতে পারে। শেয়ার টেক্সি আছে অথবা ট্রেনেও তেলআবিব অথবা জেরুজালেমে যাওয়া যায়।

পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশে আমাদের প্রথম রাত। দ্বিধা, সংশয় আর বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে ইসরাইল নামের দেশটায় সহজে পৌঁছতে পারব এর কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। সংশয় থাকলেও ভয় ছিল না। সীমান্ত হতে ফিরিয়ে দিলে তেমন কিছু হারানোর ছিল না আমাদের। ইসরাইল নামের এই দেশ দেখার আকর্ষণ আমাদেরকে এখানটায় টেনে আনেনি! তেলআবিব, হাইফা, রিশহন যিলিওনের মতো ইসরাইলি শহরগুলোতে হয়তো আর দশটা শহরের মতো জীবন আছে। তবে সে জীবন আমাদের মনকে টানার জন্য যথেষ্ট মনে হয়নি। এসেছি পবিত্র আল আকসা দেখতে আর নির্যাতিত স্বাধীনতাকামী প্যালেষ্টাইনীদেরকে দেখতে। পশ্চিমা অর্থ ও পেশি শক্তির কাছে নির্যাতিত একটা জাতির জীবনকে কাছ হতে দেখার আগ্রহ নিয়েই এখানে আসা। মনতাহিরের গাড়িতে উঠেই আমরা সবাই গাড়ির ইন্টারনেটে যুক্ত হয়ে লন্ডনে যার যার পরিবারের কাছে নির্ঝঞ্ঝাটে এখানে পৌঁছানোর খবর দিলাম।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে একটু যেতে না যেতেই গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে আসলো, সামনে তাকিয়ে দেখি সামরিক পোশাক পরা কয়েকজন অত্যাধুনিক অস্ত্র

হাতে দাঁড়িয়ে আছে অস্ত্রে সজ্জিত এক সুন্দরী তরুণী ড্রাইভারের কাছে আসতেই মনতাহির বললেন, এরা বৃটিশ লন্ডন থেকে এসেছে। মেয়েটি আমাদের দিকে এক পলক তাকিয়েই বলল, যাও। দশ মাইলের ভেতর এরকম দুইবার আমাদেরকে আটকানো হলো। মনতাহির বললেন, এখানে এটাই স্বাভাবিক। এয়ারপোর্ট থেকে পূর্ব জেরুজালেম প্রায় এক ঘণ্টার পথ। মসৃণ হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চলছে দ্রুতগতিতে। ড্রাইভার মনতাহির রাস্তার দু'পাশের ঘরবাড়ি দেখিয়ে বললেন, এই হচ্ছে ওয়েস্ট ব্যাংক এর রাজধানী রামাল্লা। তিনি বললেন এই পুরো এলাকাটি পিএলও শাসিত ওয়েস্ট ব্যাংকের শুধু হাইওয়েটি ইসরাইলের।

আমি প্রথম বার যখন এসে অ্যালেনবি ব্রিজ সীমান্ত হয়ে ইসরাইলে এসেছিলাম তখন দেখেছি এরকম হাইওয়ের পাশের এক রাস্তা ইসরাইলের আরেকটি ওয়েস্ট ব্যাংকের। যেখানেই দুইদেশের দুই রাস্তা মিলিত হয়েছে সেখানেই সশস্ত্র ইসরাইলী সেনা। এরকম বিভ্রান্তিকর ম্যাপ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। রামাল্লা পেরিয়ে কিছু দূর এগিয়েই আমরা ঢুকে গেলাম ইসরাইল নিয়ন্ত্রিত জেরুজালেমের ভেতর। আমাদের গন্তব্য পূর্ব জেরুজালেমে যেখানে রয়েছে পবিত্র আল আকসা মসজিদ। রাত ন'টার পর এই এলাকায় বেশিরভাগ দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় তাই রাস্তাঘাট খুবই ফাঁকা লাগছিল। আমরা সবাই ক্ষুধার্ত, হোটেলে পৌঁছে কোনো খাবারের দোকান খোলা পাব না তাই রাতের খাবার নিয়ে সবাই চিন্তিত ছিলাম। শহরে ঢুকে রাস্তার মোড়ে একটা ছোটোখাটো খাবারের দোকান খোলা দেখে মনতাহির গাড়ি থামালেন। আমরা নেমে দেখলাম এখানে শুধু ফালাফেল (ডালবড়ার মতো যা সে দেশে খুব জনপ্রিয়) বিক্রি হয় তাও দিনের শেষে যৎসামান্য পড়ে আছে তার দোকানে। পেটের ক্ষুধা তখন ক্যান্সারের মতো চেপে বসেছে আমাদের গোটা শরীরে। মগজ প্রায় বিকল। যে কোনো মূল্যে কিছু একটা দিতে হবে পেটে তাই ফালাফেলের সাথে পাতলা রুটি অলিভ আর বিভিন্ন ধরনের সালাদ দিয়ে আমরা ভূড়িভোজন করলাম। আমাদের কাছে স্থানীয় টাকা ছিল না তাই মনতাহির দাম পরিশোধ করলেন। ফালাফেল খেয়ে কিছুটা স্বস্তি পেলাম সবাই।

হোটেলে পৌঁছাতে মধ্যরাত পেরিয়ে যায়। সুন্দর ছিমছাম "আদার হোটেল" জেরুজালেমের ব্যস্ত রাস্তা সালাদিন স্ট্রিটের একেবারে শেষ মাথায়। হোটেলে ঢুকেই বুঝলাম রিসিপশন কর্মী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। নাম বলতেই চাবি দিয়ে দিলেন। আমি শামীম আর পলক এক রুমে আর এমাদ ভাই বেলাল ভাই আর তাদের বন্ধু এমদাদ এক রুমে। রুম মোটামুটি ভালো কিন্তু সমস্যা একটাই রুমগুলোতে এক রুমে ডবল বেড আর অন্য রুমে সোফা আর একটা সিঙ্গল বেড। প্রথমে আমাদের মন খারাপ হলেও নির্ঝঞ্ঝাটে জেরুজালেম পৌঁছানোর আনন্দে আমরা মেনে নিলাম।

সময় ততক্ষণে মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। আমরা হাত মুখ ধুয়ে আবার নিচে চললে আসলাম। বেলাল ভাইরাও আসলেন। সবার ইচ্ছে একটু আশেপাশে ঘুরে

আসা। মধ্যরাতের জেরুজালেম হোটেলের মূল দরজা খুলে রাস্তায় পা রাখতে স্নিগ্ধ বাতাস চোখে-মুখে প্রশান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিলো। যেহেতু আমি আগে একদিনের জন্য এসেছিলাম তাই আশপাশের রাস্তাগুলো কিছুটা পরিচিত।

মধ্যরাতের নিরিবিলি রাস্তায় বেরিয়ে আমরা হাঁটা শুরু করলাম গন্তব্য পূর্ব জেরুজালেমের বিখ্যাত সড়ক সুলেমান স্ট্রিট অভিমুখে।

আমাদের হোটেলটি ছিল সালাদিন স্ট্রিট এবং নাবলুস স্ট্রিটের শেষ মাথায়, এই দুটি রাস্তাই গিয়ে মিশেছে সুলেমান স্ট্রিটে। আমরা নাবলুস স্ট্রিট দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। ছোটো ফুটপাত একসাথে দু'জন করে হাঁটছি। আমি পলকের সাথে। যে ফুটপাত দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কত আগে এসব তৈরি হয়েছে।

পলক সভ্যতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলল, আগুন মানব সভ্যতার এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। ধারণা করা হয় যেদিন পৃথিবীতে প্রথম আগুন আবিষ্কৃত হয়েছিল সেদিন থেকেই সভ্যতার আবির্ভাব! বেলাল ভাইরা জেরুজালেম সংকট নিয়ে জোরে জোরে কথা বলছিলেন আমি বললাম একটু আস্তে কথা বলতে। রাস্তায় তেমন লোকজন নেই। মাঝেমাঝে দু'একটি গাড়ি এবং দু'একজন পথচারীর দেখা পেলাম। ট্রাফিক বাতিগুলো পালা করে লাল সবুজ বাতির আভা ছড়াচ্ছে।

যেহেতু এই এলাকায় সচরাচর টুরিস্টদের চলাচল তাই কেউ আমাদের দিকে ফিরেই দেখল না। প্রায় দশ মিনিট হাঁটার পর আমরা পৌঁছে গেলাম সুলেমান স্ট্রিটে। কোনো দোকানপাট খোলা নেই তখন। রাস্তার মোড়ে দুটি খাবার ডেলিভারির হোন্ডা চোখে পড়ল। একটি পুলিশের গাড়িও পাশ দিয়ে চলে গেল। সুলেমান স্ট্রিটে অটোমান সম্রাট সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের নামে। তার সময়েই এই এলাকার সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল। জেরুজালেম দীর্ঘদিন থেকে ইসরাইল অধিকৃত কিন্তু সালাদিন, সুলতান সুলাইমানসহ অসংখ্য মুসলিম ব্যক্তিদের নামের রাস্তাঘাট এবং প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো অক্ষত আছে। সুলেমান স্ট্রিটের সামনেই পুরোনো জেরুজালেমের সুউচ্চ প্রাচীর। এবং পুরোনো শহরের বিখ্যাত দামেস্ক গেইট। আমরা রাস্তা ক্রস করে দামেস্ক গেইটের সামনে এলাম। পুরোনো জেরুজালেমের সবগুলো ফটক তখন বন্ধ তাই আশপাশে কোনো লোকজন নেই। আমরা জটলা করে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম।

সঙ্গীরা হাজার বছর আগের প্রাচীন দেয়াল দেখছিলেন বিস্ময়ের চোখে। আমি দাঁড়িয়ে এই দেয়ালের ইতিহাস বললাম তাদেরকে। বললাম, দামেস্ক গেইটের ইতিহাস যে এই গেইট দিয়েই ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রা. জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন। ছুঁয়ে দেখলাম হাজার হাজার বছর আগে হযরত সুলাইমান আ. কর্তৃক নির্মিত প্রাচীন দেয়ালের টুকরো।

এই দেয়ালের ইতিহাস ৩০০০ খ্রি. পুর্বের। পুরোনো প্রাচীর নবি সোলাইমান আ.-এর আমলে তৈরি হলেও প্রায় পাঁচ'শ বছর আগে অটোমানদের সময়ে নতুন

করে এর উপরে পাথরের দেয়াল দিয়ে পুরোনো শহর ঘেরা হয়েছিল। এখন এই দেয়ালটিই পুরোনো ও নতুন জেরুজালেমকে ১৯৪৮-এর পর থেকে ভাগ করে রেখেছে। এই দেয়ালের পরতে পরতে তিনটি বিরাট ধর্মের রক্তাক্ত ইতিহাস লেখা।

আমরা তখনো কথা বলছিলাম জোরে জোরে। হঠাৎ অস্ত্রে সজ্জিত ইসরাইলী পুলিশের একটি গাড়ি এসে থামল আমাদের পাশে। একজন গাড়ির ভেতর থেকে জিগ্যেস করল আমরা কোনো হেল্প চাই কিনা। আমরা ধন্যবাদ দিয়ে না করলাম। তারা চলে গেল। আমি আগেই লক্ষ করেছি পুলিশের গাড়িটা আমাদেরকে ফলো করছে। আমরা সেখানে আর বেশি সময় দাঁড়ালাম না। আবারও নাবলুস স্ট্রিট দিয়ে হোটেলে রওনা দিলাম। এমাদ ভাই বললেন রুমে খাওয়ার জন্য পানি নিতে হবে। আসার সময় পাশের রাস্তায় একটা পেট্রোল স্টেশন দেখেছিলাম। সেখানে গেলাম পানি কিনতে। আমাদের কারো কাছেই তখন ইসরাইলী কোনো টাকা নেই। এমদাদ ভাই কার্ড দিয়ে দুই লিটারের কয়েকটি পানির বোতল কিনলেন সাথে কিছু স্ন্যাকস। আমরা আবার সালাদিন স্ট্রিট হয়ে হোটেলের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। পূর্ব জেরুজালেমের প্রাণকেন্দ্র এই সালাদিন স্ট্রিট। এই সেই সালাদিন, যার নেতৃত্বে জেরুজালেম মুক্ত হয়েছিল ক্রুসেডারদের হাত থেকে ১১৮৭ সালে। আগের বার যখন এসেছিলাম তখন এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গাইড ইউসুফ বলেছিলেন সালাদিন স্ট্রিট নামকরণের কারণ। এই রাস্তার কোনো এক জায়গায় একটি প্রাচীন কবরস্থান আছে যেখানে সালাদিন-এর নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যারা মারা গিয়েছিলেন তাদের কবর দেয়া হয়েছে। সেই থেকে নাকি এর নামে সালাদিন স্ট্রিট। পূর্ব জেরুজালেমের অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকা এটি। ব্যাংক, কিছু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ভবনসহ আছে বিভিন্ন ধরনের খাবারের দোকান এবং ইসরাইলে বসবাসকারী অবহেলিত মুসলমানদের ছোটোখাটো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সকাল থেকে মধ্যরাত অবধি এই রাস্তা জমজমাট থাকে, আমরা যখন হাঁটছিলাম তখন সারা দিনের ক্লান্তি গায়ে জড়িয়ে সালাদিন স্ট্রিট নীরব নিথর। রাস্তার নীরবতা ভেঙে আমরা জোরে জোরে কথা বলে বলে হোটেলের দিকে এগুচ্ছিলাম।

মাত্র এক ঘণ্টায় এই ঐতিহাসিক জেরুজালেম আমাদের কাছে নিজের শহরের মতো মনে হলো। ইসরাইল অধিকৃত এই প্রাচীন শহরে আমাদের প্রথম রাতেই মনের ভেতর জমে থাকা ভয়-উৎকণ্ঠা কিছুটা লাঘব হলো। স্নিগ্ধরাতে হেঁটে শরীর মন হতে ঝরে গেল ভ্রমণের ক্লান্তি। হোটেলে ঢুকে দেখলাম রিসিপশনের লোকটি এখনো জেগে আছে। আমরা তাকে রুমের সমস্যা বললাম। সে বলল, সকালে আলাদা বেডের ব্যবস্থা করে দেবো। সবাই একটা করে বালিশ আর আলাদা তোশক নিয়ে রুমে আসলাম। লোকটার কাছে জানলাম ভোর চারটায় ফজরের নামাজ তাই সাড়ে তিনটায় সবাই নিচে চলে আসার সিদ্ধান্ত হলো।

রুমে ঢুকেই শামীম আর পলক সাদা বেডে নিজেদেরকে সঁপে দিলো। আমি গরম পানিতে আবার হাত মুখ ধুয়ে ব্যালকনিতে চলে এলাম। ঘড়ি তখন রাত

তিনটার কাছাকাছি। চারদিকে পিনপতন নীরবতা। জেরুজালেমের এই এলাকাটি ছিমছাম সুন্দর। চারপাশে সবুজ গাছগাছালি। ব্যালকনির সামনে রাস্তার ওপারে একটি পাঁচ তারকা হোটেল। হোটেলের সামনের রাস্তাটির নাম কিং জর্জ স্ট্রিট। রাস্তা একেবারেই ফাঁকা। মাঝে মধ্যে দ্রুত গতির দুয়েকটা গাড়ি মনে করিয়ে দিচ্ছিল এ শহরে জীবন আছে।

আমি বেডে শুয়ে কিছুক্ষণ চোখ বোজার চেষ্টা করলাম। দেখলাম শামীম ঘুমোচ্ছে। আমি ভাবলাম–না, ঘুমের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়ার সময় না এটা। একটু পরেই পবিত্র আল আকসায় জীবনের প্রথম ফজরের নামাজ পড়ব। এই উত্তেজনায় চোখের ঘুম উধাও হয়েছে। আমি আধো আলো আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে মনে রোমন্থন করছিলাম ২০১৯ সালের ১ ডিসেম্বরে প্রথম জেরুজালেম ভ্রমণের স্মৃতি। এই হোটেলের আশেপাশে কোথায় গাড়ি রেখে এখান দিয়ে পবিত্র আল আকসা অভিমুখে গিয়েছিলাম। সেই একদিনের রোমাঞ্চকর ঝটিকা সফরের অনুভূতি আমাকে আবারও এই পবিত্র ভূমিতে নিয়ে এসেছে। (চলবে)

গ্রন্থলোক

আসমা মতিন'র লালপাথরের গল্প

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

চা শিল্পীদের এক অনবদ্য জীবনালেখ্য

চা-বাগানের শ্রমিকদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও নিত্যদিনের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে 'লালপাথরের গল্প'। এই উপন্যাসে চা-শ্রমিকদের জীবনমান ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি তাদের অধিকার আদায়ের আবেদন রেখেছেন লেখক।

অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ এ এই সময়ের কথাসাহিত্যিক আসমা মতিন'র 'লাল পাথরের গল্প' প্রকাশ করেছে সিলেটের বাসিয়া প্রকাশনী। ৭৯ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসের প্রচ্ছদ করেছেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ধ্রুব এষ। মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫০ টাকা মাত্র।

চা শিল্পীদের নিয়ে লেখকের ব্যাপক গবেষণার ফসল বলব আলোচ্য জীবনীমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস 'লালপাথরের গল্প'। লেখক তার শৈশবের স্মৃতিচারণ করে বাস্তব জীবনের গল্পকে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন।

গল্প বলার ছলে চা শিল্পের কিছু ঐতিহাসিক চিত্র তিনি সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। চায়ের উৎপত্তি, প্রলোভনের নিমিত্তে আসাম সিলেটে চা শ্রমিক কীভাবে এলো, তাদের পূর্ব ইতিহাস, রক্তের ইতিহাস লেখক অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ উপন্যাসটি যেন চা শ্রমিকদের জীবনচক্রের এক ঐতিহাসিক দলিল। চা নিয়ে কেউ গবেষণা করতে গেলে এ উপন্যাসটি দারুণ কাজে লাগবে।

সিলেটের কোনো এক চা বাগানের বাংলোয় বেড়ে ওঠা এই উপন্যাসের নায়িকা চুন্নির মধুর শৈশব স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে উপন্যাসের পর্বগুলো। কথ াসাহিত্যিক আসমা মতিন মালতী, বোধি, বুড়ি, নীরদা, কারু, কাঁচনদের চরিত্রের মধ্যে দিয়েই ফুটিয়ে তুলেছেন চা শ্রমিকদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। লেখক এক পর্যায়ে আক্ষেপ করেছেন 'চা-শিল্পীদের সাথে পৃথিবীর এক টুকরো সবুজের মাঝে দিদির সাথে ঝলমলে দিনের স্মৃতি এ জীবনে ভুলা যাবে না।' সাহিত্য রসের মাধুর্যে মণ্ডিত এ উপন্যাসের প্রতিটি পাতা : 'হরিৎ প্রান্তরের মেয়ে একটু একটু করে বেড়ে ওঠে এই ফুল ফসলের শ্যামল নিকেতনে। নির্জন পথ ধরে চুন্নি সহস্রবার হেঁটেছে ভ্রমণ করেছে

সহস্র মনের গহিনে। শ্রম ঘাম ভোজী সবুজ প্রান্তরে থোকা থোকা ব্যথার স্বাদও চেখে দেখার চেষ্টা করত সে। রসভরা আম কাঁঠালের বনবাদাড়ে চরে বেড়াত সে, অকুণ্ঠে পান করেছে সকল ফলের রস, বহুজাতি বহু ভাষাভাষি মানুষ, মানুষের কাঁচাঘর, পাকাঘর শ্রেণিভেদও একই চত্বরে তবে তার কাছে মানুষের ভালোবাসা জয়ী হতো। আজানের মধুর সুর নাগধূপের ধোঁয়া পাহাড়ি ভ্রমরের গুঞ্জন পাখিদের শিস দেওয়া ঘুম ভাঙানো ভোর। পথে যেতে যেতে দুটি পাতা একটি কুঁড়ি, কৃষ্ণচূড়ার রং সুগন্ধি চা গোলাপ পাপড়ির সাথে অনেক কথা বলা হতো তার। নবীন স্রোতস্বিনী প্রকৃতির উদ্যানে মিলেমিশে একাকার তার অনুভূতি। চা-শ্রমিকের অবিরাম শ্রম, রমণীরা পায়ে খাড়ু গলায় হাঁসুলি বাজুবন্ধ বাহুতে, সারাটা দিন তাদের পাতা তুলার দৃশ্য, এ নিয়ে ছিল তার গভীর ভাবনা। এমনই এক নৈসর্গিক লীলাভূমির নাগরিকগণ হাসিকান্নার অনুভবে ব্যস্ত জনপদে মেয়ে তার আপনারে খোঁজে পাওয়া মনে মনে কথা, চা-শিল্পীদের জীবনের কথা ভাবে।'

উপন্যাসে যেমন আছে মজা, আনন্দ তেমনই আছে কষ্টও। কোনো কোনো পঙ্‌ক্তিতে কান্না এসে যায়। 'হঠাৎ একদিন নিয়মের কাছে হার মেনে নিতে হলো মালতিলতার ধারে হাসনাহেনার ফটকে ডাক্তারবাবুর বন্ধুরা এলাকার শ্রমিকরা অশ্রুসিক্ত চোখ সকলের, সকল হৃদয়ে তোলপাড় বুকের পাঁজর ভাঙার নীরব শব্দ অথচ বিদায় জানাতে হবেই সময়ের স্রোত প্রবাহিত হলো ভাটির দিকে। হে শৈশব যেন রূপকথার মতো যেন কোনো এক রাজকুমারের ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বিদায় হে শৈশব তোমাকে বিদায়। চায়ের পাতার ঘ্রাণ গন্ধরাজ ফুল হে কৃষ্ণচূড়ার ঝাড় বিদায় তোমাকে বিদায়। বিদায় বন্ধু নীরদা, এখানেই চুন্নির হৃদয় ভেঙে চুরমার।'

গল্পের শেষের দিকে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন : 'সেই পাতাকুঁড়ির দেশে হরিৎ প্রান্তরে চা-পাতা শুধু পাতা নয় তার নির্যাস মণিমুক্তার মতোই দামি। উড়িষ্যা রমণীরা যখন এই দামি পাতা তুলত যেন পাতার বাজনা বাজায় তারা, তাদের আঙুলের নৃত্য ধ্রুপদী তালে তালে। এ চমৎকার দৃশ্য দেখলেই বাজনার এ তাল অনুভব করা যায় একমাত্র। তারাই ছিল পাতাবাদক, চা-শিল্পী, তারাই চা-কারিগর। আজ পর্যন্ত তারাই বাজায় পাতার বাজনা। ব্রিটিশরাজ আর এলিটদের দেওয়া কুলি নাম, আজও কি তাদের কুলি নামে ডাকা ঠিক হবে? পৃথিবীতে দাসপ্রথা আর নেই। কিন্তু চা-বাগানের দাসত্বের শিকল ভেঙে ফেলার সময় এখনো হয়নি। কোন শক্তির হাতে চাবি, এমন অশোধিত শক্তিকে বিকলাঙ্গ করার সাহসী শক্তি সমাজ এখনো পায়নি, পঙ্গু সমাজে বাস করে তরুণ প্রজন্ম কোন শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের অধিনায়ক হবে?'

চুন্নির বেড়ে ওঠা চা বাগানে ঈদ, পূজা যার যার ধর্ম অনুসারে পালিত হয়। কিন্তু আনন্দ উপভোগ করে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সব ধর্মের মানুষ। সেখানে কোনো ভেদাভেদ নেই, হিংসা নেই, আছে শুধু মানবতা আর মানুষ হওয়ার মন্ত্র। অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী এই লেখকের লেখা পড়ে বাউল সাধক শাহ আব্দুল করিমের গানের লাইন কানে ভেসে ওঠে : 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা...'

ছুঁয়ে রাখি প্লাবিত ভোর ও অন্যান্য বিষাদ : শব্দরেখায় বিরহ ও দ্রোহের অন্তর্গত ঘূর্ণি

নাহার আলম

Poetry is the supreme use of language–কবি, গদ্যকার, সম্পাদক, অনুবাদক উদয় শংকর দুর্জয় সে বাক্যটির শতভাগ প্রয়োগ করে রচনা করেন তার প্রতিটি কবিতা। স্মৃতি-প্রেম-বিরহ-স্বপ্ন-ক্ষোভ ও কল্পনাচূর্ণের সংশ্লেষ ও মন্থন প্রক্রিয়ায় তার কবিতাগুলো নানা ধরনের, নানা ঘরানার আবার বিষয়বস্তুকেন্দ্রিকও কিছু কিছু। কবি তার কবিতায় পাঠককে অ্যাসপেন, টি-ফার্ন, হর্সটেল বীথি, মলডন পোতাশ্রয়, ল্যাংডন হিল, মাউন্ট অব অলিভস, আইল অব হোয়াইট পেরিয়ে রাজপথ, কলাভবন, লক্ষ্মীদীঘার বন, কীর্ত্তনখোলার মাঠ, গৌরনদী, লক্ষ্মীবিলাসের মাঠ হয়ে গ্রহ-নক্ষত্রে পরিভ্রমণে ব্যাপৃত রাখেন পাঠককে। এভাবে সারাবিশ্বময় ঘুরে ঘুরে শেষাবধি কবি নিজেও ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন–Voice of his Tribe.

নীরব অথচ সরব অন্তর্ঘাতে বিরহের জলে ভাসা জীবনের চিত্র আঁকেন যেভাবে–'জীবনের যৌথ জটিল অঙ্ক ভালোবাসার বাকি আর ফাঁকিতে;/...বলবে বলবে করে বলা হয় না অকথার ভিড়ে। একদিন ভিড়ও থেমে যায়, দ্বৈতজীবন থমকে যায় মন ও মননে; টিকে থাকে প্রচ্ছদে আর বাহ্যে।' 'তোমার কাম্যতা রোজ রাতে খুন হয়; দিনের আলোর সঙ্গমে এক একটি বৃক্ষ-কিরণের পথ ধরে পেরিয়ে যায় মহাকাল।' 'একদিন মুঠো খুলতেই নষ্ট সর্পগন্ধার নিকষ কালো শরীর; অতঃপর কালের প্রবাহে মার্বেল রঙের সন্ধেগুলো আর কোনোদিন প্রতিমা হয়ে উঠলো না।' বুকের কপাটগুলো অতিশয় উদ্বিগ্ন, পেরুবার অক্ষমতাকে কিছুতেই পেরুনো যায় না।...ক্রোধ ভিড় করে আছে দগ্ধ নাবিকের মতো।' অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুশব্দ রোজ জীবন্ত-সকাল, দরজায় দাঁড়ায়।...এখানে মৃত্যু এখন সস্তার চেয়ে বেশ সস্তা, পোস্টারের মতো সেঁটে থাকে দেয়ালে।'

শব্দবোদ্ধা পাঠক ছাড়া তার কবিতার পাঠোদ্ধার করে রসাস্বাদন করা কঠিন। টানা গদ্যে লেখা কবিতার শরীর বিমূর্ত আচ্ছাদনে মোড়ানো হলেও ভাষিক শৃঙ্খলায় কোনো চিড়ের আবহ নেই। বর্তমান অস্থির সময়ের রক্তক্ষরণের ক্ষত কবিকে ব্যথিত করে। তারই আভাস কবিতার ছত্রে-ছত্রে–'পৃথিবীর সোনালি উদ্যানে এক অচেনা অদৃশ্য-শ্বাপদ দোকান খুলে বসেছে।' 'আমার ফেরার জন্য কোনো মানচিত্র অবশিষ্ট নেই।' 'শৈশবমাঠ, ভৈরবীচক্র, ধুলোপথ নতুন হয়ে উঠতে না উঠতেই অচেনা হয়ে

যায় অহিংস শব্দটি। শব্দ একদিন মুছে যাবে, মুছে যাবে অকৃত্রিম সমবেদনা।'

মানবজীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ প্রেম নিয়েও খোলামেলা বলেছেন কবি—'... আজন্ম মমতা নিয়ে, প্রেম নিয়ে, আবদার নিয়ে জাগ্রত ছিল একটি তীব্র চুমুর স্পর্শ। চুমুই পারে নিশাচরকে ছুটিয়ে নিতে দিগ্‌বিদিক। চুমুই পারে আটকে রাখতে সমস্ত হাই ইন্টারেস্ট রেটে জর্জরিত প্রেমিককে।'

ঋতুপ্রেমিক কবিকে শরৎ, হেমন্ত কিংবা বর্ষার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। 'ট্রেনগুলো রোজ পাখা লাগিয়ে উড়ে যায়, আমাদের হেমন্তবেলার সব খামভর্তি শৈশব নিয়ে। তাই ফেরানো যাক শরৎ-হেমন্তের নামের নতুন সময়। সাদা মেঘ আর ঝিরিঝিরি লিরিকের মাঝে বেঁধে দেওয়া যাক উৎসবের গান, নাম হোক শরোহেম ঋতু।' আবার অতিমাত্রিক নগরায়নের করালে ঋতুর স্বাভাবিকতা নষ্ট হলে আক্ষেপে বলে ওঠেন—'কোথা থেকে কোন্ দাপুটে ঝড় এসে বসিয়েছে কনক্রিটের আদলে হেমবীথি বসন্ত। শৈবাল ঘেরা ডাকবাক্স শুধুই ছবিঘর, পত্রচ্যুত শব্দ মিলিয়ে গেছে আর্টিফিশিয়াল শারদ আগমনে।'

কবি ভাষার চাতুর্যে মূর্ত করে তোলেন নিরাকার উপলব্ধি ও বিমূর্ত অনুভূতিকে। দারুণ মোহে শব্দ নিয়ে মেতে ওঠেন প্রচল ভাঙার অভিনব খেলায়। একমতো ঘাড় ধরিয়ে মনোযোগী করে তোলেন পাঠককে। কী বলতে চেয়েছেন কবি?—

'জীবন একটা অচেনা ইস্টিমার'। যে জীবনে 'আমাদের কপালের নিচে ঘুমিয়ে আছে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ; ত্রিভুজরথ'। অথচ 'সময় অপেক্ষা করতে করতে স্থবির বৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দুয়ারে'। 'কাল এখন অকালের নামে লিখিয়েছে অদৃষ্ট। এক গৃহমন্দিরের নৈবেদ্য রেখে খাবলে নিয়েছে বেলান্তের ধূলিভস্ম। একটি হেমকালের জন্য এ আলোকবর্ষ, অপেক্ষার গ্রিলে ঠেকিয়ে রাখুক আঙুল।'—এমন সব বাক্যের মর্মার্থ উদ্ধারে তো অবশ্যই মনোযোগী পাঠক হওয়া জরুরি। কবি উদয় শংকর দুর্জয়-এর কবিতায় উচ্চতর চিন্তা প্রতিফলন দেখতে পাই। শিল্পশাখার মাঝে কবিতা হলো স্বাধীন, রহস্যময় এবং সুবিস্তৃত। এখানে ভাষা-শব্দের ওপর চালানো যায় নিরন্তর সংশ্লেষ ও নিরীক্ষা। যার মাধ্যমে কবিতারা হয়ে ওঠে বহুবিচিত্র, বহুমাত্রিক, বহুঘরানারও। কবির কারিশমা সেইসব বহুমাত্রিকতার ভাবনাসমগ্রকে অনায়াসেই ছুঁতে পেরেছেন বলে আমি মনে করি।

কবি মুনিরা চৌধুরীর "নয় দরজার বাতাস" কাব্যগ্রন্থের পাঠপ্রতিক্রিয়া ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ

মোহাম্মদ ইকবাল

ভূমিকা

কবিতা যখন আবেগের নির্যাস হয়ে উঠে, তখন তা পাঠকের হৃদয়ে আলাদা জায়গা করে নেয়। কবি মুনিরা চৌধুরীর "নয় দরজার বাতাস" তেমনই এক সংবেদনশীল ও ব্যতিক্রমী কাব্যগ্রন্থ, যেখানে প্রচলিত কাঠামোর বাইরে গিয়ে তিনি কবিতার নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এর শিরোনামহীন কবিতাগুলো, যা এক অনন্য সৃজনশীলতার পরিচায়ক। কবিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি যেন একেকটি দরজা–যেখান থেকে প্রবাহিত হয় অনুভূতির বাতাস, স্মৃতির গন্ধ, প্রকৃতির রঙ এবং জীবনের গভীরতম দর্শন।

গ্রন্থটি চারটি পৃথক পর্বে বিভক্ত–

১. হেমন্তে রচিত হেমলক

২. নয় দরজার বাতাস

৩. মেহেক ও মেহেকানন্দা

৪. মুনিরা কথা

প্রত্যেকটি পর্বই আলাদা মাত্রা এবং মেজাজ বহন করে, যেখানে কবির আত্মনিমগ্নতা, প্রকৃতিপ্রেম, নিঃসঙ্গতা, আবেগ ও আত্মদর্শনের সমন্বয় ঘটে। তাঁর কবিতার ভাষা একদিকে অনিবার্য ব্যথার প্রতিচ্ছবি, অন্যদিকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। ব্যথা, বিষাদ, স্মৃতি, ভালোবাসা ও প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য তাঁর কাব্যে এক অপূর্ব রূপ পেয়েছে।

এ গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এখানে কবি সময়কে শুধু পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেননি বরং সময়কে জীবন্ত এক সত্তায় পরিণত করেছেন। হেমন্তের বিষাদ, বাতাসের রহস্যময়তা, নদীর স্মৃতিচিহ্ন সবকিছুই তাঁর শব্দের জাদুতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে, "মেহেক ও মেহেকানন্দা" পর্বে কবি তাঁর প্রিয় নদীকে এক জাগ্রত অনুভূতির রূপ দিয়েছেন, যা পাঠকের মনকে এক নতুন অনুভবের দিকে নিয়ে যায়।

মুনিরা চৌধুরীর কবিতাগুলোতে সাদামাটা অনুভূতির প্রকাশ নেই; বরং গভীর বিমূর্ততা, রূপকের অন্তর্নিহিত অর্থ এবং এক অনির্বচনীয় নৈঃশব্দ্যের ভাষা রয়েছে।

তিনি শব্দের জাদুকর, যেখানে প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তি এক নতুন দৃশ্যপট নির্মাণ করে। তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে মনে হয়, কবি নিজেই হয়তো হেমন্তের বাতাসের সঙ্গে মিশে গেছেন, তাঁর কবিতার শব্দেরা নয়টি দরজা খুলে দিয়েছে, যেখানে সময় থমকে থাকে, অনুভূতির প্রবাহ অবিরত বয়ে চলে।

কবি মুনিরা চৌধুরী আজ আমাদের মাঝে শারীরিকভাবে নেই, কিন্তু তাঁর কবিতাগুলো আমাদের

হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে। 'নয় দরজার বাতাস' শুধু একটি কাব্যগ্রন্থ নয়, এটি এক অনন্য কবিসত্তার আত্মপ্রকাশ, যা বাংলা কবিতার জগতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর এই

কবিতাগ্রন্থ পাঠকের হৃদয়ে দীর্ঘসময় ধরে আলোড়ন সৃষ্টি করবে, সেই প্রত্যাশা রইল। নিচে 'নয় দরজার বাতাস' কাব্যগ্রন্থের চার পর্বের প্রতিটি পর্ব বিস্তারিত বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

বিশ্লেষণ :

পর্ব : হেমন্তে রচিত হেমলক (কবিতা, গঠনশৈলী ও কাব্যদর্শন)
কবি মুনিরা চৌধুরীর 'হেমন্তে রচিত হেমলক' পর্বটি এক অনন্য সৃষ্টিশীলতার নিদর্শন। এখানে কবি গভীর আত্মদর্শন, অস্তিত্বের সংকট, স্মৃতির অভিঘাত এবং সময়ের অনিবার্য পরিণতির কথা বলেছেন এক ব্যতিক্রমী ও বিমূর্ত ভাষায়। তাঁর কবিতায় ব্যক্তিগত অনুভূতি যেমন প্রবলভাবে উপস্থিত, তেমনি তা সর্বজনীন বোধেরও প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। কাব্যগুণ, ভাষার প্রকৃতি, শব্দের চিত্রকল্প এবং উপমার প্রয়োগ সব মিলিয়ে এই পর্বের কবিতাগুলো একটি অনন্য শিল্পমাধ্যমে রূপ নিয়েছে।

১. গঠনশৈলী ও শিল্পমান :

এই পর্বের কবিতাগুলোর গঠনশৈলী মূলত চিত্রকল্পনির্ভর ও বিমূর্ত। প্রতিটি কবিতাই যেন এক ধরনের ফ্রি-ফ্লো প্রবাহ, যেখানে সময় ও বাস্তবতা এক বিন্দুতে মিলেছে।

প্রথম কবিতাটির শুরুতেই কবি আমাদের নিয়ে যান অতীতের স্মৃতিতে–"মহাকালের ছবি দেয়ালে টাঙিয়েছিলাম সেই কবেকার ঘোরগ্রস্ত ভোরে, সেলাই করে করে" এখানে "মহাকালের ছবি" একটি চিত্রকল্প, যা সময়কে একটি দৃশ্যমান রূপ দিয়েছে। "সেলাই করে করে" বাক্যাংশটি স্মৃতির জোড়া লাগানোর প্রচেষ্টার প্রতীক। এখানে কবি অতীতকে পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেটি ঝাপসা হয়ে গেছে। এভাবে স্মৃতির অস্পষ্টতা ও হারিয়ে যাওয়া অনুভূতিকে তিনি শিল্পিতভাবে তুলে ধরেছেন।

অন্যদিকে, দ্বিতীয় কবিতার চিত্রকল্প আরও ধ্রুপদী ও গভীর–

"এখন নৈঃশব্দ্যের শব্দরা ঘুমিয়ে পড়েছে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে"

এখানে শব্দের নৈঃশব্দ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে, যা অস্তিত্ববাদী বোধের প্রতিফলন। এছাড়াও কবিতাগুলোতে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে এক ধরনের ছন্দময়তা সৃষ্টি করা হয়েছে–

"আমায় ক্ষমা করো পাখি, পাখির পালক,
আমায় ক্ষমা করো নদী, নদীর দুই পাড়"

এই ধরনের পুনরাবৃত্তি কেবল লিরিক্যাল সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেনি বরং এটি কবিতার আর্তি এবং অনুভূতির তীব্রতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে।

২. ভাষার প্রাঞ্জলতা ও শব্দ-উপমার প্রয়োগ :

মুনিরা চৌধুরীর কবিতার ভাষা অত্যন্ত চিত্রময় ও গভীর। তিনি প্রতীক, রূপক ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে এক বিমূর্ত জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যা পাঠককে ভাবনায় নিমগ্ন করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ–

"আমার পাখিরা আর উড়াল দিলো না
দূর অতীতে পাখিদের ডানা কেটে দিয়েছিলাম
পাখিদের ডানা রেখে দিয়েছিলাম ছোটবেলার অ্যালবামে"

এখানে "পাখি" শৈশবের স্বপ্ন ও স্বাধীনতার প্রতীক, আর "ছোটবেলার অ্যালবাম" স্মৃতির সংরক্ষণশালা। এটি একটি বিষাদময় চিত্রকল্প, যেখানে অতীতের নিষ্পাপতা ও বর্তমানের বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য ফুটে উঠেছে। অনুরূপভাবে,

"নরকের নীল আগুনের চারপাশে লেলিহান জিহ্বাগুলো উড়ছে"

এখানে "নীল আগুন" এক অতিপ্রাকৃত এবং পরাবাস্তব চিত্রকল্প, যা যন্ত্রণার গভীরতা এবং আত্মার ক্লান্তিকে প্রতিফলিত করছে। এই ধরনের ভাষা কবিতাকে শুধু অলংকারসমৃদ্ধ করেনি বরং এর অন্তর্নিহিত আবেগের তীব্রতাকেও বহুগুণে বাড়িয়েছে।

৩. কাব্যদর্শন ও পরাবাস্তবতা :

এই পর্বের কবিতাগুলোতে কবির অস্তিত্বের সংকট, দার্শনিক অনুসন্ধান এবং বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এক ধরনের পরাবাস্তব অনুভূতি প্রবল। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে এক অন্তহীন সেতু তৈরি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ–

"ঘুমের ভেতরে গত জনমের কষ্টরা ধীরে ধীরে পুড়ছিলো
ঘুম ভেঙে দেখি আগামী জনমের সুখগুলো পিপাসার্ত ভীষণ"

এটি সময়ের একটি চক্রাকার ব্যাখ্যা, যেখানে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। এখানে বৌদ্ধ দর্শনের পুনর্জন্মতত্ত্বের ছায়াও দেখা যায়। এছাড়াও,

"ভালোবাসায় কোনো পার্থক্য নেই জন্মবরণের কিংবা মৃত্যুবরণের"

এটি একদিক থেকে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম সম্পর্ককে বোঝায়, যেখানে কবি মৃত্যুকে কোনো বিচ্ছিন্ন বাস্তবতা হিসেবে দেখেননি বরং জীবনেরই একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখেছেন।

পরাবাস্তবতা এবং উত্তরাধুনিকতার ছোঁয়া সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলোতে–

"দ্বিপদী ঘোড়ায় চড়ে আরো দূর যেতে যেতে
নিমাই সন্ন্যাসীর গ্রামে যাই
মন্দিরের চূড়ায় অন্ধকার ঘন হয়ে এলে বিষ পান করি
চাতকিনীর মতো আমিও তৃষ্ণা নিবারণ করি।"

এখানে বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রণ ঘটেছে। কবির অস্তিত্ব সংকট, তৃষ্ণা, মন্দির, বিষপান–সবকিছু মিলিয়ে একধরনের প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে, যা পাঠককে এক বিমূর্ত ও গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত করে।

৪. কবিতার বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ও ব্যতিক্রমধর্মীতা :

এই পর্বের কবিতাগুলোর বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যতিক্রমী। এখানে ব্যক্তিগত স্মৃতি, অস্তিত্বের সংকট, আত্মদর্শন, সময়ের প্রবাহ এবং প্রেম–সবকিছুর একটি বিমূর্ত রূপ পেয়েছে। কবি প্রচলিত প্রেমের ধারণার বাইরে গিয়ে প্রেমকে এক নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতার অংশ হিসেবে দেখিয়েছেন। সর্বশেষ কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিগুলো–

"আমি যে ভাঙা প্রদীপ জ্বালিয়ে তোমার ডাকের অপেক্ষা করছি"

এটি কবির অসীম অপেক্ষা, যা শুধু পার্থিব নয় বরং এক আধ্যাত্মিক অন্বেষণের প্রতীক। এখানে ঈশ্বরের প্রতি আকুতি ও প্রেমের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যা ভাববাদী কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উপসংহার :

"হেমন্তে রচিত হেমলক" শুধু কবিতার সংকলন নয়, এটি কবির গভীরতম ভাবনার এক প্রতিচ্ছবি। ভাষার প্রাঞ্জলতা, উপমার গভীরতা, পরাবাস্তবতা, উত্তরাধুনিকতার ছোঁয়া–সবকিছু মিলিয়ে এই পর্বটি এক ব্যতিক্রমী কবিতাসমগ্র হয়ে উঠেছে। মুনিরা চৌধুরীর কবিতায় সময়, স্মৃতি ও অস্তিত্বের এক জটিল বিন্যাস রয়েছে, যা বাংলা কবিতার পরিসরে এক অনন্য সংযোজন।

এই পর্বের কবিতাগুলো একদিকে দার্শনিক, অন্যদিকে অত্যন্ত ব্যক্তিগত। ফলে পাঠক এখানে নিজের অস্তিত্বকেও খুঁজে পেতে পারেন, যা সত্যিকারের শিল্পের বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় পর্ব : পাঠপ্রতিক্রিয়া

(নয় দরজার বাতাস : কবিতা, ভাষাশৈলী, শিল্পমান ও দর্শন)

মুনিরা চৌধুরীর 'নয় দরজার বাতাস' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব "নয় দরজার বাতাস" এক বিমূর্ত ও গভীর কাব্যময় অভিজ্ঞতা। এই পর্বে তিনি ব্যক্তিগত অনুভূতি, অস্তিত্বের সংকট, সময়ের প্রবাহ এবং এক ধরনের নির্জন যন্ত্রণার কথা তুলে এনেছেন এক ব্যতিক্রমী ভাষায়। কাব্যের বুননশৈলী, শব্দের ব্যঞ্জনা, উপমার প্রয়োগ এবং পরাবাস্তবতার উপস্থিতি এই কবিতাগুলোর গভীরতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। কবির ভাষা একদিকে স্পষ্ট, অন্যদিকে রহস্যময়। সময় এখানে একধরনের চক্রাকারে ঘুরতে থাকে–অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝখানে কবি এক অন্তহীন শূন্যতার বোধে নিমগ্ন।

১. গঠনশৈলী ও শিল্পমান :

এই পর্বের কবিতাগুলোতে কাঠামোগত কোনো কঠোরতা নেই। কবিতাগুলো যেন এক নিরবচ্ছিন্ন চেতনাপ্রবাহের মতো, যেখানে ভাবনার বাঁধ ভেঙে কবির আত্মজিজ্ঞাসা, স্মৃতি, স্বপ্ন ও বাস্তবতা মিলেমিশে এক নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথম কবিতাটি–

> "আমি জেগে থাকি কাটা-হাতখানা অন্য-হাতে নিয়ে সারারাত জাগি"

এখানে "কাটা-হাত" কেবল শারীরিক কোনো চিত্রকল্প নয়, এটি আত্মপরিচয়ের সংকট ও সময়ের নিষ্ঠুরতার প্রতীক। "অনন্ত ভোরের দিকে হাতের গহিনে জ্বলে ওঠে হাতের চিতা" পঙ্‌ক্তিটি সময়ের অনিবার্য ধ্বংসাত্মক প্রবাহের প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

কবিতার প্রবাহ অত্যন্ত তরল, তবে তা এক রহস্যময় শীতলতা বহন করে। প্রতিটি পঙ্‌ক্তি যেন এক নতুন দৃশ্যপট উন্মোচন করছে, যা আমাদের অস্তিত্বের গভীরতর স্তরে নিয়ে যায়।

২. ভাষাশৈলী ও শব্দের ব্যঞ্জনা :

মুনিরা চৌধুরীর ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তার ব্যতিক্রমী ও বিমূর্ত শব্দচয়ন। ভাষার সরলতা ও রহস্যময়তা একসঙ্গে মিশে গিয়ে এখানে এক ধরনের ধোঁয়াশাপূর্ণ বাস্তবতা তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ,

> "দূর অতীতের নীলভ্রমরা মাথায় অঙ্কন করছে আগুনের রেখা
> গাছের গর্তে ঘুমিয়ে পড়েছে হরিণী আমি জেগে আছি"

এখানে “নীলভ্রমরা”, “আগুনের রেখা”, “গাছের গর্তে ঘুমিয়ে পড়েছে হরিণী”–এই প্রতীকগুলো আমাদের চেতনাকে এক বিস্তৃত কল্পনার দিকে নিয়ে যায়। “আগুনের রেখা” একধরনের যন্ত্রণা বা অন্তর্দহন বোঝায়, আবার “গাছের গর্তে ঘুমিয়ে পড়েছে হরিণী” নিরুপায় শূন্যতার ইঙ্গিত দেয়। একইভাবে,

> “শব্দগুলো হারিয়ে যাচ্ছে হা-করা শব্দের ভিড়ে
> হাজার চেহারার মাঝে চেহারাগুলো গলে পড়ছে অ্যাবুসিনিয়ার মরুপথে”

এখানে শব্দের ভিড়ে শব্দের হারিয়ে যাওয়া আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি যুগের আত্মপরিচয়ের সংকটের ইঙ্গিত দেয়। অ্যাবুসিনিয়ার মরুপথে চেহারাগুলোর গলে পড়া সময়ের নিষ্ঠুর প্রবাহের কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে ব্যক্তির অস্তিত্ব ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়।

৩. কাব্যদর্শন ও জীবনবোধ :

এই পর্বের কবিতাগুলোতে জীবন, মৃত্যু, পুনর্জন্ম এবং অস্তিত্বের শূন্যতা সম্পর্কে এক গভীর অনুসন্ধান লক্ষ করা যায়। কবির দৃষ্টিভঙ্গি কখনো দার্শনিক, কখনো নিঃসঙ্গতাবাদী। উদাহরণস্বরূপ–

> “ফুল পাখি নদীর কাছে নয়
> প্রতিদিন আমার কষ্ট আমার কাছে বিক্রি করে দেই
> না-লেখা কবিতাগুলো টেনে টেনে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাই
> অগ্নিমাখা ফেসবুকে প্রকাশ করি
> স্বয়ং ঈশ্বর এসে লাইক দিয়ে যান।”

এটি এক শক্তিশালী ও ব্যঙ্গাত্মক চিত্রকল্প। এখানে কবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের শূন্যতা, আত্মপ্রচার এবং আমাদের সময়ের প্রতীকী মৃত্যু নিয়ে এক গভীর ব্যঞ্জনাময় কটাক্ষ করেছেন।

কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিটি–

> “ওহে রক্তকরবী, সমুদ্র ডুবে আছে তোমার ভেতরেও।”

এটি জীবন ও যন্ত্রণার এক অনিবার্য সত্যকে প্রকাশ করে। “রক্তকরবী” শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নয়, এটি ত্যাগ, কষ্ট এবং বিপ্লবেরও প্রতীক। অন্যদিকে–

> “ঘুমের ভেতরে গত জনমের কষ্টরা ধীরে ধীরে পুড়ছিলো
> ঘুম ভেঙে দেখি আগামী জনমের সুখগুলো পিপাসার্ত ভীষণ”

এটি সময়ের এক চক্রাকার ব্যাখ্যা। এখানে পুনর্জন্মতত্ত্বের একটি দার্শনিক ছোঁয়া রয়েছে, যেখানে অতীতের কষ্ট ও ভবিষ্যতের আনন্দ এক চিরন্তন প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

৪. পরাবাস্তবতা ও উত্তরাধুনিকতার ছোঁয়া–

এই পর্বের কবিতাগুলোতে এক অদ্ভুত, স্বপ্নের মতো পরাবাস্তব বাস্তবতা লক্ষ করা যায়। কবির ভাষা, চিত্রকল্প এবং উপমাগুলো সময় ও বাস্তবতার গণ্ডি পেরিয়ে এক বিমূর্ত অস্তিত্বে পৌঁছে যায়। উদাহরণস্বরূপ–

> "দ্বিপদী ঘোড়ায় চড়ে আরো দূর যেতে যেতে
> নিমাই সন্ন্যাসীর গ্রামে যাই
> মন্দিরের চূড়ায় অন্ধকার ঘন হয়ে এলে বিষ পান করি
> চাতকিনীর মতো আমিও তৃষ্ণা নিবারণ করি।"

এখানে অতীত ও বর্তমানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। "নিমাই সন্ন্যাসী" চৈতন্যদেবের প্রতীক, যিনি বৈষ্ণব দর্শনের অন্যতম প্রচারক। কিন্তু এখানে তার উপস্থিতি বাস্তব নয় বরং এক গভীর আত্মানুসন্ধানের প্রতীক। এছাড়া–

> "হায় শ্যাম! তুমি কি একবার এসে খুলে দিয়ে যাবে জল ও ঘুমের কপাট!"

এটি এক ধরনের আধ্যাত্মিক আকুতি, যেখানে প্রেমিক বা ঈশ্বরের প্রতি এক অন্তহীন অপেক্ষা ও তৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে।

উপসংহার :

"নয় দরজার বাতাস" পর্বটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ নয়, এটি এক ধরনের কাব্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যেখানে ভাষা ও চেতনার সীমা প্রসারিত হয়েছে। কবিতার বুননশৈলী, উপমার অভিনব প্রয়োগ, দর্শন ও পরাবাস্তবতার সমন্বয় একে বাংলা কবিতার এক বিশেষ স্থান দান করেছে।

এই পর্বের কবিতাগুলোতে একদিকে গভীর ব্যক্তিগত বেদনা, অন্যদিকে সর্বজনীন অস্তিত্বের সংকট একত্রিত হয়েছে। সময়ের প্রবাহ, সামাজিক পরিবর্তন, আত্মপরিচয়ের সংকট, প্রেম এবং অধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা–সবকিছু মিলিয়ে এটি এক চিরন্তন কাব্য সত্য হয়ে উঠেছে।

তৃতীয় পর্ব : পাঠপ্রতিক্রিয়া

(মেহেক ও মেহেকানন্দা : প্রেম, আধ্যাত্মিকতা ও অস্তিত্বের অনুসন্ধান)

"নয় দরজার বাতাস" কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় পর্ব "মেহেক ও মেহেকানন্দা" পূর্ববর্তী দুই পর্বের তুলনায় আরও ব্যক্তিগত, আরও গভীর এবং প্রায় আধ্যাত্মিকভাবে সংবেদনশীল। এই পর্বের কবিতাগুলোতে প্রেম, মৃত্যু, আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, দ্রোহ এবং এক ধরনের আত্মদহনের চিত্র ফুটে উঠেছে। কবির ভাষা এখানে কখনো সংযত, কখনো প্রবল, কখনো গীতল, কখনো বিদ্রোহী।

এই পর্বে দুটি প্রধান প্রতীক বারবার ফিরে আসে–

১. মেহেক (সম্ভবত প্রেমের প্রতীক, অথবা আত্মার এক গভীর অনুভূতি) এবং
২. মেহেকানন্দা (একটি নদী, যা সময়ের প্রবাহ ও জীবনের দর্শনের প্রতীক)।

১. গঠনশৈলী ও শিল্পমান :

এই পর্বের কবিতাগুলো সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অত্যন্ত গভীর। কবিতার কাঠামো সুনির্দিষ্ট হলেও অর্থের ব্যাখ্যা অনেক স্তরে প্রসারিত। উদাহরণস্বরূপ–

> "মানুষের ভেতর পশুদের শহর শহর তুমি মরে যাও
> তবু মৌমাছির মধু তুলে রেখো না বিষের বোতলে।"

এখানে সমাজ ও সভ্যতার সংকট ফুটে উঠেছে। "মানুষের ভেতর পশুদের শহর" লাইনটি একদিক থেকে আমাদের সভ্যতার মুখোশ খুলে দেয়, অন্যদিকে "মৌমাছির মধু বিষের বোতলে" রেখে দেওয়ার অনুরোধ একটি ব্যঙ্গাত্মক সতর্কবাণী–যেন মানবসভ্যতা বিষাক্ততার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই কবিতাগুলোর ভাষা একদিকে অতি আধুনিক, অন্যদিকে চিরায়ত প্রেম-দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণ।

২. প্রেম ও আধ্যাত্মিকতা :

এই পর্বের কবিতাগুলোতে এক ধরনের দীপ্ত অথচ বিষাদময় প্রেম বিদ্যমান। এটি কেবল শরীরী প্রেম নয় বরং আধ্যাত্মিক এক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।

উদাহরণস্বরূপ–

> "সূর্য বরাবরই দূরে থাকে
> দূরে থাকলেই না কি শ্যামকে কাছ থেকে দেখা হয়
> কথা না বললেই না কি অনেক বেশি কথা হয়ে যায়
> কথার মাঝখানে তৈরি হয় অদৃশ্য সেতু।"

এখানে "শ্যাম" কেবল প্রেমিক নন, তিনি এক আধ্যাত্মিক সত্তাও–যে প্রেম, ঈশ্বর ও আত্মার মাঝে অবস্থান করছেন। "দূরে থাকলেই কাছ থেকে দেখা হয়"–এই পঙ্‌ক্তিটি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাব্যের মতোই এক উচ্চতর প্রেমের ব্যাখ্যা দেয়। একইভাবে,

> "সিঁদুর পরিয়ে দাও শ্যাম
> সিঁদুর পরিয়ে দাও
> বললো সে-কোনোদিন তুমি সংসারসঙ্গিনী হয়ো না
> হয়ো সিঁদুরের অধিক সাধন সঙ্গিনী।"

এখানে সংসার ও আধ্যাত্মিকতার সংঘাত উঠে এসেছে। কবি সংসারী নন, তিনি প্রেমের এক উচ্চতর অবস্থানে পৌঁছাতে চান, যেখানে শারীরিক বন্ধন অর্থহীন হয়ে যায়।

৩. বিদ্রোহ ও আত্মদহন :

এই পর্বের কবিতাগুলোর আরেকটি শক্তিশালী দিক হলো বিদ্রোহ ও আত্মদহন। কবি প্রেমের মধ্যে যেন আত্মহননের আনন্দ খুঁজে পান, যা এক ধরনের মরমী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। উদাহরণস্বরূপ–

"হায় শ্যাম!
তুমি কি জানো-ভালোবেসে গোলাপ চাই না
আমি শুধু তোমায় খুন করতে চাই, সবগুলো নিঃশ্বাস চাই"

এই পঙ্‌ক্তিগুলো প্রচলিত প্রেমের চিত্রকে ভেঙে দেয়। এখানে ভালোবাসা মানেই পুষ্পগন্ধ নয়, বরং প্রেম এক গভীর তীব্র আকাঙ্ক্ষা, যেখানে প্রেমিককে নিঃশেষ করে দিতে ইচ্ছা হয়। এছাড়া,

"বিষের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছি
সূর্যের সাথে যুদ্ধ করবো বলে
রক্তলাল পাথর হতে গিয়ে
বিগলিত মোম হয়ে গেছি মোমের মানবী।"

এখানে আত্মদহন ও বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে "বিষের পেয়ালা", "সূর্যের সাথে যুদ্ধ" এবং "বিগলিত মোম" ব্যবহার করা হয়েছে। এটি এক ধরনের অগ্নিময় ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি–যেখানে প্রেম এক ধ্বংসাত্মক এবং পুনরুত্থানের মাধ্যম।

৪. মেহেকানন্দা : নদী ও সময়ের প্রতীক

এই পর্বে "মেহেকানন্দা" নামে যে নদী বারবার ফিরে আসে, তা শুধুমাত্র একটি ভৌগোলিক নদী নয় বরং সময়, জীবন ও স্মৃতির প্রতীক। উদাহরণস্বরূপ–

"হিন্দু ও মুসলিমের সঙ্গী নই আমি
মানুষ তুমি কোথায় এ-ভব
মেহেকানন্দা নদী তীরে!"

এখানে ধর্মের সীমানা ভেঙে কবি কেবল মানবতার কথা বলেছেন। মেহেকানন্দা যেন সমস্ত বিভেদের ঊর্ধ্বে এক সর্বজনীন প্রবহমান সত্য। একইভাবে,

"চাঁদ-সূর্যের পাহারাদার আমি
শেষরাতে নদীর নিচে ঘুমোতে যা

তুমি শংকিত হয়ো না ঈশ্বর
আমি শুধু জল বিন্দুকে ভ্রমরা বানিয়ে দিয়েছি।"

এখানে নদীর নিচে ঘুমানোর প্রতীকী অর্থ হতে পারে আত্মার বিশ্রাম, অথবা চিরস্থায়ী বিশ্রাম–যাকে আমরা মৃত্যু বলি।

৫. উত্তরাধুনিকতা ও পরাবাস্তবতা :

এই পর্বের কবিতাগুলোতে উত্তরাধুনিক কাব্যধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য-পরাবাস্তবতা (Surrealism) স্পষ্টভাবে উপস্থিত। কবিতাগুলো সরাসরি কোনো ঘটনা বা বাস্তবতা নিয়ে কথা বলে না বরং এক ধরনের স্বপ্নের ভাষায়, রহস্যময় ইঙ্গিতে, গভীর প্রতীকী চিত্রকল্পে আবৃত।

উদাহরণস্বরূপ–

"অন্ধকারে ডুবে আছে এক আহত হরিণ
মোমবাতি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ভাঙা আলো"

এটি কি কেবল একটি আহত হরিণের গল্প? নাকি এটি একটি আত্মার ব্যথা, এক নিঃসঙ্গতার প্রতীক? এই পর্বে চাঁদ-সূর্য, নদী, হরিণ, মোমবাতি, বিষের পেয়ালা, মধু–এসব প্রতীকী উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে এক জাদুবাস্তবতার ছোঁয়া দিয়ে, যা বাংলা কবিতায় খুব বেশি দেখা যায় না।

উপসংহার :

"মেহেক ও মেহেকানন্দা" পর্বটি এই কাব্যগ্রন্থের সবচেয়ে সংবেদনশীল, আধ্যাত্মিক ও পরাবাস্তবময় অংশ। এখানে কবি প্রেমিক, বিদ্রোহী, আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানকারী এবং অস্তিত্ববাদী দর্শনের একসঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

এই পর্বের কবিতাগুলো প্রেম, ঈশ্বর, ধর্ম, বিদ্রোহ, মৃত্যু, আত্মদহন এবং উত্তরাধুনিক অস্তিত্বের সংকটকে একত্রে বহন করে। প্রেম এখানে শুধু একটি সম্পর্ক নয়, এটি সময়, ধ্বংস, আত্মসমর্পণ, পুনর্জন্ম এবং চরম আত্মানুভূতির একটি পরিক্রমা।

মুনিরা চৌধুরীর এই কবিতাগুলো বাংলা কবিতার জগতে এক অন্যরকম কাব্যিক দিগন্তের উন্মোচন করে, যা একাধারে রহস্যময়, গভীর, চিন্তার উদ্দীপক এবং অবচেতন মনের সঙ্গে সংযোগকারী।

চতুর্থ এবং শেষ পর্ব : পাঠপ্রতিক্রিয়া

("মুনিরা কথা": আত্মদর্শন, মৃত্যুচিন্তা ও কবির অন্তিম উচ্চারণ)

“নয় দরজার বাতাস” কাব্যগ্রন্থের চতুর্থ ও শেষ পর্ব “মুনিরা কথা” এক অনন্য স্বর। এটি যেন কবির নিজের সঙ্গে নিজের সংলাপ, আত্মসন্ধান এবং এক ধরনের ধ্যানমগ্ন অভিব্যক্তি। পূর্ববর্তী তিনটি পর্বে আমরা প্রেম, সময়, প্রকৃতি, আত্মদহন ও পরাবাস্তবতার মধ্যে কবিকে বিচরণ করতে দেখেছি। কিন্তু এখানে তিনি নিজেকে উন্মোচন করেছেন মৃত্যুচিন্তা, অন্তিম পরিণতি, একাকীত্ব এবং শিল্পীর আত্মদর্শনের এক নিবিড় উপাখ্যান হিসেবে।

এই পর্বের কবিতাগুলো পাঠকের মনে গভীর দাগ কাটে, কারণ এতে রয়েছে একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ। এটি এক ধরনের কবির নিজস্ব বিদায়গাথা, যেখানে মৃত্যু একটি অনিবার্য বাস্তবতা, কিন্তু তার পাশাপাশি কবি এক ধরনের কল্পনাময় মৃত্যুকে তুলে ধরেছেন।

১. গঠনশৈলী ও কাব্যমান

এই পর্বের কবিতাগুলো সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অর্থবহ। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি উপমা যেন এক দীর্ঘশ্বাসের মতো অনুভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ–

> “আমার মরণ হলে করুণা করেও একবার দেখতে এসো
> চোখের পাতা খোলা থাকবে
> পাথরের চোখ তোমার হাত দিয়ে
> শেষ বারের মতো সিঁদুর পরিয়ে চোখ বন্ধ করে দিয়ো জনম জনমের মতো”

এখানে মৃত্যু কেবল একটি শারীরিক সমাপ্তি নয় বরং এটি প্রেমের এক শ্বাশত বন্ধন, যা মৃত্যুর পরেও রয়ে যায়। “সিঁদুর পরিয়ে চোখ বন্ধ করে দিয়ো”–এটি মৃত্যুর এক বিষণ্ন অথচ হৃদয়গ্রাহী ইঙ্গিত।

গোলাপ, রক্তকরবী, পাখি, সময়, নৌকা, শ্যাম–এই পর্বেও এই চিত্রকল্পগুলো ফিরে ফিরে এসেছে। কিন্তু এবার তারা শুধুই প্রতীক নয় বরং তারা কবির বিদায়বার্তা বহন করছে।

২. মৃত্যু ও শিল্পীর আত্মপরিচয়

এই পর্বের কবিতাগুলোয় মৃত্যুচিন্তা একটি সর্বব্যাপী উপস্থিতি। তবে এটি শুধুমাত্র মৃত্যু নিয়ে ভীতি বা বিষাদ নয় বরং এটি এক ধীর, আত্মস্থ এবং নান্দনিক বিদায়বোধ। উদাহরণস্বরূপ–

> “পাখিদের ঠান্ডা লাগছে
> আমার প্রাণবন্ধু পাখিরা হিমায়িত হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে
> কীভাবে সেলাই করি লাল নীল কমলা রঙের চাদর
> আমার হাতখানি যে পুড়ে গেছে”

এখানে পাখিরা কবির কল্পনার প্রতীক–তারা যেন কবির শৈল্পিক সত্তা, যা শীতল হয়ে যাচ্ছে, স্থবির হয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কবি তাদের জন্য চাদর সেলাই করতে চান–যেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সৃষ্টিশীলতার মধ্য দিয়ে শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। অন্যদিকে,

> "গোলাপ-কাঁটায় দু'চোখ বিদ্ধ করে দেখতে চেয়েছিলাম-
> কীভাবে রক্ত ঝরে খসে পড়লো নীলবর্ণ শিশির ও গ্লিসারিন"

এটি যেন শিল্পীর আত্মযন্ত্রণার প্রতীকী প্রকাশ। এখানে "গোলাপ-কাঁটা" শুধুমাত্র কষ্টের নয় বরং এটি সৌন্দর্যের জন্য ত্যাগেরও প্রতীক।

৩. প্রেম ও বিদায়গাথা

এই পর্বের প্রেম কবির এক অনন্ত আকাঙ্ক্ষার রূপ নিয়েছে। এটি আর শরীরী প্রেম নয়, এটি অস্তিত্বের গভীরে প্রবেশ করা প্রেম। উদাহরণস্বরূপ–

> "যেতে যেতে সমুদ্রের তলায় জলছিদ্রে খুঁজতে যাই মেহেকের সুখ
> কতো আর যাবো শ্যাম কোন অচিন বিন্দুতে আমি যে ক্লান্ত আজ মরে যেতে যেতে
> আরও একবার রক্তকরবীর ভাগ্য সাজাতে চাই"

এখানে "মেহেকের সুখ" এক দূরবর্তী কল্পনা, যা কবি খুঁজে চলেছেন। শ্যাম এখানে এক ধ্রুব প্রতীক–তিনি প্রেমিক, তিনি ঈশ্বর, তিনি অস্তিত্বের এক নির্দিষ্ট বিন্দু। কিন্তু কবি সেখানে পৌঁছাতে ক্লান্ত, অবসন্ন, তাই মৃত্যুই যেন শেষ অবলম্বন হয়ে ওঠে।

৪. সময় ও তার ধ্বংসাত্মক গতি

সময় এই পর্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। সময় যেন এক ধাবমান ঘোড়া, যা কিছুই স্থির থাকতে দেয় না।

> "সময় এক পাগলা ঘোড়ার মতো
> তুমি পাশে এলে দৌড়ায় দ্রুততম
> কোনোদিন আর কোথাও যেতে পারবে না শ্যাম আজ এই মধ্য রাতে
> ঘোড়াটি কুরবানী দিয়েছি আমি
> পৃথিবীর সবগুলো ঘড়ি ভেঙে ফেলেছি।"

এখানে কবি সময়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চান, কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাই প্রতীকীভাবে "ঘোড়াটি কুরবানী" করে তিনি যেন সময়ের গতিকে থামানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমরা জানি, সময়ের গতি অবশ্যম্ভাবী।

৫. উত্তরাধুনিকতা ও পরাবাস্তবতা

এই পর্বে উত্তরাধুনিক চেতনা সবচেয়ে প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ–

"আমার চোখ/ তোমার চোখ/
ফেস বুকের বন্ধুদের চোখ
আসলে সব মৃত মানুষের চোখ"

এটি উত্তরাধুনিক সময়ের আত্মপরিচয়ের সংকটকে তুলে ধরে। আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় যত চেহারা দেখি, যত সম্পর্ক গড়ি–তাদের ভেতর কতটুকু বাস্তবতা, কতটুকু জীবন? এই পঙ্‌ক্তিগুলো সামসময়িক মানুষের শূন্যতা, সংযোগের ভ্রান্তি এবং অস্তিত্বের এক অসাড় অনুভূতিকে প্রকাশ করে।

উপসংহার :

মুনিরা কথা ও কাব্যগ্রন্থের সমাপ্তি

"নয় দরজার বাতাস" কাব্যগ্রন্থের চতুর্থ পর্ব "মুনিরা কথা" কবির চূড়ান্ত আত্মপ্রকাশ, একান্ত আত্মসমর্পণ এবং অস্তিত্বের গভীরতম উপলব্ধির প্রকাশ। এই পর্বে–

- ✓ মৃত্যুচিন্তা রয়েছে, তবে তা শুধু ভয় বা বেদনার নয় বরং এক ধরনের অভ্যর্থনা।
- ✓ প্রেম রয়েছে, কিন্তু তা শরীরী নয় বরং চিরন্তন এবং আধ্যাত্মিক।
- ✓ সময় নিয়ে বিদ্রোহ রয়েছে, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণে রূপ নেয়।
- ✓ পরাবাস্তবতা ও উত্তরাধুনিকতার ছোঁয়া সবচেয়ে স্পষ্ট এখানে, যেখানে কবি নিজের অস্তিত্বকেই ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করেন।

এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি পর্বই ছিল এক ভিন্নধর্মী আবেগের ভ্রমণ। "হেমন্তে রচিত হেমলক"-এ স্মৃতিচারণ, "নয় দরজার বাতাস"-এ ধাঁধার মতো বিমূর্ততা, "মেহেক ও মেহেকানন্দা"-তে প্রেম ও অধ্যাত্মিকতা, আর "মুনিরা কথা"-তে আত্মসমর্পণ ও অন্তিম উচ্চারণ।

এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় একটি আত্মজিজ্ঞাসার প্রবল ধারা প্রবাহিত। এটি নিছক কবিতা নয়, এটি একজন কবির অস্তিত্বের লিপিবদ্ধ রূপ।

শেষ কথা :

মুনিরা চৌধুরীর "নয় দরজার বাতাস" শুধুমাত্র একটি কবিতার বই নয়, এটি একটি ধ্রুপদী কাব্যযাত্রা, যেখানে কবি সময়, প্রেম, মৃত্যু ও অস্তিত্বের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্লেষণ করেছেন। এটি বাংলা কাব্যজগতের এক বিরল সংযোজন, যা পাঠককে ভাবায়, কাঁদায়, বিদ্রোহী করে তোলে, আবার শূন্যতার বোধও সৃষ্টি করে।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প

বোধোদয়

আনোয়ার শাহজাহান

টেবিলে শাহি ভোজনের আয়োজন। ক্যাম্পের কমান্ডার রমিজ পাঠান খাবারের আইটেমগুলো দেখে রীতিমতো অভিভূত! কোনো দেশে যুদ্ধ করতে এসে যে এভাবে জামাই আদর পাওয়া যায়, সেটা তাঁর জানা ছিল না। সরষে ইলিশ, কচি কুমড়োপাতা দিয়ে ইলিশের ডিম ভুনা, দেশি মোরগের রোস্ট, গরুর কলিজা ভুনা, নদীর পাবদা মাছের দোপেঁয়াজি, চিংড়ি দিয়ে জালি লাউ, বাসমতি চালের ভাতসহ আরও অনেক আইটেম। সুঘ্রাণে সারা বাড়ি ম ম করছে। কমান্ডার খেতে বসেছেন। প্রধান দরজার বাইরে আট-দশজন সিপাহি বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে।

সোলাইমান মোল্লা আর তাঁর মেয়ে আফিয়া পরম যত্নে খাবার তুলে দিচ্ছেন কমান্ডারের পাতে। কোনটা রেখে কোনটা খাবেন ভেবে পাচ্ছেন না রমিজ পাঠান। মাঝেমধ্যে হাতপাখার বাতাস দিচ্ছে আফিয়া, তবুও ঘেমে-নেয়ে একাকার কমান্ডার। তৃপ্তিসহকারে খাচ্ছেন আর বারবার আফিয়ার দিকে তাকাচ্ছেন। কেননা অনন্য সুন্দরী আফিয়ার দিকে একবার তাকানোর পর দ্বিতীয়বার কেউ তাকায়নি এমনটি হয়নি কখনো। খেতে খেতে কমান্ডার একসময় বলেই ফেললেন–

সোলাইমান মোল্লা, তোমার বিবির হাতের রান্না অতি চমৎকার! আমি জীবনেও খাইনি এত স্বাদের খাবার।

সোলাইমান মোল্লা এক গাল হেসে হাত কচলাতে কচলাতে বললেন–

সাব, আমার বিবি তো মারা গেছে চার বছর আগে। আমার মেয়ে আফিয়াই সবকিছু রান্না করেছে।

তাই নাকি! তাহলে তো বড়ই গুণবতী মেয়ে তোমার! তা কোন ক্লাসে পড়ছে তোমার মেয়ে?

সাব, এই তো এবার ইংরেজিতে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে। গণ্ডগোল শুরু হওয়ার পর থেকে বাড়িতেই আছে। চারদিকে মুক্তিফৌজের যে আনাগোনা, একটু নজর রাখবেন সাব আমাদের ওপর।

তুমি কোনো চিন্তা করো না। সব আমি দেখব।

গল্পে গল্পে খাওয়া শেষ করেন কমান্ডার। তারপর মশলা দেয়া পানটা আফিয়ার হাত থেকে নিয়ে মুখে পুরেই তিনি বললেন–

তোমার মেয়ের কি বিয়ে দিয়েছ সোলাইমান?

না সাব। পড়ালেখা আগে শেষ করুক। তারপর বিয়ের কথা ভাবা যাবে। এখনো তো বিয়ের বয়সই হয়নি সাব।

কী বলো এসব? আমি তো দেখতে পাচ্ছি মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হয়ে গেছে। দেশে যেভাবে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তাতে কখন যে কী হয়, তা তো বলা যায় না। এর চেয়ে ভালো হয়, তুমি কাজি ডাকো, আমি আজই আফিয়াকে শাদি করতে চাই।

না না সাব, এসব কী বলছেন আপনি? আপনি হলেন আমাদের রক্ষাকর্তা। আর আপনি তো আফিয়ার বাবার বয়সি। এ কাজ কখনোই সম্ভব নয় সাব। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

শোনো, তুমিই তো বিভিন্ন এলাকা থেকে গত চার মাসে ডজনখানেক মেয়ে ধরে এনে আমার ক্যাম্পে দিয়েছ। কিন্তু আমি তোমার মেয়েকে তো ওইভাবে চাচ্ছি না। বিয়ে করে তাকে বিবির মর্যাদা দিয়েই রাখব। যাও, কাজি ডাকো।

অবস্থা বেগতিক দেখে সোলাইমান মোল্লা রমিজ পাঠানের দুই পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন–

আমাকে ক্ষমা করুন সাব। আমার মা-মরা মেয়েটার জীবন আপনি এভাবে নষ্ট করে দিয়েন না। ও পড়ালেখা শিখে শিক্ষক হতে চায়। ওর স্বপ্নটা ধূলিসাৎ করে দেবেন না। এমন ঘটনা ঘটলে সে নির্ঘাত আত্মহত্যা করবে।

কমান্ডার বুট জুতা দিয়ে সোলাইমানের বুকের ওপর জোরসে একটি লাথি মেরে ফেলে দিলেন। চিৎকার করে ডাক দিলেন সিপাহিদের। তারা দ্রুত বাড়ির মধ্যে এসে স্যালুট ঠুকতেই তিনি বললেন–

ঘরের মধ্যে মোল্লার মেয়ে আছে। ওকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে আমার রুমে তালাবদ্ধ করে রাখ।

জো হুকুম–বলেই কয়েকজন সিপাহি ঘরের ভেতর থেকে আফিয়াকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেল ক্যাম্পে। তার গগনবিদারী চিৎকারেও কেউ এগিয়ে আসেনি। কেননা ওই সময় সশস্ত্র পাকিস্তানি সেনাদের হাত থেকে তাকে ছাড়িয়ে নেয়ার মতো শক্তি ও সাহস এলাকায় কারোরই ছিল না। একরকম পাঁজাকোলা করে তাকে ধরে নিয়ে চলে গেল সবাই। তার চিৎকারের শব্দ দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে একসময় বাতাসের সাথে মিলিয়ে গেল।

কমান্ডারের লাথি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন সোলাইমান মোল্লা। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর গলার ওপর বাম পা রেখে জোরে চাপ দিয়ে ধরেন। একবার

সিদ্ধান্ত নিলেন মেরেই ফেলবেন, আবার কী মনে করে সেটা না করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে হনহন করে ক্যাম্পের দিকে রওনা হলেন কমান্ডার রমিজ পাঠান।

প্রতিবেশীরা এতক্ষণ সবকিছু টের পেলেও কেউ এগিয়ে আসেনি। বাড়ি থেকে পাকিস্তানি সেনারা চলে যাওয়ার পরপরই তারা এসে দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন সোলাইমান মোল্লা। চোখেমুখে পানি ছিটিয়ে দেয়ার পর জ্ঞান ফিরতেই 'মা আফিয়া' বলে জোরে একটা চিৎকার দিয়েই আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি।

১৯৭১ সালের ৮ মার্চ আফিয়া সিলেটের গোলাপগঞ্জের দত্তরাইল গ্রামে নিজেদের বাড়িতে চলে আসে। সে বুঝতে পেরেছিল দেশে একটা যুদ্ধ আসন্ন। দেশ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে ছিল দেশের স্বাধীনতার পক্ষে। পাকিস্তানিদের শাসন-শোষণের গ্যাঁড়াকল থেকে বেরিয়ে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখত আফিয়া। বাড়িতে এসে একদিন দেশের হালচাল ব্যাখ্যা করছিল বাবার কাছে। তাঁকে বোঝাচ্ছিল যে এই দেশ একদিন স্বাধীন হবেই। আমরা মুক্ত হব পাকিস্তানি শৃঙ্খল থেকে, কিন্তু সোলাইমান মোল্লা মেয়েকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন–

চুপ কর বেয়াদব মেয়ে। তুই দেশ স্বাধীনের কী বোঝস? পাকিস্তান ভাইঙ্গা দুই ভাগ হইলে তো খোদায় নাখোশ হইব। হেই কথা আর মুখে আনবি না কুনো দিন।

আফিয়া বাবার মুখের ওপর কোনো কথা না বললেও ওই সময় তার চোখে আগুন জ্বলজ্বল করছিল।

২৫ মার্চ রাতে ঢাকা শহরে পাকিস্তানি সেনারা অতর্কিত হামলা চালায়। দেশজুড়ে শুরু হয় তাদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। এর কিছুদিনের মধ্যেই আফিয়াদের উপজেলায় ক্যাম্প স্থাপন করে রমিজ পাঠানের নেতৃত্বে একদল পাকিস্তানি সেনা। এরপর তারা একে একে এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

সেনাদের ভয়ে এলাকা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। তার পরও অনেকেই ক্যাম্পে এসে সেনাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। বিভিন্ন কাজে তাদের সহযোগিতা করতে থাকে। এলাকায় হিন্দু পরিবারগুলো কোথায় থাকে, কার কার ঘরে সুন্দরী মেয়ে আছে, কার সুন্দরী বউ আছে, কার বাড়িতে গরু-খাসি আছে, কার পুকুরে মাছ আছে–এসব খোঁজ দিত নিত্যদিন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সোলাইমান মোল্লা। আর এসব কারণেই এলাকায় তিনি 'সোলাইমান রাজাকার' হিসেবে পরিচিতি পান।

সোলাইমান মোল্লার কাজ ছিল মূলত আশপাশের এলাকায় হিন্দুদের কোন পরিবারগুলোয় সুন্দরী মেয়ে আছে, সেই খবর ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়া। আর তাঁর দেয়া খবর মোতাবেক সেনারা রাতের বেলা ওই বাড়িতে গিয়ে সবাইকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে আসত। মেয়েটিকে ক্যাম্পে রেখে তার মা-বাবাকে গুলি করে মেরে মাটিচাপা দিত। সে এক বীভৎস মহাযজ্ঞ। ক্যাম্পে এ রকম বারো থেকে পনেরোটি মেয়ে

ছিল। রাতদিন চলত তাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন। অধিক সুন্দরী মেয়েদের কোনো কোনো দিন আট-দশজনের অত্যাচার সইতে হতো। এত নির্যাতন-কষ্টের পরও কারো পালানোর কোনো উপায় ছিল না কিংবা আত্মহত্যা করারও কোনো সুযোগ ছিল না।

তাদের মধ্যে যদি কোনো মেয়ে একটু প্রতিবাদ কিংবা অসম্মতি জানাতো, তাহলে অন্য মেয়েদের সামনেই তাকে বিবস্ত্র করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়ে দড়ি বেঁধে সিলিং ফ্যানের সাথে উলটো করে ঝুলিয়ে রাখত। অনেক সময় কেউ কেউ জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। ফলে এ ধরনের যন্ত্রণাময় নির্যাতনের ভয়ে কেউ মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করত না। মুখ বুজে নীরবে সহ্য করত হায়েনাদের লালসা আর বিকৃত রুচির জৈবিক চাহিদা পূরণের আকাঙ্ক্ষাকে।

একদিন রাতে সোলাইমান মোল্লা বাড়িতে নেই। এমন সময় মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল তাঁর বাড়িতে আসে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাঁকে না পেয়ে মেয়ের কাছে শাসিয়ে যায় এই বলে যে পাকিস্তানি সঙ্গ ত্যাগ না করলে রক্ষে নেই। এ খবর পাওয়ার পরই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মোল্লা। তিনি ক্যাম্পের কমান্ডারের কাছে সবকিছু খুলে বলেন। তাঁর জীবন রক্ষার জন্য কমান্ডারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। একই সাথে তাঁর বাসায় পরের শুক্রবারে দাওয়াত করে আসেন।

বিষয়টি শোনার পর আফিয়া ভীষণভাবে আপত্তি জানালেও কাজ হয়নি। বাবার ভয়ে এবং একরকম বাধ্য হয়ে সেদিন রান্না করেছিল কমান্ডারের জন্য। আর কমান্ডার তাকে দেখার পরই তার জীবনে নেমে আসে মহা বিপর্যয়। পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগী বাবার কারণেই আফিয়ার জীবনে আজ এমন পরিস্থিতি।

এদিকে জ্ঞান ফেরার পর সোলাইমান মোল্লা জানতে পারেন তাঁর মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে পাকিস্তানি সেনারা। তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। তিনি এলাকা ছেড়ে নিরুদ্দেশ হন। কোথায় গেছেন, কী করেন, কিছুই আর জানা যায় না।

এদিকে ক্যাম্পে কথা চাউর হয়ে যায় যে সোলাইমান মোল্লা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। বিষয়টি শোনার পর কমান্ডার সবাইকে ডেকে বলে দিয়েছেন, যেখানেই পাওয়া যাবে মোল্লাকে, সেখান থেকেই যেন তাঁকে ধরে এনে ক্যাম্পের মধ্যের বটগাছের ডালে উলটো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ওই অবস্থায় কমান্ডার তাঁকে নিজ হাতে শাস্তি দেবেন।

ওই ঘটনার পর সোলাইমান মোল্লার জীবনে নতুন এক বোধের জন্ম হয়। তিনি ভাবেন, নিজের দেশটাকে ভাগ করতে চেয়েছেন কার লাভের আশায়? নিজের এলাকার লোকজনকে পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা অত্যাচার করে মূলত কার উপকার করেছেন? বহু হিন্দুর বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে তিনি কার স্বার্থ উদ্ধার করেছেন?

মেয়েদের ধরে এনে পাকিস্তানি সেনাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছেন কোন সুবিধার আশায়? তাহলে এসবই কি তাঁর জীবনে বুমেরাং হয়ে ফিরে এলো? নাকি অজস্র পাপের প্রতিফল এগুলো?

প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের। যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালের সেই অবস্থা এখন আর নেই। কেননা গেরিলা যোদ্ধারা ইদানীং যেখানে-সেখানে অতর্কিত আক্রমণ করে বসছেন পাকিস্তানি সেনাদের ওপর। ল্যান্ড মাইন দিয়ে সেনাসহ গাড়ি উড়িয়ে দিচ্ছেন। অথচ যুদ্ধ শুরুর সময় সবাই ভয়ে তটস্থ থেকেছেন পাকিস্তানি সেনাদের ভয়ে। পালিয়ে পালিয়ে থেকেছেন রাতের বেলা। দিনে চলাফেরাও ছিল সতর্কতার সাথে।

ওই সময় পাকিস্তানি সেনাদের গতিবিধি ছিল সাক্ষাৎ আজরাইলের মতো। রাস্তাঘাটে কাউকে সন্দেহ হলেই ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যেত অথবা গুলি করে মেরে ফেলত। পুরুষ মানুষ দেখলেই লুঙ্গি খুলে দেখত সে হিন্দু নাকি মুসলমান। হিন্দু হলেই রক্ষে নেই। নারীদের ঘোমটা খুলে ভালো করে পরখ করত সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন আছে কি না, দোয়া-দরুদ পড়তে পারে কি না ইত্যাদি।

একবার দত্তরাইল গ্রামের পশ্চিম দিকে রাতে টহলে বেরিয়েছে তিনজন পাকিস্তানি সেনা। এমন সময় দুজন নারী আর একটি শিশু কোলে করে একজন পুরুষ গভীর অন্ধকারের মধ্যে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। দুজন নারীই বোরকা পরা ছিল। একজন সেনা তাদের থামতে বলার পর পুরুষ সঙ্গীটিকে নানা রকম জেরা শুরু করে দিলো–

এই তোর নাম কী?

আসলাম শেখ।

রাতের অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছিস?

শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছি, সামনের গ্রামে। আমার শাশুড়ি খুব অসুস্থ। একটু আগে খবর দিয়ে পাঠিয়েছে। তাই তাকে দেখতে যাচ্ছি।

তুই কোনো সুরা মুখস্থ বলতে পারবি?

জি, পারব।

তাহলে আয়াতুল কুরসি পড়ে শোনা।

স্যার, আয়াতুল কুরসি মুখস্থ নাই।

বলিস কী! আয়াতুল কুরসি মুখস্থ নাই, তাহলে তুই কেমন মুসলমান? এই তোর লুঙ্গি খুলে দেখা। তুই আদতে হিন্দু নাকি মুসলমান সেটা আগে দেখি।

আসলাম শেখ কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে একবার সেনাদের দিকে তাকায় একবার নারী দুজনের দিকে তাকায়। এমন সময় একজন সেনা 'ওই খোল' বলেই জোরে ধমক দিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে লুঙ্গি খুলে ধরে সেনাদের দিকে মুখ করে

দাঁড়ায়। অন্ধকারের মধ্যে একজন সেনা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে লুঙ্গির ভেতরে নামিয়ে দেখে সে আসলেই সাচ্চা মুসলমান। এবার জেরা শুরু করে আবার–

তোর সাথে এরা কারা?

এটা আমার স্ত্রী আর উনি আমার মা।

এবার স্ত্রীর খুব কাছে এসে একজন সেনা বলে–

এই লাড়কি, তোমার মুখের পর্দা সরাও।

তখন ওই নারী কিছুটা ইতস্তত করার পর মুখের পর্দা সরিয়ে দেখায়। এবার দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ভালো করে পরখ করল তার কপালে সিঁদুরের কোনো দাগ আছে কি না।

এবার আসলামের মায়ের দিকে আঙুল তুলে ওই সেনা বলল–

তোমার মুখের কাপড় সরাও।

আসলাম তখন বলল–

স্যার, আমার মা খুব পরহেজগার নারী। পরপুরুষকে মুখ দেখায় না। এখন পর্যন্ত আপনারা যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন, তাতে আমাদের মাঝে কোনো মিথ্যা বা চালাকি কি পেয়েছেন? আমাদের যেতে দেন, স্যার। আমার শাশুড়ি হয়তো এতক্ষণে বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে জানি না। তার নাকি যায় যায় অবস্থা।

তিনজন সেনার মধ্যে প্রধান গোছের একজন, যে এতক্ষণ একের পর এক জেরা করছিল, সে তার পাশের একজন সেনাকে বলল–

সাত্তার মিয়া, ওই নারীর মুখের কাপড় সরিয়ে ভালো করে চেক করো। আর চেক করতে না দিলে সবাইকে ক্যাম্পে নিয়া চলো।

তার কথা শেষ হতে না হতেই একজন সেনা আসলাম শেখের মায়ের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বাম হাতে দেশলাইয়ের জ্বালানো কাঠি ধরে ডান হাত দিয়ে যেই ওই নারীর মুখের ওপর ঝোলানো বোরকার পর্দা তুলেছে, অমনই ওই সেনার বুক বরাবর দুটি গুলি। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগেই বাকি দুজনের বুকে একই স্টাইলে দুটি করে গুলি করা হয়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অপারেশন শেষ করে তিন সেনার অস্ত্রগুলো কেড়ে নিয়ে দ্রুত উলটো পথে রওনা হয় তারা। আসলে আসলামের মা পরিচয় দানকারী ওই নারী ছিলেন সোলাইমান মোল্লা।

পরপর ছয়টি গুলির শব্দে চারদিক প্রকম্পিত হয়। ঘটনাস্থলে লোকজন ছুটে আসে। সবাই দেখে, তিনজন সেনা মরে পড়ে আছে। দ্রুত কেউ একজন ক্যাম্পে খবর দিলে সেনা কমান্ডারসহ জিপগাড়ি নিয়ে সেনারা চলে আসে। টর্চলাইট জ্বালিয়ে পরখ করে দেখে দুজন মারা গেলেও একজন তখনো জীবিত আছে। তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে স্যালাইন পুশ করা হলে একসময় জ্ঞান ফিরে আসে। তখন সে কমান্ডারের কাছে জানিয়ে দেয় যে সোলাইমান মোল্লা তিনজনকে গুলি করেছেন; এবং ভোর হওয়ার আগেই ওই সেনা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

কমান্ডার ক্যাম্পে ফেরার পর সব সেনাকে জানিয়ে দিলেন, এই ক্যাম্পের আন্ডারে তাঁদের যত সহযোগী আছে, সবাইকে খবর দেয়া হোক, যাতে দ্রুততম সময়ে সোলাইমান মোল্লাকে খুঁজে বের করা সম্ভব হয়। কিন্তু দিন যায়, মাস যায়, তাঁর খোঁজ পাওয়া যায় না কোথাও।

নভেম্বরের মাঝামাঝি। হালকা কুয়াশা ভেদ করে ভোরের পবিত্র আলো ফোটার পরপরই এলাকায় রটে যায় যে সোলাইমান মোল্লাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। তবে কারো মুখে কোনো কথা নেই। চুপচাপ সবাই দাঁড়িয়ে আছে সোলাইমানের বাড়ির দরজার পাশে আমগাছটার দিকে তাকিয়ে। গাছের নিচু ডালটার সাথে এক পায়ে দড়ি দিয়ে উলটো করে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছেন তিনি। মাথার চুল বেয়ে তাজা রক্ত তখনো শীতকালের খেজুরের রসের মতো ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে নিচের দূর্বা ঘাসে জমে থাকা শিশির কণার ওপর।